বিস্রস্ত জর্নাল

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বিস্রস্ত জর্নাল

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

সময় প্রকাশন

বিস্রস্ত জর্নাল
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
© লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৪

সময়

সময় ৯৬৪

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা

মুদ্রণ
সময় প্রিন্টার্স
২২৬/১ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

BISRASTA JOURNAL by Abdullah Abu Sayeed. First Published : February Book Fair 2014 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka 1100.
Web : www.somoy.com E-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 300.00 Only

ISBN 978-984-90871-2-0 Code : 063

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'সময় . . .' প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন)
ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১৬৮৮৫

অন লাইনে পাওয়া যাবে : www.rokomari.com, www.boi-mela.com

উ ৎ স র্গ

সানজীদা আখতার
এই ছোট ছোট লেখাগুলো
যার উৎসাহের কাছে ঋণী

ভূমিকা

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কাজে অংশ নিতে গিয়ে দায়িত্বের কষ্ট, শ্রম আর উত্তেজনার নিচে আমার গত চৌদ্দ বছরের চৈতন্য-জগৎ পুরোপুরি প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

কাজের ভারী সিসা দিয়ে ঠাসা সেই জানালা-গরাদহীন দিনগুলোয় স্বপ্ন, অনুভূতি, অবসর বা লেখালেখির বিন্দুমাত্র অবকাশ আমার ছিল না। তবু মাঝেমধ্যে, অপ্রত্যাশিত অবসরের দুয়েকটি মুহূর্তে, যেসব চকিত ভাবনা মনের আকাশে পলকের জন্যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেত, সেই ভাবনাগুলোকে যেসব ছোট ছোট মৌহূর্তিক লেখার মাধ্যমে ধরে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল, তা এগুলোই। লেখাগুলোর বিক্ষিপ্ত, অব্যবস্থ্য ও সংক্ষিপ্ত চেহারার এটাই কারণ।

সাহিত্য প্রকাশের পক্ষ থেকে অনুজপ্রতিম মফিদুল হক আমার এই নাম-সাকিনহীন লেখাগুলো প্রকাশে আগ্রহী না হলে এগুলো কোনোদিন প্রকাশিত হত বলে মনে হয় না। উদ্যোগী, প্রগতি-প্রাণিত ও বেদনাবান মফিদুল হকের প্রতি আমার নানান কারণে শ্রদ্ধা। এবার কৃতজ্ঞ হতে হল।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
ঢাকা
১২.১.৯৩

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই বইয়ের প্রথম মুদ্রণে পর্ব ছিল দুটো। এই সংস্করণে আরেকটি পর্ব সংযোজিত হল।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
ঢাকা
১.২.২০০০

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে আরও একটি পর্ব যোগ করা হল। সেই সঙ্গে গোটা বইয়ের জর্নালগুলোকে কিছুটা আগে পরে করা হয়েছে ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়ে লেখা জর্নালগুলোকে শেষ পর্বে রাখা হয়েছে।

এবারের সংস্করণটি বের করছে সময় প্রকাশন। এই প্রকাশনার কর্ণধার ফরিদ আহমদ-এর কাছে এজন্যে কৃতজ্ঞ।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
ঢাকা
১.২.২০১৪

সূচি

প্রথম পর্ব : ১
প্রথম পর্ব : ২
দ্বিতীয় পর্ব
তৃতীয় পর্ব
চতুর্থ পর্ব : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

প্রথম পর্ব : ১

[১৯৮৪-১৯৯০]

১

এদেশে কারো উপকার করতে যাওয়াই ভোগান্তি।
কারো জন্যে যে কিছু করে না, সে এদেশে জনপ্রিয়।
যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু করে না, সে প্রাতঃস্মরণীয়।

২

একটা জাপানি হাইকু পড়েছিলাম কিছুদিন আগে :

দর্পণের বৃদ্ধ মোরে ডাকে,
কাছে গিয়ে দেখি আমি তাকে।
চমকে সহসা যাই থামি,
হায়, সে যে আমি, সে যে আমি!

কাল আয়নার সামনে দাঁড়াতেই দর্পণের সেই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হল। আমার অস্তিত্ব কুঁকড়ে উঠল। কী তামাটে আর তোবড়ানো একটা মুখ! কে বিশ্বাস করবে ওই কুঞ্চিত ত্বকে তোমাদের মতোই রক্তিম গোলাপ ছিল একদিন, শহরের সুন্দরীরা তাকে ভালোবাসত।

৩

মহৎ লেখকদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে হলে তাদের 'রচনাসমগ্র' পড়তে হয়; সাধারণ লেখকদের বুঝতে তাদের 'শ্রেষ্ঠ রচনা'।

৪

ছেলেরা মেয়েদের শরীরের ভেতর দিয়ে তাদের আত্মায় পৌঁছোয় আর মেয়েরা ছেলেদের হৃদয়ের ভেতর দিয়ে তাদের শরীরকে ছোঁয়।

৫

আমার সবসময় মনে হয়, একটি জাতির প্রতিভাবান মানুষেরা জন্মান সেই জাতির গড়পড়তা বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিরুদ্ধতা করে।

রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে কি বলা যাবে, তাঁর অনবদ্য দেহকান্তি বাঙালির দেহকান্তি? তাঁর নিদ্রাহীন কর্মোদ্যম বাঙালির কর্মোদ্যম?

বিদ্যাসাগরের অস্থি কি বাঙালির অস্থি? তাঁর করুণা কি বাঙালির করুণা?

উদ্দাম বেহিসেবি মাইকেল কি বাঙালির প্রতিভূ? নজরুলের বন্য শক্তিমত্তা কি বাঙালির আবহমানের পরিচয়? হাজী মোহম্মদ মহসীনের হৃদয়, সুভাষের যৌবন, মুজিবের কণ্ঠস্বর— এসব কি বাঙালির?

আসলে এঁরা বাঙালিত্বের বাস্তবতা নয়, স্বপ্ন; এই জাতির প্রিয়তম বন্ধু ও প্রতিপক্ষ। আমাদের দুর্বলতা, লোভ, পাপ, নীচতার বেদনাবিস্রস্ত শক্তিমান ক্ষতিপূরণ।

এ সত্য না হলে শান্ত নির্বিরোধ মোঙ্গলদের মধ্যে কী করে জন্ম নিলেন দুর্দান্ত চেঙ্গিজ?

বেদুঈনদের মধ্যে কী করে জন্ম নেন মরুচারী পরম কারুণিক?

রাজপ্রাসাদের বিলাস ঐশ্বর্যের ভেতর থেকে কীভাবে নগ্নপদে বের হয়ে আসেন বৈভব প্রত্যাখ্যানকারী পরম ভিক্ষু?

দুর্দান্ত পাঠানদের মধ্যে জন্ম নেন 'সীমান্তের গান্ধী?'

মানবজাতির প্রতিভারা কি মানবজাতিরই প্রতিবাদ?

৬

যৌবন অত্যাচার করে হৃদয়ের ওপর, বার্ধক্য শরীরের ওপর।

৭

শিক্ষা বিনোদনের চেয়ে বড়। আমরা সারাক্ষণ নাচি না, কিন্তু সারাক্ষণ ভাবি।

৮

গজলের কাব্যরূপ খুঁজে পেয়েছিলেন উর্দু কবিরা— দু'শ বছর আগে। কিন্তু গজলের সর্বোচ্চ সংগীতরূপ উর্দু গান খুঁজে পেয়েছে এই মাত্র সেদিন— হয়ত মেহেদী হাসানের হাতেই।

লতা মুঙ্গেশকর বলেছিলেন : 'ঈশ্বরের কণ্ঠ আছে মেহেদী হাসানের গলায়।' আমি নিজেও মেহেদী হাসানের অশেষ অনুরক্ত। এই তো কিছুদিন আগেই

ঢাকায় এসে গেলেন অনেকদিনের ব্যবধানে। ইতিমধ্যে যৌবনের রাজ্যে নিষ্পত্রতা দেখা দিয়েছে, টাকের বিস্তৃতি আর কেশের পলিত প্রাচুর্য অলজ্জ প্রতিযোগিতায় দ্বন্দ্বমান।

অনেকেরই ভয় ছিল : আগের সেই কণ্ঠ তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু গান শুরু করতেই সব সন্দেহের অবসান হল। মেহেদী হাসান এখনো তেমনি যৌবনদীপ্ত, রঙিন।

প্রত্যেকেরই 'দিন' থাকে, কারো কারো 'চিরদিন' থাকে।

৯

চোখের সামনে সারাদেশের প্রশাসন কী দুঃখজনক ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেল। কোথাও একজনও উজ্জ্বল সিদ্ধান্তকারী নেই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না।

আতঙ্কিত সামরিক একনায়কতন্ত্র নিজের রক্তমাখা নখরগুলো ছাড়া কাকেই-বা বিশ্বাস করবে?

সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে দানবের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক অশুভ সর্বগ্রাসী অবিশ্বাস!

সমস্ত প্রশাসন জুড়ে শুধু ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা আর সন্দেহ।

উপসচিব তার সহকারী সচিবকে বিশ্বাস করছে না, যুগ্ম সচিব উপসচিবকে না, অতিরিক্ত সচিব বিশ্বাস করছে না যুগ্ম সচিবকে, সচিব অতিরিক্ত সচিবকে না, মন্ত্রী সচিবকে না, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীকে না— জনগণ রাষ্ট্রপতিকে না।

১০

আলসের মতোন ব্যস্ত কেউ নেই।

১১

যে উপদেশ দেয় আর যে উপদেশ শোনে, দুজনেই সমান অপরাধী।

যে উপদেশ চায় তার মধ্যে খুঁত নিশ্চয়ই আছে, না হলে সে উপদেশ খুঁজবে কেন?

উপদেশদাতার অপরাধ এখানে যে, উপদেশ সে শোনায় অন্যকে, কিন্তু দেয় নিজেকে।

১২

জীবনে প্রেমের বয়স একটাই— আঠারো। মানুষ যে বয়সে বা জীবনের যে পর্বেই প্রেমে পড়ুক— তার বয়স তখন হয়ে পড়ে ওটাই।

প্রেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের মতো অকারণ বেদনায় হয়ে উঠবে বিষণ্ন, করুণ—

নিজেদের তোবড়ানো তামাটে চেহারা বেমালুম ভুলে গিয়ে রঙিন পাখা মেলে উড়ে বেড়াতে থাকবে প্রজাপতির মতো—

অকারণে গলাগলি-করা নিমগ্ন শিশুদের মতোই হয়ে যাবে ভাবনাহীন, বাচাল— মানুষের সমালোচনা বা বলাবলির ব্যাপারে পুরোপুরি বেপরোয়া, উদাসীন— এক কথায়, প্রথম প্রেমের মতোই উজ্জ্বল আর বেদনার্ত—

প্রথম যৌবনের মতোই হাস্যকর আর করুণ!

১৩

নিজের আত্মার সামনে আমরা সবাই সমান বিবস্ত্র।

১৪

সংকলনও এক ধরনের সংজ্ঞা। পার্থক্য : সংজ্ঞা সবকিছু নিয়ে ছোট হয়ে আসে, সংকলন অনেক কিছু বাদ দিয়ে ছোট হয়।

১৫

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে কেন্দ্রে যাচ্ছিলাম। রিকশার গতি অনুভবহীনরকমে মৃদু। শরৎকাল— আকাশ উজ্জ্বল। সকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশটায় আশ্চর্য সোনালি আভা ঝলমল করছে। হঠাৎ দেখি সামনে দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ সন্ধ্যার সেই স্বর্ণাভ আকাশের ওপর আশ্চর্য রেখায় ফুটে আছে। তাদের সূক্ষ্ম চিকন ডালপালাগুলো লাবণ্য-রেখার মতো জ্বলন্ত আকাশের গায়ে ছড়ানো।

মনে হল : বেঁচে আছি বলেই তো এমন অপার্থিব দৃশ্যটা দেখা হল।

কী অবিশ্বাস্য এই জীবন! অবলীলায় পেয়ে যাই বলে মূল্য দেওয়া হয় না!

১৬

রসুল হতে হলে আগে 'আল-আমীন' হতে হয়।

১৭

দুপুরে কখন একসময় যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতেই, একটা নরম অনুভূতির ভেতর অদ্ভুতভাবে মনে হল কার একটা নীরব অস্তিত্ব আমার মাথার

পেছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমের ঝাপসা ভাবটাকে এক ঝটকায় সরিয়ে স্পষ্ট করে দেখতে চাইলাম : কে?

তাকাতেই তাকে দেখা গেল। আনত আশীর্বাদের মতো মাথার কাছে সে তখনো নীরবে দাঁড়িয়ে : তোমার ভালোবাসা!

১৮

বন্ধুত্ব হল দুজনার কাছে দুজনার চাওয়া, প্রেম, দুজনকে দুজনের চাওয়া।

১৯

১৯৬০ সালের একটি কথোপকথনের স্মৃতি :

প্রশ্ন : তোমরা যে 'আদর্শ আদর্শ' কর— আদর্শের কোনো 'দাম' আছে আজকাল?

উত্তর : কী করে আপনি জানলেন, আমরা দামের জন্যে আদর্শ করি? তা হলে তো যতক্ষণ দাম থাকবে ততক্ষণই আদর্শ, দাম ফুরোলেই 'শেষ'।

প্রশ্ন : তা হলে কেন আদর্শ?

উত্তর : আদর্শকে ভালোবাসি বলে! রক্তের মধ্যে এর চিৎকার নিদ্রাহীন অনুভব করি বলে! এ ছাড়া বাঁচি না বলে!!

২০

খুব ছেলেবেলার স্মৃতির একটা ভাঙা টুকরো— সম্ভবত কোনো একটা ভ্রমণের— মনে পড়ে। মনে আছে অস্পষ্ট কোনো শহর থেকে বাসে করে রওনা দিয়েছি। শহর ছাড়তেই বাসের ডানদিক থেকে আঁকাবাঁকা একটা ছোট্ট নদী হঠাৎ ছুটে এসে আমাদের সঙ্গ নিল। নিল তো নিলই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই ছোট্ট নদী আমাদের সাথে সাথে ছুটল। এর মধ্যে তার প্রস্থ বাড়ল, ঢেউ বড় হল, কিন্তু ছোটার যেন বিরাম নেই। কিছুক্ষণের জন্যে সে হয়ত হারিয়ে চোখের আড়ালে চলে যায়, কিন্তু তার পরেই আবার বাড়ির পোষা কুকুরের মতো গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটে এসে বাসটার সঙ্গে এগিয়ে চলে। একসময় ঘটল এক মজার ঘটনা। যে শহর আমাদের গন্তব্য ছিল তার কয়েক মাইল আগে হঠাৎ করেই নদীটা পুরো অদৃশ্য হয়ে গেল। তার আভাসও আর যেন নেই কোথাও। সবুজ শস্যক্ষেতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আমাদের গাড়ি শহরের ঠিক মাঝখানে— বাসস্ট্যান্ডে এসে থামল। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দোকান, অফিস, লোকজনের চিৎকার, ভিড়। পুরোদস্তুর ঘিঞ্জি একটা জায়গা। হঠাৎ বাসের অন্যপাশের জানালা দিয়ে তাকিয়ে

আমি তো অবাক : সেই নদী। আমাদের আগে পৌঁছে আমাদের থেকে একটু দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার ঢেউ আর বিস্তার এখন আগের চেয়ে অনেক বড় আর উত্তাল।

কাল ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে সেই নদীটাকে আবার দেখতে পেলাম। এগোতে এগোতে এখন একেবারে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর একটু এগোলেই সব গল্পের অবসান।

২১

এত বেশি কেন দাও যে দেবার পরে নিজের জন্যে কিছুই থাকে না।...

২২

স্বাক্ষর-সংগ্রহের ব্যাপারটা আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে মহামারীর চেহারা নিয়েছে। সামনে পড়লে রক্ষা নেই। স্কুল-কলেজে ঢুকলে প্রাণ নিয়ে বেরোনো দায়। আমাদের ছেলেবেলায় পরিচিত মানুষদের চাবকানোর এই মধুর কৌশলটা আমাদের অজানা ছিল।

স্কুল-কলেজের এইসব খুদে স্বাক্ষর-শিকারিদের সামনে পড়ে গেলে সবার খাতায় আজকাল একটা কথাই আমি কেবল লিখি : মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। রক্তের ভেতরে কেন যেন আমি কুসংস্কারের মতোই বিশ্বাস করে ফেলেছি : মানুষ নিজেকে যা ভাবতে পারে, সে তা-ই হয়ে যায়!

২৩

চোরকে চুরির মুহূর্তে হাতেনাতে যে ধরতে পারে, সে কবি; চোর পালাবার পর যার বুদ্ধি বাড়ে, সে সমালোচক।

২৪

১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সে যুদ্ধ ছিল বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে। তাতে আমরা জয়ী।

যুদ্ধের পর অনেকে ভেবেছিলেন, যুদ্ধ চিরকালের মতো শেষ।

অল্পদিনেই তাঁদের ভুল ধরা পড়েছিল। আমরা জেনেছিলাম, আগের যুদ্ধটা আসলে ছিল একটা ছোট্ট সংগ্রাম, একটা সম্পূর্ণ যুদ্ধের প্রথম গোলাবর্ষণের দূরাগত ধ্বনি-মূর্ছনা মাত্র। আমাদের প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এর পরে— তার হিংস্রতা এখন বিস্তীর্যমান।

এই যুদ্ধ রক্তাক্ত এবং নিষ্ঠুর, সর্বাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী— একটা জাতির অস্তিত্বগত যোগ্যতার প্রকৃত পরীক্ষা এটি।

আজকের যুদ্ধ আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে। আমাদেরই পাপ ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ— আমাদের ক্লেদ ও অযোগ্যতার বিরুদ্ধে। আমাদের ভীরুতা, লোভ, ক্ষুদ্রতা এবং নিঃস্বতা এবার আমাদের প্রতিপক্ষ।

২৫

মেয়েরা প্রেমে পড়ে সন্তানের জন্যে, ছেলেরা মেয়েদের জন্যে।

২৬

বছর দুয়েক আগে টেলিভিশনে ঈদের 'আনন্দমেলা' অনুষ্ঠানে উপস্থাপক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন :

"আপনি তো একসময় টেলিভিশনের জনপ্রিয় উপস্থাপক ছিলেন। একটা কথার উত্তর দিন তো আমাদের। পৃথিবীর সবার কাছে একসঙ্গে পরিপূর্ণভাবে জনপ্রিয় হবার উপায় কী?"

আমি সংক্ষেপে বলেছিলাম : 'মারা যাওয়া!'

অন্য দেশের কথা জানি না, কিন্তু বাংলাদেশের জন্যে কথাটাকে অনিবার্য বলেই মনে হয়।

আমরা যে এখনও বেঁচে আছি এ জন্যেই অনেকে আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ। তার ওপর আবার খাচ্ছি দাচ্ছি, কাজকর্ম করছি, ভালো কিছুও করছি— এত কী করে সহ্য করা যায়!

তাদের বাঁকা হাসি বিদ্রূপে আরও ক্রূর হয়ে ওঠে।

"আবার কাজ-টাজও করা হয় দেখছি। একেবারে পরোপকারের মুহম্মদ মহসীন!...আবার হাসেও দেখি!...খুব ফুর্তি, না?...জানি, জানি এত ফুর্তি কোথা থেকে আসে। যেদিন ধরিয়ে দেব!..."

অর্থাৎ ফুর্তিটুর্তি বন্ধ করুন, হাসি বন্ধ করুন— কাজ, উপকার, উদ্যম, উৎসাহ— সবকিছুর ঘরে তালা লাগিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে তক্তপোশের ওপর সটান শুয়ে শান্তিমতো একটু মারা যান— দেখবেন আপনার জনপ্রিয়তা! শুরু হবে জান্নাত থেকে অঝোরে পুষ্পবৃষ্টি! কর্মবীর, দানবীর, চিন্তাবীর, জাতীয় বীর, বীরশ্রেষ্ঠ— সব একসঙ্গে!

"আহা, মানুষ তো নয়, সাক্ষাৎ ফেরেশতা ছিলেন ভদ্রলোক, কী বলেন আপনারা।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,..." বলতে থাকবেন তাঁরাই, যাঁরা আপনি বেঁচে থাকতে ছুরি দিয়ে পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে আপনার হৃৎপিণ্ডটাকে টুকরো টুকরো করেছে।

"বলুন, এ জন্যেই কি তাঁকে ওপারে, অর্থাৎ তাঁর নিজ বাসভূমিতে— পাঠাবার জন্যে আমরা সবসময় চেষ্টা করিনি!"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এতে সন্দেহ কি? হিপ হিপ হুররে। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।"

তাঁদের উদ্দীপ্ত শ্রদ্ধাবর্ষণ দেখে অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার কাছে স্পষ্ট হবে, বেঁচে থেকে এতদিন কী বিরাট লোকসানের মধ্যেই না আপনি ছিলেন!

২৭

আমার মনে হয়, একজন মানুষের 'বড়' হবার পেছনে তার 'বুদ্ধি'র অবদান যতখানি, তার চেয়ে ঢের বেশি তার 'নির্বোধ হতে পারার ক্ষমতা'র অবদান। বিদ্যাসাগরের সেই গল্পটা ধরা যাক। ছোট ভাইয়ের বিয়েতে মা ডেকে পাঠিয়েছেন। অফিসে ছুটি না পেয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ছুটলেন বাড়ির দিকে। পথের ওপর বর্ষার ঢল-নামা ভয়ঙ্কর পাহাড়ি নদী। ঝাঁপিয়ে পড়ে নদী সাঁতরে সময়মতো মা'র কাছে গিয়ে পৌঁছোলেন।

কিংবা বায়েজিদ বোস্তামির সেই গল্প। রাতে ঘুমের ঘোরে মা হঠাৎ পানি চেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বোস্তামি পানি এনে দেখেন— মা ঘুমে। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রের পাশে নিঃসাড় দাঁড়িয়ে রইলেন সারারাত। সকালে ঘুম ভাঙলে মা দেখলেন, বায়েজিদ তাঁর শিয়রে গ্লাস হাতে তেমনটিই দাঁড়িয়ে আছেন।

এমনি আরো অনেক গল্প : যেমন ক্যাসাবিয়াঙ্কার পিতৃভক্তি বা বিদ্যাসাগরের কুলিগিরি, কান্নামথিত হৃদয়ে অশোকের আজীবনের জন্যে অস্ত্রত্যাগ, স্বেচ্ছায় হেমলক পানে সক্রেটিসের মৃত্যুবরণের অবিশ্বাস্য গল্প— যা ছেলেবেলার পাঠ্যবইয়ে মহত্ত্বের উন্নত আদর্শ হিসেবে আমাদের পড়তে হত। সন্দেহ নেই, ঘটনাগুলো যে-কোনো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চোখে উচ্চশ্রেণির নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। এত উচ্চশ্রেণির যে সেগুলো আজো মানবজাতির মহত্তম কল্পকথা হয়ে রয়েছে। এই ঘটনাগুলোতে মানুষগুলোর ওরকম নির্বোধ হতে পারার জন্মান্ধ শক্তিই বলে দেয় মহত্ত্বের উচ্চতম শীর্ষ স্পর্শ করা থেকে এক ইঞ্চি নিচে পড়ে থাকার তাঁদের কোনো কারণ নেই। এই 'অন্যথায়' বুদ্ধিমান মানুষেরা নিজেদের বিশ্বাস বা ভালোবাসার জন্যে, আত্মধ্বংসী পর্যায়ে, সমস্ত স্বার্থবুদ্ধিকে মড়ার খুলির মতো দু'হাতে ছুড়ে ফেলে, যেভাবে নির্বোধের মতো হো-হো করে হাসতে পারেন, তা-ই বলে দেয় জীবনের শিখর স্পর্শের ক্ষেত্রে কী রক্তাক্ত এবং পাশব সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে তাঁরা সক্ষম— যা আমাদের মতো ভেদাভেদহীন সাধারণ মানুষদের হীন চালাকি, চতুর স্বার্থচেতনা কিংবা সতর্কবুদ্ধির সমস্ত নাগালের বাইরে।

২৮

পাপীদের দেখলে জীবনকে চেনা যায় অনেক বেশি।

২৯

অজ্ঞানতার চেয়ে ধর্মহীনতা আর কীসে? অশিক্ষিত মানুষের আল্লাহও অশিক্ষিত।

৩০

সত্যের অবস্থান কি মানুষের উচ্চারিত শব্দে? শুধু ভাষার দ্যুতিময় দীপ্র উদ্ভাসে?

সত্যের আসল ঠিকানা একটাই— জীবন। প্রতিমুহূর্তের জীবনাচরণই কি সত্যের গতিময় সচল রূপ নয়! কোনো মানুষের রাজকীয় মহিমায় হেঁটে যাওয়া, কারো হাত নাড়ার ধীর নিমগ্ন ভঙ্গি— এসবের মধ্যে কি তাঁদের অন্তর্সত্যের সাক্ষাৎ অনেক বেশি নেই, তাঁদের উচ্চারিত অনেক মূল্যবান কথার চাইতে?

জীবনের প্রজ্বলন্ত রূপের ভেতরেই শুধু সত্যকে দেখা যায়। সত্যের লেলিহান শিখা শরীরে মনে অনুপমভাবে জ্বলে ওঠার মুহূর্তেই শুধু— জীবনের অনলিত যন্ত্রণার ঐশ্বরিক আলোর ভেতরেই কেবল সত্যের আসল রূপ।

৩১

ধর্মের জন্যে যা সবচেয়ে বিপজ্জনক, তা, আমার মতে, নাস্তিকতা নয়, অজ্ঞেয়বাদ। নাস্তিকতার সঙ্গে ধর্মের অন্তত একটা বীরোচিত শত্রুতা আছে— এক ধরনের গৌরবের যুদ্ধ।

নাস্তিকতা নিজেও অন্তত একটা 'ধর্ম'— হয়ত সমষ্টিপ্রবণ নয়, ব্যক্তিগত; আনুগত্যপ্রবণ নয়, বিশ্লেষণ-ঋজু।

কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ নিঃশব্দ ঘাতক। প্রতিবাদ করে না, শুধু নীরবে পোড়ায়— গোপনে ধ্বংস করে।

৩২

নৈরাশ্যবাদী আর আশাবাদীর পার্থক্য হল, আশাবাদী দুর্ভাগ্যকে সাময়িক ব্যাপার বলে মনে করে, নৈরাশ্যবাদী চিরস্থায়ী ব্যাপার বলে।

৩৩

সারা অস্তিত্ব জুড়ে হাসির কী উদ্দাম হুল্লোড় ছিল একদিন। সমস্ত শরীর সেই আদিমতার বন্য অত্যাচারে যেন ফালি ফালি হয়ে যেত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। আমি আর আমার এক বন্ধু কার্জন হলের পুবদিকের বিরাট শিরীষ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। হঠাৎ কী একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে এমন উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়লাম যে নিজের হাসির দমকে নিজেকেই চমকে উঠতে হল। স্পষ্ট দেখলাম— হাসিটার উচ্চকিত অত্যাচার শান্ত সন্ধ্যাটাকে টুকরো টুকরো করে, দেয়ালগুলোতে ধাক্কা খেয়ে, গাছগুলোর গা ঘষটাতে ঘষটাতে বিদ্যুৎগতিতে কার্জন হলের পশ্চিম কোণের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যাচ্ছে। শিরীষ গাছটার একটা বড় ডাল একরাশ বড় সবুজ পাতা নিয়ে আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকাতেই দেখলাম— হাসির ধাক্কায় সেই পাতাগুলোও যেন কাঁপছে।

একদিন এমনি হাসির বন্যতা ছিল সারা অস্তিত্বে।

৩৪

আমার মেয়ে লুনার দু'মাস ধরে জ্বর। কী কষ্ট করে যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল! অনেক ডাক্তার দেখানো হল— কিচ্ছু হচ্ছে না। খুব ভয় করছে। সারাক্ষণ কীভাবে পাহারা দিয়ে আমাকে আগলে রাখে! আমার প্রতিরক্ষায় যেন একটা জাগ্রত দুর্গ। ছেলেবেলায় হারানো মাকে ওর মধ্যে দেখতে পাই। আজকাল ওর দিকে তাকালেই খারাপ লাগে। কটা দিন আর। বড়জোর দুই, পাঁচ বা ছয় বছর— তারপরেই চলে যাবে। কখন যে বড় হয়ে গেছে, টেরই পাইনি। হায় অভিশপ্ত ব্যস্ততা! ওদের নিয়ে একসাথে বসে কটা দিন কাটাবার সময় হল না। আজকাল সামান্য সময় পেলেই ওর সাথে গল্প করি। কেবল মনে হয়, ওকে আজও ভালো করে আমার দেখা হয়নি। সকালে যখন ও আর জয়া স্কুলে যায়, আমি তখন বারান্দায় বসে ওদের দুদণ্ডের সেই যাওয়াটুকু প্রাণ ভরে দেখি। ওরা কোনোদিন জানবে না, ওদের এই মমতাহীন নির্দয় বাপ দুটো স্নেহমেদুর চোখ হয়ে কীভাবে নিঃশব্দে ওদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

আজ ওর বিদায়ের সময় এগিয়ে আসছে!

প্রত্যেক পিতাকেই সন্তানের মৃত্যু বহন করতে হয়। যেমন প্রত্যেক সন্তানকে পিতার।

৩৫

সকালবেলা তখনো বিছানা ছেড়ে উঠিনি। আমার ছোট মেয়ে জয়া স্কুলে যাবার আগে ঘরের ভেতর মাথা বাড়িয়ে চটপট বলে গেল : 'আব্বু আসি।' রোজই

বলে। কিন্তু আজ এমন লাগল কেন? 'আব্বু আসি' এই চেনা কথাটাও কেন এমন আর্তনাদের মতো শোনাল। কেন মনে হল শেষবারের মতো ওকে দেখছি!

প্রত্যেকটা বিদায় কেন শুধু চিরবিদায়ের মতো শোনায়!

৩৬

দুটো গুণের জন্যে মেয়েরা ছেলেদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, অপ্রতিরোধ্য আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দেখা দেয়। সেগুলো হল : ন্যাকামি আর নিষ্ঠুরতা। কোনো মেয়ের ন্যাকামির 'প্রতিভা'কে চারপাশের অন্য মেয়েদের চোখে যত অসহ্যই মনে হোক (আমার ধারণা, এর অনেকটাই ঈর্ষাপ্রসূত), খুব অল্প মেয়ের মধ্যেই ন্যাকামির এই নন্দিত সৌন্দর্যটা রয়েছে। এটা একজন পুরুষের তপ্ত কামনাদগ্ধ সতৃষ্ণ ঠোঁটের দিকে একটি রমণীয় নারীসত্তার সবচেয়ে অপরূপভাবে নুয়ে আসা, তার দুর্বোধ্য চতুর ছলনা-প্রতিভার সবচেয়ে বিস্ময়কর কমনীয় উপহার। এটা একটা মেয়ের সেই লাজরক্তিম কুহকী চপল মেয়েলিয়ানা, যা ছেলেদের কাছে তাকে করে তোলে ভালোবাসার কাম্য গোলাপ, বিছানায় অনিন্দ্য, রহস্যময়।

নিষ্ঠুরতা হচ্ছে পুরুষ-হৃদয়ে মেয়েদের সেই আততায়ী নির্দয় রক্তাঘাত, যা ভেসে-যাওয়া একবুক রক্তের সাথে একটা মেয়েকে একজন পুরুষের স্বপ্নে চির-যন্ত্রণাময়, চির অপ্রাপণীয় ও চির-মধুর করে রাখে।

৩৭

একজন কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর 'কবি'কে, ব্যর্থগুলোর মধ্যে তাঁর 'মানুষ'কে।

৩৮

যার ভালোবাসার মানুষ অনেক, সে-ই বলতে পারে— তার কেউ নেই।

যার 'প্রেম' থাকে, তার থাকে কেবল একজন।

৩৯

ধরা যাক, বেশকিছু লোকের একটা বড়সড় জনতা স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। জনতা আপনার মুখোমুখি, শ'খানেক গজ দূরে। জনতার যারা সদস্য তাদের গড়পড়তা উচ্চতা সাধারণ বাঙালির মতোই— পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মধ্যে। ধরুন, এ অবস্থায় আপনি দলের মধ্যে একজন মানুষ

দেখলেন যার উচ্চতা পুরো ছ'ফুট। এখন পুরো দলটার দিকে তাকালে কাকে সবচেয়ে আগে চোখে পড়বে আপনার? কাকে মনে হবে দলের প্রধান ব্যক্তি— দলনেতা— দলটির সমস্ত শক্তি, উদ্দীপনা আর দীপ্তি যার মধ্যে প্রতীকায়িত। নিশ্চয়ই ওই ছ'ফুট মানুষটিকেই— নয় কি?

অথচ দলের অন্যসব দীর্ঘ লোকগুলোর সঙ্গেই তার উচ্চতার পার্থক্য কতটুকু? মাত্র চার ইঞ্চি। তাহলে মানেটা দাঁড়াচ্ছে কী? দাঁড়াচ্ছে যে, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি পর্যন্ত তিনি দলের অনেক মানুষেরই সমান। আলাদা কেবল চার ইঞ্চির তুচ্ছ একটু পার্থক্যে।

কিন্তু কী বেদনাময় ওই তুচ্ছ চারটি ইঞ্চির ব্যবধান! কী সামান্য অথচ অলঙ্ঘ্য, ছোট অথচ সুদূর, যা একজন মানুষকে সাধারণ স্তর থেকে ছোঁ মেরে একেবারে শ্রেষ্ঠত্বের বেদিতে তুলে নিয়ে যায়!

প্রতিভাবান মানুষেরাও কি এমনি? সমস্ত জায়গাতে আর দশটা মানুষেরই মতো, কেবল কোনো একটা বিশেষ জায়গায় অল্প একটু ওপরে— ওই চার ইঞ্চির নিষ্ঠুর ব্যবধানের মতো! অথচ কী দুর্লঙ্ঘ্য এই চারটি ইঞ্চি, কী ক্ষুদ্র আর অপরিমেয়, কী হাস্যকর আর অশ্রুময়— সারাজীবন দাঁড় বেয়েও যাকে পেরিয়ে যাওয়া যাবে না।

৪০

কাল হঠাৎই যিশুর মহান উক্তিটা মনে এল : এক গালে চড় দিলে আরেক গাল পেতে দিও।

মনে হল : কেউ যদি সত্যি সত্যি ঘণ্টাখানেকের জন্যেও ব্যাপারটাকে জীবনে ঘটতে দিত! অসহায়ের মতো দেখত 'গণ্ড' বলে তার প্রিয় সুন্দর প্রত্যঙ্গ দুটো চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন! জগতের মহত্তম বাণী তাহলে কোন্‌গুলো?— যেসব কথার বাস্তব আচরণ পৃথিবীতে অসম্ভব বলেই বইয়ের অমূল্য পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা হয়?

৪১

সব মানুষের জীবনেই একটা 'চেহারা দেখানো'র মরশুম থাকে। নিজের মুখটাকে, ধানের আঁটির মতো উঁচু করে সবার সামনে তুলে ধরার ইচ্ছায় আত্মা আবিল হয়। আমারও হয়েছিল একসময়।

টিভি-দর্শকদের অফুরন্ত ভালোবাসা একসময় স্নিগ্ধ স্নেহধারার মতোই সেসব কিছু মুছে দিয়ে গেছে। কেউ আজ আমাকে তাকিয়ে দেখল কি না, সেটা আমার কাছে আর কোনো প্রসঙ্গই নয়। যেন এই মানবিক অনুভূতিটারই মৃত্যু ঘটে গেছে। আমি যেন একদল অচেনা অপরিচিত মানুষের ভিড়ে রাস্তা ধরে হেঁটে

যাচ্ছি— তাদের প্রিয়তা-অপ্রিয়তা সবকিছুর বাইরে, সম্পূর্ণ একা। আজ আমার বিবেচ্য বিষয় একটাই : আমার 'দায়িত্ব!'— আজ এ আমার একমাত্র ঈশ্বর! একটা উদ্যত, প্রভুভক্ত নৈশ কুকুরের মতো আমি কেবল তার প্রতিই জাগ্রত।

৪২

ছেলেবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম— উনিশ শতকের অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে নিয়ে। গল্পটা সত্য মিথ্যা দুই-ই হতে পারে। গল্পটার উদ্দেশ্য ছিল অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়-প্রতিভার দীপ্তি লোকচক্ষে তুলে ধরা।

নীলদর্পণ নাটকে লম্পট রোগ-এর ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন তিনি একদিন। তাঁর অভিনয়প্রতিভা লম্পট রোগ-এর চরিত্রকে এমন জীবন্ত করে তুলেছিল যে, মনে হচ্ছিল দর্শকদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আমুণ্ডুপদনখ এক শয়তান। ক্ষেত্রমণির ওপর বলাৎকারের দৃশ্যে সেই শয়তান হয়ে উঠল প্রায় জাতীয় অসম্মানের মূর্তিমান প্রতীক। ঠিক সেই সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা চটি ছুটে এসে আচমকা আঘাত করল শয়তানের মুখে। স্তব্ধ হয়ে গেল মঞ্চের ওপরকার ক্লেদাক্ত বেলেল্লাপনা।

সবাই দেখল, দর্শকদের সামনের সারিতে বালকের মতো অপ্রতিভ বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। নিজের কৃতকর্মের লজ্জায় নিজেই লজ্জিত। বাস্তব ভেবে প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় একটা স্বপ্নের মাথায় পাদুকা নিক্ষেপ করে বসে আছেন তিনি!

অর্ধেন্দুশেখর মাটি থেকে চটি তুলে নিয়ে তা স্থাপন করলেন নিজের মাথায়। নত মস্তকে বললেন, আজ আমার অভিনয় সার্থক, কেননা স্বয়ং বিদ্যাসাগরের চটি আমার দিকে ধাবমান হয়েছে।

অর্ধেন্দুশেখরকে নিয়ে এই গল্প; আর সবার দৃষ্টিও অর্ধেন্দুশেখরের ওপরেই। বাঙালির স্মরণে তাঁর স্মৃতিকে চিরজাগরূক করাই হয়ত এই কিংবদন্তির উদ্দেশ্য।

কিন্তু আর একজন মানুষ আছেন এই গল্পের মধ্যে, যাঁর চেহারা ঠিক ততটা চোখে পড়ে না। গল্পের মূল উদ্দেশ্যও তিনি নন। তিনি আছেন এই গল্পের নেপথ্যে। তার মুখের ওপর সময়ের আবছা অন্ধকার, কারণ তিনি বসে আছেন দর্শকদের সারিতে, ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে। তিনি বিদ্যাসাগর।

অন্তত একজন মানুষ হেঁটে বেড়াতেন এদেশের রাস্তায়, যাঁর চটির ক্ষমাহীন ধার থেকে কোনো অন্যায়ের নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁর এই একগুঁয়েমিকে সাহায্য করার জন্যে প্রকৃতি তাঁর পায়ে ওই চটি পরিয়ে দিয়েছিল।

দেশ জানত, তাঁর সামনে থেকে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদহীনভাবে বেঁচে যাওয়া সম্ভব নয়। ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে যাবেন তিনি, তাঁর 'বিখ্যাত' চটি চোখের পলকে বাতাস কেটে ছুটে যাবে সেই উৎপীড়কের দিকে— তা সে অত্যাচারী বাস্তবেরই হোক কিংবা মঞ্চের। হোক শয়তান কিংবা শক্তিমান।

চোখে অশ্রু নিয়ে তাঁকে আমি আজো খুঁজি বাংলাদেশের রাস্তা থেকে রাস্তায়। তাঁর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকি।

হঠাৎ কারো কারো মুখ দেখে ভুল করে মনে হয়, ওই তো তিনি দাঁড়িয়ে!

মনে হয়, এত অসংখ্য মানুষের ভিড়ে শুধুমাত্র তাঁকেই কেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নিশ্চয়ই আছেন কোথাও এদেশে— এত মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র একজন মানুষ কিছুতেই অপ্রাপণীয় হয়ে যেতে পারেন না।

৪৩

যতদিন অতীত নিয়ে মানুষের বৈষয়িক স্বার্থ থাকে, ততদিন সঠিক ইতিহাস রচিত হওয়া অসম্ভব।

৪৪

গল্পটা পড়েছিলাম ছেলেবেলায়, কোনো বইয়ে।

গল্পটা এরকম :

এক বাজিকরের ছিল একটা বানর আর একটা ছাগল। তাদের দিয়ে সে মানুষদের খেলা দেখাত। একদিন খেলা দেখাতে দেখাতে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ায় বাজিকর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে এক ভাঁড় দই কিনে আনল। তারপর একটা পুকুরপাড়ে বানর আর ছাগলটার পাশে দইয়ের ভাঁড়টাকে রেখে স্নান করতে নেমে পড়ল পুকুরে।

বানরটা ছিল খুব লোভী। সে সামনে দইয়ের ভাঁড় দেখে লোভ সামলাতে পারল না। বাজিকর পুকুরে নামার পরই সে তাড়াতাড়ি ভাঁড়ের সবখানি দই খেয়ে ফেলল আর বাজিকর যাতে এই অপকর্মের কথা বুঝতে না পারে সেজন্যে বেশ খানিকটা দই ছাগলের দাড়িতে মাখিয়ে নিজে ভালো সেজে বসে রইল।

স্নান সেরে পাড়ে উঠে বাজিকর দইয়ের ভাঁড় খালি দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। ছাগলের দাড়িতে দই দেখে তার বুঝতে বাকি রইল না কাজটা কার। ক্ষিপ্ত হয়ে সে ছাগলটাকে লাঠি দিয়ে বেদম মারতে শুরু করল।

ছেলেবেলায় পড়া গল্পটা হুবহু মনে পড়ছে। গল্পটার এই জায়গায় এসে এরকম কিছু কথা ছিল :

"কিন্তু একটি লোক দূরে বসিয়া সকল কিছুই দেখিয়াছিল। বাজিকর ছাগলকে মারিতে শুরু করিলে সে সামনে আগাইয়া আসিয়া তাহার কাছে 'প্রকৃত ঘটনা' খুলিয়া বলিল এবং ছাগলকে না মারিতে অনুরোধ করিল। বাজিকর তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কৃত অন্যায়ের জন্যে দুঃখিত হইল।"

গল্পটার কথা মনে হলেই ভাবি, ওই যে লোকটি দূরে বসে সবকিছু লক্ষ করছিল, সে লোকটি আসলে কে? হঠাৎ কোথা থেকে বেরিয়ে এসে সে 'আসল সত্য' এভাবে প্রকাশ করল? কোথা থেকে কীভাবে সে সবকিছুই নির্ভুলভাবে দেখে যায়? গোপনে বা প্রকাশ্যে, যে যেখানে যা-ই করুক, তার চোখ থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই।

একসময় বুঝেছি, এই লোকটিই 'ইতিহাস'। প্রকৃতির অনিবার্য বিধানে সবার অলক্ষে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সে সবকিছু শুধু দেখে।

৪৫

ঈশ্বর হারানোর ভয়ই মানুষের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক, তা সে ধর্মের ঈশ্বরই হোক আর ভালোবাসার ঈশ্বরই হোক।

৪৬

প্রেম এমন একটা ব্যাপার, যা নির্বিবেক পাশবতাকেও মধুর করে তোলে।

৪৭

কাপুরুষেরা নাকি মৃত্যুর আগে একশবার মরে। আমিও এমন কাপুরুষই হতে চাই— ওই একশ বার মরতে পারার লোভে।

একশ বার মরা যদি মৃত্যুর আগেই হয় তবে একশ বার বেঁচে ওঠাও তো ঘটবে মৃত্যুর আগেই। তাহলে কেন মৃত্যুর আগের এই একশ বার মৃত্যু নয়, একশ বার বেঁচে ওঠার লোভে?

কী অবিশ্বাস্য পুলক এমনি একশ'টা অভাবিত নতুন জন্মে!

সুতরাং জয় হে কাপুরুষতা, হে মৃত্যুর আগের একশ বারের হীন মৃত্যু!

৪৮

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসটা পড়েছিলাম অল্প বয়সে। মনে আছে, উপন্যাসের নায়ক নিতাইচরণ অস্তিত্বের একটা মৌলিক অসম্পূর্ণতার প্রসঙ্গ বারে বারে ফিরিয়ে এনে প্রশ্ন করেছিল : 'জীবন এত ছোট্ট কেনো!'

অন্যায় অসন্তোষজনক আমাদের জীবনের এই মৌলিক খেদ আমাকে বিমর্ষ করেছে অনেকদিন।

তবু জীবন শেষ পর্যন্ত অপরিমেয়।

কেবলই মনে হয়, আজ পর্যন্ত যত মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মেছে, যত মানুষ বেঁচে আছে কিংবা বিশ্বের বিলয় পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেবে, বেঁচে থাকবে— সেইসব মানুষের সমস্ত সম্মিলিত জীবনকে আমাদের এই একটা ছোট্ট জীবন-পরিসরটাতে সজাগভাবে বা অগোচরে আমরা সবাই তো যাপন করেই যাই।

সেদিক থেকে একজন মানুষের জীবন তো আসলে পুরো মানবজাতিরই জীবন।

তাহলে কেন আমরা কাঁদি?

আর কেন কাঁদে তারাশঙ্করের নিতাইচরণ?

৪৯

যখনই মাঠের ধারের ছোট্ট সাইনবোর্ডে এ ধরনের লেখা চোখে পড়বে :

'মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিবেন না',

অমনি বাঙালির তাবৎ বীরত্ব একসঙ্গে চাগিয়ে উঠবে :

'হাঁটতেই যদি হয় তবে এই মাঠের ভেতর দিয়েই হাঁটব।'

'ঠিক আছে, হেঁটে যাও হে বাঙালি', 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', তোমার পরাক্রম কে ঠেকায়? কিন্তু প্রশ্ন একটাই : 'কষ্ট করে গোটা মাঠটা ঘুরে না গিয়ে নিয়ম ভেঙে মাঠের মাঝখান দিয়ে সরাসরি যে পা চালালে— উদ্দেশ্যটা কী?'

'উদ্দেশ্য সোজা। দূরত্ব কমানো!'

'মানছি! কিন্তু তোমার মতো প্রাগৈতিহাসিক আলসের পক্ষে তো কেবল পথের দূরত্ব কমানোর কথা নয়— বরং দূরত্বকে একেবারে সংক্ষিপ্ততম করে ফেলারই কথা'।

'তা, অবশ্যি, বলতেও পার।'

'আচ্ছা, জ্যামিতির বইয়ে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথকে কী যেন বলে?'

'কেন, সরলরেখা? দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্বকে সরলরেখা কহে— (এও জান না নাকি?')।

তবে হে বাঙালি, মাঠের মাঝ বরাবর তোমার এই পায়ে-হাঁটা পথটার তো সরলরেখা হবারই কথা? যেহেতু দূরত্বটাকে সংক্ষিপ্ততম করাই ছিল তোমার লক্ষ্য?'

কিন্তু এইসব মাঠ বা লনের ভেতর দিয়ে যেসব হাঁটা-পথ দেখা যায়, ভালো করে তাকিয়ে দেখেছ সেগুলোকে? কিংবা রেললাইনের ধার ধরে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে-যাওয়া সরু সরু পায়ে-চলার পথগুলোকে? ওগুলো কি সরলরেখা?

নাকি খেয়ালখুশিতে এগিয়ে-যাওয়া আঁকাবাঁকা এলোমেলো এক ধরনের আনমনা রেখা কেবল। যেন জোছনা-রাতে চাঁদে-পাওয়া কোনো অবাস্তব মানুষ নিজের খেয়ালে একটা অলীক পৃথিবীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেছে।

আমরা মানুষেরাও কি অমনি? স্পষ্ট আর অবাস্তব, প্রত্যক্ষ আর প্রতীকী, রহস্যময় ও কুহক-ভরা? অনিশ্চয়তার অলীক জোছনা-তলা দিয়ে এগিয়ে-চলা আলোছায়ার দীর্ঘ অলৌকিক একেকটা চলমান আঁকাবাঁকা রেখা?

৫০

ছোট্ট এক ফোঁটা অমৃতের জন্যে কি অভদ্ররকম মূল্যই না দিতে হয় জীবনে!

৫১

১৯৬৩-র একটা স্মৃতি। আগস্ট কি সেপ্টেম্বরের। আমি আর ম. আমেরিকান তথ্য কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে (তখন এ ছিল জাতীয় প্রেসক্লাবের উল্টোদিকে) পাশাপাশি উদ্দেশ্যহীন হেঁটে যাচ্ছি।

ফিরে ফিরে ওর হাত আর আঁচলে আমার হাতের আলতো ছোঁয়া, আর আগুনের ফুলকির মতো উষ্ণ শারীরিক অনুভূতি। হাঁটতে হাঁটতে রমনা পার্কের কাঁটাতারের বেড়ার ফোকর দিয়ে পার্কের ভেতর ঢুকে পড়লাম নির্বিকার, অবৈধ। একটা বিরাট গাছের নিচে মুখোমুখি বসলাম— এখন যেখানে মসজিদটা উঠেছে তার খানিকটা উত্তর ঘেঁষে। (গাছটা এখনো একইরকম আছে— আমাদের সেদিনের বিস্মৃত শপথের নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ সাক্ষী।) কী অপার্থিব আনন্দ-জ্বলা একটা মুহূর্ত! নিজেকে মনে হচ্ছিল তরুণ দেবতার মতো। হঠাৎই মনে হল : একটু পরেই এই ছোট্ট সময়-পর্বটা মিলিয়ে যাবে। আমাদের সোনালি বয়সের এই দুর্লভ সুন্দর মুহূর্ত একরাশ ছাই হয়ে পড়ে থাকবে গাছটার নিচে। ম.-কেও বললাম কথাটা। ও ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিয়তির অনিবার্য নিষ্ঠুর বিধানের সপক্ষে মানুষের নিরুপায় ব্যথিত অনুমোদন।

'ভাবো তো'— বললাম— 'এই যে ছোট্ট মুহূর্তটায় আমরা এখন সামনাসামনি বসে আছি, এর জন্মের জন্যে বিশ্ব-সংগঠনের করিডোরে কত লক্ষ কোটি ঘটনাপ্রবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার দরকার ছিল। বেশি দূরের কথা নাই-বা ভাবলাম; এই সেদিনের কথা, সূর্যের বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিগোলকটা থেকে পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকেই ভাবা যাক। তপ্ত বাষ্পপিণ্ড থেকে ক্রমে জলবেষ্টিত শক্ত গোল প্রাণময় জগৎ হিসেবে এই পৃথিবীর আত্মপ্রকাশ, প্রথম প্রাণীর উদ্ভব থেকে সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রযাত্রা, আদিম রক্তের ধারাবাহিকতায় এই অভিন্ন ভূখণ্ডে

তোমার আমার পিতৃপুরুষের উদ্ভব, একটা আশ্চর্য সময়-ব্যবধানে তোমার আমার জন্ম, অভিন্ন নাগরিক সান্নিধ্যে আমাদের বেড়ে-ওঠা, অপ্রত্যাশিত সব ঘটনাক্রমের ভেতর দিয়ে আমাদের নৈকট্য, গাছের ছায়ায় মুখোমুখি বসতে চাওয়ার আজকের এই আকুতি— এমনি কত লক্ষ কোটি ঘটনার নির্ভুল পরম্পরার দরকার ছিল সামান্য এই মুহূর্তটার জন্মের জন্যে। এই অনন্ত ধারাবাহিকতার কোথাও, কোনো একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ পর্যায়ে, সামান্যতম ভিন্নতা ঘটলেও এর সবকিছু স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যেত। কী অনুকূল ঘটনা-পারম্পর্যের ভেতর থেকে জেগে-ওঠা আমাদের আজকের এই দুর্লভ অবিশ্বাস্য সময়ক্ষণ!

অথচ কী অবলীলায় আমরা একে হারিয়ে ফেলব। বিকেলটা কিছুক্ষণের মধ্যে আরেকটু গড়িয়ে গেলেই আমরা যে যার প্রয়োজনের দিকে উঠে দাঁড়াব, আর সাথে সাথে দীর্ঘ দীর্ঘ সৃষ্টিযাত্রার ভেতর থেকে মুখ-জাগানো এই অসম্ভব মুহূর্তটার আগাপাশতলা মিথ্যা হয়ে যাবে।'

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে কেবল একটা মুহূর্তের জন্যে কথাটাকে সত্যি মনে হয়েছিল, আজ সারা জীবনের জন্যে।

৫২

সেই কবেকার কথা। সময়ের কুয়াশায় উঁচু মাস্তুলের মতো নিজের ঝাপসা একহারা চেহারাটা এখনো চোখে ভাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্রদের সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা করছিলাম। একুশ বছরের সেই যুবকের ভারাক্রান্ত মনে কী সব কথা সেদিন ব্যথিয়ে উঠেছিল, মনে নেই। কেবল মনে আছে, বক্তব্য শেষ করেছিলাম একটা গল্প দিয়ে। গল্পটা এরকম :

পৃথিবীতে ছিল এক গাল্পিক মানুষ। রক্তের প্রতিটা কণায় অনুক্ষণ সে লালন করত গল্প বলার এক নিদ্রাহীন উৎসাহ। রাস্তাঘাটে বাড়িতে পার্কে বা অন্য কোথাও বন্ধু কিংবা পরিচিত কারো দেখা পেলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার শার্টের মাঝখানের বোতামটা ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একমনে গল্প জুড়ে দিত।

একদিন তার এক বন্ধুকে নিয়ে ঘটল এক মজার ঘটনা। বন্ধুটি এমনিতেই অফিসে রওনা দিতে দেরি করেছে। তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় পরে রাস্তা দিয়ে সে যখন পাগলের মতো অফিসমুখো ছুটছে, ঠিক তখনই সে পড়ে গেল ওই গাল্পিক বন্ধুর সামনে। আর যায় কোথায়! লোকটা সঙ্গে সঙ্গে তাকে দাঁড় করিয়ে যথারীতি তার শার্টের মাঝ-বোতামটা ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একমনে গল্প শুরু করে দিল।

গল্প বলা পনের মিনিট ছেড়ে আধঘণ্টা, আধঘণ্টা ছেড়ে এক ঘণ্টা হয়ে যায়। তবু সে থামে না। এদিকে অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তায় উত্তেজনায় লোকটা

অস্থির হয়ে উঠল। ভাবতে লাগল কী করে ছাড়া পাওয়া যায় গাল্লিকের হাত থেকে! চট করে একটা বুদ্ধি এল লোকটার মাথায়। চাবির রিঙের সাথে ঝোলানো ছোট্ট ছুরিটা বের করে তা দিয়ে বোতামের সুতোটা চুপ করে কেটে, লোকটা বোঝার আগেই, তার সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল।

এদিকে সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। লোকটার অফিস ছুটি হল। হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছে সে। কিন্তু এ কী দেখছে সে রাস্তার ওপর! দেখল, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে গাল্লিক লোকটা সকালে তাকে আত্মবিস্মৃতের মতো গল্প শোনাচ্ছিল, সেখানে, সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে, সে তখনো তার ফেলে-যাওয়া বোতামটাকে আঁকড়ে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে গল্প বলে চলেছে।

গল্পটা শেষ করে বিদায়ী বক্তব্যটায় বলেছিলাম : এরপর এক এক করে কেটে যাবে কত দিন,... কত সকাল গড়িয়ে যাবে দুপুরে, দুপুরেরা নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের এই চারটা বছরকে ঘিরে আমাদের এই গল্প বলা কোনোদিন কি থামবে?

আজ অন্যভাবে কথাটা নিয়ে ভাবি। মনে হয়, জীবনের নিঃসঙ্গ বোতাম আঁকড়ে মানবজাতির এই গল্প বলা কোনোদিন কি থামে?

৫৩

সাধারণ মানুষ ঝগড়া করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, আলোকিত মানুষ মতবাদের স্তরে।

৫৪

সবাই 'স্থূলতা'র খোঁজেই প্রথমে একখানে হয়, তারপর যে যার অনির্বচনীয়ের দিকে হেঁটে যায়।

৫৫

প্রত্যেকটা বিদায় কি আসলে একেকটা প্রত্যাবর্তন?

৫৬

নিজের প্রবণতার পক্ষে যেতে পারা উন্নতি; বিপরীতে যেতে পারা ঋদ্ধি।

৫৭

ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে : 'ভালো মুসলমান সে, যে দিনে অন্তত পাঁচবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে' (অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়)। ভয় তাকে মহৎ করে তোলে।

পরীক্ষার ভয়ে যে ভীত, তার নাম 'ভালো ছাত্র'।
শত্রুর ভয়ে যে ভীত, সে 'বীর'।
দারিদ্র্যের ভয় থেকে বাঁচতে গিয়েই মানুষ সম্পদশালী!
মৃত্যুর বেদনা থেকে বাঁচার চেষ্টাতেই আমরা জীবনপ্রেমিক।
তাহলে ভয়কে এত ভয় কিসের?

৫৮

গল্পটা ঠিক কার লেখা মনে নেই। ছকটুকু শুধু মনে আছে। বছর ত্রিশ-চল্লিশ বিদেশে কাটিয়ে এক ভদ্রলোক নিজের গ্রামে ফিরে ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজখবর নিচ্ছেন।

না, কেউ নেই এখন এখানে। প্রায় সকলেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে, কেউ কেউ পৃথিবী ছেড়ে।

ছেলেবেলার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিনহাযকে আর পাওয়া যাবে না এখানে। ছেলেবেলায় গ্রামের উত্তর-ধারের বিলে বক ধরার ফাঁদ পাতায় যে ছিল তার নিত্যসঙ্গী— সেই কচি মুখের মিষ্টি মিনহায বছর বিশ-পঁচিশ আগে সেই যে মধ্যপ্রাচ্যে গেছে, আর ফেরেনি। ফিরবেও না। বশিরও নেই আজ। ম্যাট্রিক পাস করে সেই যে ঢাকা চলে গিয়েছিল, আজ অব্দি সেখানেই। ভুলেও গ্রামের কথা মনে করে না। মতিউর মারা গেছে বছর পাঁচেক আগে। আমিনুল আমেরিকায় ডাক্তারি করে, বিস্তর পয়সার মালিক। না, কেউ নেই, কোথাও। ছেলেবেলার রাস্তাঘাট, স্মৃতি, বন্ধু-বান্ধব, দুঃখ-শোক কিছুই নেই কোনোখানে।

কিন্তু না— সবকিছু শেষ হয়ে যায় নি একেবারে। আছে এখনো গ্রামে একজন। একমাত্র সেই শুধু বেঁচে আছে একচ্ছত্র সম্রাটের মতো। দে-পাড়ার মতলব আলি। ছেলেবেলার সেই 'মতলব'। স্বাস্থ্য আর পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে বহাল তবিয়তে একমাত্র 'মতলব'ই শুধু বেঁচে আছে আজো এই গ্রামে।

দেশের সবখানে, সমস্ত কিছুর ওপর মাথা উঁচিয়ে, একমাত্র একচ্ছত্র 'মতলব'ই যেন শুধু বেঁচে আছে আজ।

৫৯

মতবাদ ছাড়া কোনো বাঙালি নেই।

জানুক না জানুক, বুঝুক না বুঝুক, সব বিষয়ে তার একটা বিজ্ঞ মতবাদ থাকবেই। শুধু থাকবে নয়, সবচেয়ে নির্ভুল, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠভাবেই থাকবে। পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ে বিশদ জ্ঞান না থাকলেও যে একজন মানুষ সম্মানজনকভাবে

বাঁচতে পারে, এটা তার বিশ্বাসের বাইরে। বরং সব বিষয়ের যাবতীয় জ্ঞান যে সন্দেহাতীতভাবে তার করায়ত্ত— বিনা সংশয়ে এটাতেই তার একমাত্র আস্থা। অথচ এই বিশ্বাসের ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে প্রায় পরিপূর্ণ অজ্ঞতা নিয়ে। ফলে জগতের সমস্ত বিষয়ের সমস্ত কিছু সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানে না এমন বাঙালি পৃথিবীতে নেই।

ধরুন, কোনো পাড়ায় একটা বিশেষ নম্বরের বাড়ি খুঁজতে গেছেন আপনি, কিন্তু পাচ্ছেন না। হঠাৎ রাস্তার পাশে মার্জিত চেহারার একজন সুবেশ ভদ্রলোককে দেখে আপনি আশান্বিত হলেন : হয়ত হদিস মিলবে তাঁর কাছ থেকে। দেখবেন আপনার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক প্রথমে বাড়িটার অবস্থান সংক্রান্ত চিন্তার ভেতর ক্ষণিকের জন্যে ডুবে যাবেন, চিন্তার গভীর রেখা কপালে ফুটিয়ে দার্শনিকের মতো গম্ভীরভাবে ভাববেন মিনিট দুয়েক, তারপর এক অনন্য মুহূর্তে, আবিষ্কারের ঐশ্বরিক দীপ্তিতে জ্বলে উঠে বলতে শুরু করবেন : ওই যে গাছের তলায় গরুটা দাঁড়িয়ে আছে দেখছেন, ওটাকে পেরিয়েই বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরবেন— তারপর এগিয়ে যাবেন সোজা ডানদিকে। হাঁ, কমপক্ষে আধ মাইলতক গিয়েই ধরবেন বাঁ দিকের তালগাছওয়ালা গলিটা...ইত্যাদি...। এমনিভাবে ডান-বাম বাম-ডান করে রাস্তার যে নির্দেশনা তিনি আপনাকে দেবেন, সেটা ধরে এগিয়ে গেলে, আমি নিশ্চিত যে, কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর আপনি দেখবেন, শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে, আপনার সেই বাড়িটার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন কোনো জায়গায়, একটা ধু-ধু মাঠের ভেতর কোনো বটগাছতলায় আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ভদ্রলোকটি কষ্ট করে আপনাকে সবই জানাবেন, শুধু বাড়িটার আসল হদিস যে তাঁর জানা নেই, ওটুকুই কেবল বলবেন না।

৬০

প্রতিটি পুরুষ আর নারীর সান্নিধ্যের মাঝখানে নিঃশব্দে যে দাঁড়িয়ে থাকে, তার নাম প্রেম।

৬১

মহাসড়কের বুকের ওপর দিয়ে বিরাট আকারের একটা আন্তঃনগর বাস যাচ্ছে। দু'পাশের জনপদকে উপেক্ষা করে, মাঠ ঘাট প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে পরাক্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে সেই গাড়ি।

বাসের যাত্রীদের অনেকে যাত্রার বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমিতে বিরক্ত। কেউ কেউ গন্তব্যের উত্তেজনায় অস্বস্ত, স্বপ্নাতুর।

সামনের সিটে এক ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর পাশেই আরেকজন শূন্য দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ওদিকে একজন ষণ্ডামতো লোক আজকালকার বাস দুর্ঘটনার কথা বেমালুম ভুলে সিটে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন— নিশ্চিন্তে। বাসের মাঝামাঝি জায়গায় দুজন লোক মাঝেমধ্যে গল্প জমানোর চেষ্টা করছে, গাড়ির ঝাঁকিতে খুব একটা জমছে না। একজন যুবক বসে আছে একা— তার দু চোখ জুড়ে স্বপ্নের নরম ঘোরাফেরা। তার পেছনেই একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বসে আছে। হয়ত নতুন বিবাহিত, নয়ত অন্যকিছু। মেয়েটা ফরসা, লাজুক। ছেলেটার উৎপাতে সলজ্জভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে কেউ দেখে ফেলল কি না। আশপাশের লোকগুলোর কেউ কেউ আড়চোখে এদের দেখছে।

এভাবেই গাড়ি চলছে।...

গাড়ির লোকগুলোর অবকাশ আছে, স্বপ্ন আছে, উৎকণ্ঠা আছে, প্রতীক্ষা আছে। আছে খবরের কাগজ আর জানালার আশ্চর্য পৃথিবী।

অন্তত নিশ্চুপ বসে থাকার একঘেয়েমির অপ্রিয় অধিকার আছে। আর আছে গন্তব্যের আনন্দমুখর অভ্যর্থনার সুনীল প্রত্যাশা।

কেবলমাত্র বাসের সামনে বসে থাকা একজন সজাগ মানুষের এসব কিছুই নেই। না বিশ্রাম, না খুনসুটি, না শান্তি, না স্বপ্ন।

লোকটা চালক।

ওই নিদ্রাখোয়ানো শ্রান্তিহীন নিঃসঙ্গ লোকটার জন্যে খারাপ লাগে।

কী মর্মান্তিকভাবে নিজের কর্তব্যের ওপর উদগ্রীব হয়ে মরে আছে সে।

লোকটাকে দেখি আর নিজের কথা মনে হয়। নিজের বিশ্রামহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা।

৬২

এমন একেকটা চেতনা আছে, যে জায়গায় সারা পৃথিবীর মধ্যে আমিই হয়ত একমাত্র মানুষ।

৬৩

বাঙালির স্বপ্ন গণতন্ত্র, কিন্তু সে স্বস্তিবোধ করে একনায়কতন্ত্রে।

৬৪

বিজয় মানে শত্রুর শক্তি আর নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা।

৬৫

কথা বেশি বললে কথার দাম কমে যায়, যে বলে তারও।

৬৬

দুটো পরিস্থিতিতে আমরা চিরকাল অসাধারণ : প্রভুসুলভ পরিস্থিতিতে আর দাসসুলভ অবস্থায়। বিদেশে চাকরি-বাকরির দাসসুলভ পরিস্থিতিতে আমাদের সাফল্য প্রবাদের মতো। দেশে শিল্পোদ্যোক্তা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসেবেও তা-ই।

কেবল স্বাধীন মানুষের সহজ মর্যাদাবান ভূমিকাতেই আমাদের যত ব্যর্থতা।

৬৭

ওহে যৌবনবতী মেয়েরা, তোমরা কেন শুধু ওই সমর্থ যুবকগুলোর দিকে ফিরে ফিরে চাও? যৌবনের গন্ধে মাতাল ওই মূঢ় যুবকগুলো তোমাদের কতটুকু চেনে? তোমাদের উদ্ধত সুঠাম পরিপূর্ণ বিস্ময়ের সামনে বিভ্রান্ত ওরা— তোমাদের কোমর জড়িয়ে শুধু কাঁদে। জন্তুর মতো, লোভীর মতো, অকর্ষিত গ্রাম্য যুবকদের মতো তোমাদের তপ্ত মধু চেটেপুটে নিতে চায়। জান্তব ঠোঁটে পান করতে চায় তোমাদের মদির যৌবন।

তোমাদের দুর্লভ নারীত্বের মর্যাদা তারা কী করে দেবে? নির্দয় বর্শার মতো তোমাদের রক্তমাখা যৌবন ওরা মাতালের মতো, পশুর মতো শুধু দলে ধর্ষে একাকার করে।

তোমরা আমাদের কাছে এসো! যৌবন পার হয়ে আমরা জেনেছি, কোথায় বাস করে তোমাদের লুব্ধ নারীত্বের উষ্ণ তপ্ত ভাণ্ডার। কোথায় তোমাদের শরীরের সেই আদিম বৈভব— যাকে মানুষ বলে 'যৌবন'। তোমাদের প্রতিটি রক্তগোলাপের উদগ্র সম্মান আমরা জানি। জানি কোন অলীক কৌশলে তোমাদের দেহ-বল্লরীতে আগুন লাগে, কোথায় কীভাবে তোমাদের সর্বোত্তম চরিতার্থতা।

ওদের পশুত্বের থাবা থেকে আমাদের বৈদগ্ধ্যের কাছে তোমরা এসো!
আমাদের দক্ষ সুখদ তপ্ত পরিচর্যার কাছে এসো;
তোমাদের মদির সম্ভারের গভীর পূর্ণতার কাছে এসো।

৬৮

নিরপেক্ষ মানে সবার বিপক্ষ।

৬৯

কোনো পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশাসককে নিয়ে তাঁর দেশের জনসাধারণ যখন অশ্রদ্ধাপূর্ণ মুখরোচক গল্প আর কৌতুক তৈরি করতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে তিনি সেই দেশে তাঁর দানবীয় কর্তৃত্বের শীর্ষে অবস্থান করছেন। ওইসব হাস্য-পরিহাস আসলে তাঁর অবৈধ দুর্লঙ্ঘতার বিরুদ্ধে সেই পদদলিত জাতির এক ধরনের অক্ষম অঘোষিত যুদ্ধ— তাদের সর্বাত্মক পরাজয়ের এক করুণ সান্ত্বনামূলক ক্ষতিপূরণ।

৭০

কী উত্তেজনামধুর লেখালেখির এই মুহূর্তগুলো! সারাটা জীবন ছোট্ট একটা মুহূর্তের মধ্যে এসে কী অস্থির আনন্দময় পদচারণা করতে থাকে।

৭১

সারাদেশের ছেলেমেয়েরা কত দূর-দূরান্ত থেকে এসে কত কিছু নিয়ে গেল— নিজের ঘরের সন্তানেরা প্রায় কিছুই চাইল না।

মানুষের আত্মার সন্তানেরা নিজের ঘরে খুব কমই জন্মায়। আমাদের ঘরে যারা জন্মায়, আমাদের রক্তের সন্তানেরা, তারা আসে জীবজাগতিক ধারায়, তারা থাকে আমাদের কাছে। কিন্তু আমাদের আত্মার সন্তানেরা কোথায় আছে কে জানে! হয়ত এরই মধ্যে তারা জন্মেছে— অজ্ঞাত-অপরিচিত কোনো সুদূর গ্রামের অন্ধকার কুঁড়েঘর থেকে পায় পায় এগিয়ে আসছে তাদের সত্যিকার পিতার দিকে। কিংবা হয়ত আজ নয়, একশ দুশ পাঁচশ বছর পরে আমাদের অনুভব করার জন্যে এই পৃথিবীতে জন্ম নেবে একদিন।

মানুষের প্রকৃত সন্তান খুব কমই তার নিজের ঘরে জন্মায়।

৭২

কাল 'শ' বলছিল : আপনার গদ্যে একটা আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। লিখলে ভালো হত।

কেন লিখি নি সারাজীবন? রক্তের মধ্যে শব্দের এমন জ্বলন্ত অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কীভাবে এমন নীরক্ত শীতল হয়ে থাকলাম? একটা কচি অপরিণত মাথার খাঁজে হাজার হাজার শব্দের উন্মত্ত দংশন নিয়ে বেঁচে থাকতে হল— আর্তচিৎকারের মতো। কোথায় সেই ফলভারনম্র দ্রাক্ষাকুঞ্জ! সারাজীবন মাথার কোটরে কোটি

কোটি বোলতার নিদ্রাহীন উন্মত্ততা! শব্দের একটা উদগ্র সাম্রাজ্যকে মগজের ভেতর প্রজ্বলন্ত রেখে কী দুঃখময় নিষ্পত্রতা?

কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের চেনা এই লোকটি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। তবু মনে রেখো, যেদিন তার মৃত্যু হবে সেদিন তোমাদের পরিচিত এই অক্ষম নির্বীজ লোকটির মৃত্যু হবে না— মৃত্যু হবে হাজার হাজার অলিখিত শব্দাবলির এক জাগ্রত জগতের।

অথচ যা-কিছু নিয়ে এতগুলো দিন মাতাল হয়ে কাটিয়েছি— সেই সম্পাদনা, সংগঠন, টিভি— এসব কোনোকিছুই হয়ত আমার রক্তের আসল ব্যাপার ছিল না। হয়ত শুধু বিবেক, শুধু পরিত্রাণহীন বিবেকের নির্যাতন আর কাল ও ভূগোলের অবধারিত দাবির সাধ্যমতো প্রত্যুত্তর ছিল সেগুলো। সাফল্য একেবারে জোটেনি এমন নয়। কিন্তু অবাঞ্ছিত ব্যাপারে সাফল্য মানুষের পৃথিবীতে এটাই প্রথম নয়।

তবু লেখা ছিল আমার স্বর্গীয় তৃপ্তি— 'আত্মার লবণ'। লেখার সময় শরীরের প্রতিটা প্রাণকোষ যেভাবে ঝনঝন করে বেজে উঠেছে— প্রতিধ্বনিময় সেই রমণীয় পৃথিবীর তুলনা কীসে? লেখাগুলো হয়ত সবই নিষ্ফল ছিল, কিন্তু মানুষের শ্রেষ্ঠ আনন্দ কি সবসময় তার শ্রেষ্ঠ সাফল্যে?

৭৩

নায়ক বা বীরের মাথা যত উঁচুই হোক, ঘরের ছাদের চেয়ে তা নিচু।

৭৪

শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমাদের 'প্রতিভাবানদের' (?) তাচ্ছিল্য প্রায় কুসংস্কারের মতো। অনেকেরই ধারণা, নিয়ম-কানুন বা পরিমিতি-পরিশীলনের মতো ছক-কাটা গৎ-বাঁধা ব্যাপারগুলো শুধু সাধারণ মানুষের জন্যে। প্রতিভাবানেরা এসবের বাইরে। কিন্তু সত্যিকার প্রতিভাবানেরাই জানেন— ব্যাপারটা কতখানি বিপরীত। সাধারণ মানুষ শৃঙ্খলাকে অবলীলাতেই পেয়ে যায় স্বভাবের কাছ থেকে। প্রতিভাবানদের মতো আবেগের হিংস্রতা তাদের মধ্যে ধ্বংসকারী পর্যায়ে ক্রিয়াশীল নয় বলে ব্যাপারটা তাদের পক্ষে সহজ হয়। অন্যদিকে শক্তির প্রচণ্ডতার হাতে প্রতিনিয়ত ছিন্নভিন্ন প্রতিভাবানেরাই শুধু জানেন— তাঁদের ওই হিংস্র বিশৃঙ্খল অস্তিত্বকে নিটোল অর্থময়তায় ফুটিয়ে তুলতে শৃঙ্খলার কতখানি প্রয়োজন। আবেগের বন্য আক্রমণ এড়িয়ে তাঁদের, কঠিন সাধনার বিনিময়ে, তিলে তিলে রোজগার করে নিতে হয় শৃঙ্খলা— তিলোত্তমাকে রচনা করার জন্যেই করতে হয়।

৭৫

আমি ছিলাম একটা জাতির নির্মাণ-যুগের মানুষ। আমার কালের সবার মতো আমিও ছিলাম এই জাতির অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা এবং জনক।

এই জাতির জন্মমুহূর্তের দুঃখ ও আনন্দাশ্রুতে আমার দুই কপোল সিক্ত! আমার প্রিয়জনদের ভাঙা করোটি ফাটলের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ চিকন ঘাস মাথা উঁচিয়ে আবার মাটির সাথে মিশে গেছে।

এই জাতির নিশ্চিত স্থায়িত্বের সামনেই আমি এখন আপাদমস্তক নতজানু।

আমার প্রতিটি প্রাণকোষ এখন নির্মাণের বলীয়ান সক্রিয়তায় উদগ্রীব।

আমার সামনে এখন কাজ আর সংগঠনের বলিষ্ঠ পৃথিবী।

অস্তিত্বের সূক্ষ্ম জটিল বিশ্লেষণ, আত্মবাদী দর্শনের সুউচ্চ শিখর এখন আমার কাছে অবক্ষয়ী বিলাসিতা।

আমার উদ্ধার এখন সম্মিলিত যূথবদ্ধতায়, ব্যক্তিসত্তার সাধ্যমতো বিনাশে। জাতির সুদৃঢ় অস্তিত্বই এখন আমার নিশ্চয়তা;

আমার উচ্চারিত শব্দ গরিলার মতো আদিম ও জান্তব; আমার জীবন নিষ্ঠুর ও নতুন, উদাত্ত ও আবেগময়— একটা ফলভারনম্র সোনালি দ্রাক্ষাকুঞ্জের আকাঙ্ক্ষায় তা আনত।

৭৬

সবচেয়ে দুঃসহ কষ্টকেও হয়ত সহ্য করা যায়, কষ্টের আতঙ্ককে না।

বারবার ভাবি, আমার মৃত্যু যেন আসে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার পথে— সম্পূর্ণ অজান্তে— এতটুকু বোঝার সুযোগ না দিয়ে।

একতাল ছিন্নভিন্ন মাংসপিণ্ড আকাশের দিকে বিস্ফারিত,

যেন পড়ে থাকি কোথাও।

৭৭

কেউ যখন ভালোবেসে কারো শরীর স্পর্শ করে তখন সে আসলে তার নিজের ভালোবাসাকেই স্পর্শ করে।

৭৮

মানুষ দুই জাতের। এক, যারা ঈপ্সিতকে হারিয়ে ফেলে তাকে পেয়ে যায় বলে। দুই, যারা ঈপ্সিতকে খুঁজে বেড়ায় তাকে পেতে চায় বলে। আমি এ দুয়ের কোন্ দলে ? আমার কুখ্যাত নাস্তিকতা কি তবে আস্তিক্য সন্ধানেরই অন্য নাম?

জীবন কি আস্তিকতা সন্ধানেরই একটা উদ্ধারহীন মুদ্রাদোষ? আমিও তো খুঁজেই মরছি, কিন্তু 'নেই কেন সেই পাখি?'...

৭৯

প্রাক্তন সুন্দরীদের সুবিধা এখানে যে, তাদের চেহারা কুঁকড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রেমিকদের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসে।

৮০

চৈতন্য— আলোর লক্ষ-কোটি গুণ বেগে অনিবার্য লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাওয়া একটা দীপ্র চকচকে বর্শা। সেই নির্মম লক্ষ্যভেদী অভিযাত্রা থেকে এর তীক্ষ্ণ মুখটাকে এক সেন্টিমিটার সরিয়ে দাও— সঙ্গে সঙ্গে সে এক ভেঙে-পড়া করুণ অর্থহীনতা। মূল গন্তব্য থেকে হাজার-কোটি আলোকবর্ষ দূর দিয়ে মহাশূন্যের বুকে করুণভাবে হারিয়ে যাওয়া একটা ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

৮১

জীবনে সর্বোচ্চ যে মানুষটিকে আমরা পেতে পারি সে শ্রেষ্ঠতম নয়, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ।

৮২

প্রকৃতি আমাদের ভেতরকার 'মানুষ'টাকে বাইরে নিয়ে আসে, সভ্যতা 'জানোয়ার'টাকে।

৮৩

বার্ধক্য ঠ্যাঙে কামড় দিয়ে ধরেছে; এখন আর কোনো সুসংবাদ নেই।

৮৪

কিছু কিছু লেখক আছেন, যাঁরা একটা বা দুটো অবিশ্বাস্য বইয়ের গুটিকয় পৃষ্ঠায় ধারণ করতে পারেন শিল্পের সামগ্রিকতাকে— একটা নিটোল মুষ্টির ভেতর মানব-অস্তিত্বের যাবতীয় রোদন ও রক্তক্ষরণ। শিল্পের আলোকিত রঙ্গমঞ্চের ওপর সৌকর্যপটীয়সী নৃত্যশিল্পী এঁরা। বদলেয়ার বা বেকন, র‍্যাঁবো বা গ্রে, প্যাসকাল, খৈয়ম, রাশফুকো বা গীতার কবি এই দলের।

কিছু কিছু লেখক আছেন, যাঁদের জীবনোপলব্ধির জন্যে দরকার দীর্ঘ যাত্রার সুবিপুল পরিধি। হাজার হাজার পৃষ্ঠার লক্ষ লক্ষ শব্দের ভেতর দিয়ে তাঁদের অস্তিত্ব

উন্মোচনের সামগ্রিক আয়োজন। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, বালজাক, হুগো, দস্তয়েভস্কি, গ্যেটে, ডিকেন্স থেকে শুরু করে পৃথিবীর মহাকবিরা সবাই এই ধারার।

যত সামান্যই হই, আমি এই দ্বিতীয় গোত্রের মানুষ। হাজার হাজার উজ্জ্বলিত বাক্যের মহাকাব্যিক বিশালতার ভেতর আমার মুক্তি।

জীবনের কাছ থেকে সে সুযোগ মিলল না। দেশ এবং জাতির জন্যে নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা, চারপাশে একটা সুখী জনগোষ্ঠীর মুখ খুঁজে বেড়াবার গভীর আকুতি আর ডাকাতের মতো নিষ্কৃতিহীন একটা বিবেক— হাজার হাজার তুচ্ছ অর্থহীন প্রয়োজনে আমার সব অপার্থিব মুহূর্তগুলোকে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

৮৫

বেশিরকম চাওয়াই আমাদের সবাইকে আজ ভিখিরি করে ফেলেছে।

৮৬

আজকের এই দুর্নীতিপরায়ণ দেশে যে কজন মুষ্টিমেয় মানুষ এখনো ব্যক্তিগত সততা টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন— তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হওয়া উচিত।

৮৭

খুব কম মানুষই এই পৃথিবীতে তার নিজের জীবন যাপন করে। কেউ যাপন করে তার বাবার জীবন, কেউ মায়ের, কেউ পরিবারের, কেউ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ বা সংসারের, কেউ সময়, পরিপার্শ্ব, কাল ও ভূগোলের। অন্যেরা তাকে যে জীবনের নীতিমালা তৈরি করে দেয়, যে জীবনকে তার জন্যে ভালো বলে রায় দেয়— সেই জীবন, তার নিজের জীবন নয়। যে জীবনে তার হৃদয়ের আনন্দ, আত্মার প্রজ্বলন— সে জীবন নয়। যে জীবনের জন্যে তার রক্তের ক্রন্দন, মজ্জার আকুতি, সে জীবনও নয়— বরং অন্যদের নির্বোধ সিদ্ধান্তের অগ্রহণযোগ্য দুঃখবিধুর একটা জীবন— নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রামে আর রক্তক্ষরণে অশ্রুপাতদীর্ণ একটা আমৃত্যু জীবন।

জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে গেছে এর মধ্যে, অনেক গহন ক্ষতি একে দীর্ণ করেছে। এর সবকিছু নিরর্থক ছিল, তা বলব না। কিন্তু একটা কথা অন্তত সত্যি : যে জীবনের ভেতর এ পৃথিবীতে বেঁচে ছিলাম, সেটা ছিল একান্তই আমার জীবন, আর কারো নয়, আর কোনো কিছুর নয়। যে জীবনে আমি বাঁচতে চেয়েছি সেই জীবন ছিল এটা। অন্যের বেছে দেওয়া, অন্যের সিদ্ধান্তের বা নির্দেশের অসম্মানিত

অপচিত জীবন নয়— প্রতি মুহূর্তের স্বাধীন আনন্দে উজ্জ্বলিত, দুঃখে-দ্বৈরথে উচ্চারণে রক্তাঘাতে রোদিত, জ্বলিত, স্বরিত একটা জীবন।

৮৮

আমি অন্ধ; দৃষ্টিমান শুধু আমার অন্ধত্বের অবস্থানে।

৮৯

কেউ কিছু না করলে বোলো না : সে করেনি; বোলো : সে পারেনি।

৯০

কোনো কিছু পাওয়া আর তাকে জীবন থেকে হারিয়ে ফেলা দুটো প্রায় একই কথা।

৯১

আজকের অসুস্থ এই যুগটাতে আমাদের দায়িত্ব একটাই— সুস্থ থাকা। লক্ষ রাখা, যেন হতাশায় না ভেঙে পড়ি— যেন পাগল না হই— আত্মহত্যা করে না বসি। চারপাশে সবাই ক্রমাগত সুস্থতা হারাচ্ছে। সুস্থতা গেলে আমাদের বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। আক্রমণের ধার দুর্বল হয়ে পড়বে, আমরা হেরে যাব। এই নিশ্ছিদ্র কালবেলায় পরাজয়কে ঈশ্বর বানাবার বিলাসিতা কিছুতেই চলতে পারে না।

৯২

মন দিয়ে কি সবসময় সব কিছু শুরু করা যায়? শুরু করেও তো আমরা অনেক সময় মন দিই।

৯৩

শ্রেষ্ঠ হতে হলে গানকে 'জনপ্রিয়' হতেই হবে, যেমন নিকৃষ্ট হতে হলে সাহিত্যকে।

৯৪

১৯৫৭ সাল। উচ্চ মাধ্যমিকের পর বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে সবাইকে হতাশ করে দিয়েছি। আত্মীয়-স্বজনেরা যারপরনাই আহত, ক্ষুব্ধ। হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাকে নিয়ে অনেকের অনেক আশা ছিল। তাই সবাই এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার বড় মামার (যিনি আমাকে সবচেয়ে স্নেহ

করতেন) আহত প্রতিবাদ হল সবচেয়ে মর্মান্তিক ও নিঃশব্দ। চারপাশের সমবেত প্রতিরোধের সামনে মানসিকভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে আব্বার কাছে যাবার দরকার হল— সাতক্ষীরায়। উনি তখন ওখানকার কলেজের অধ্যক্ষ। সারা পৃথিবীতে আব্বার কাছেই সেসময় আশ্রয় পেয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে আব্বা আমার সঙ্গে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এলেন।

বাস ছাড়তে তখনো মিনিট পনের বাকি। আব্বা আর আমি বাসের ধার ঘেঁষে নিঃশব্দে হাঁটছি। হঠাৎ পিতা নয়, আমার পাশের প্রবুদ্ধ অধ্যাপকটি গাঢ়স্বরে আমার উদ্দেশে কথা শুরু করলেন— আমার ভবিষ্যতের উদ্দেশে আমার আজীবন পথপ্রদর্শকের উক্তি: বুকের বাঁ দিকে হাত রেখে বললেন, 'বুঝলি, আমাদের সবার বুকের এখানটায়, একজন মানুষ বাস করে। সে কথা বলে'। আব্বা বলে চললেন, 'ভালো করে কান পাতলে তার গলার স্বর শুনতে পাওয়া যায়। জীবনে যখন কোনো সঙ্কট আসবে তখন শুধু তার কাছে পথের নির্দেশ চাইবি। যেদিকে সে যেতে বলবে অনুগতের মতো বিনা দ্বিধায় সেদিকে চলে যাবি। মনে রাখবি ওটাই তোর পথ। ওখানে তুই রাজা। রাজার মতোন একা। ওখানে তোর বাবা নেই, মা নেই, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজন পৃথিবী সংসার কিছু নেই। সেখানে কেবল তুই আর তোর জীবন।' আমি আব্বার কথা রেখেছি; কোনোদিন বুকের ভেতরকার ওই মানুষটি ছাড়া আর কারো নির্দেশে জীবন নির্ধারিত হতে দিইনি।

৯৫

ঢাকা শহরের কবির সংখ্যা আজ পাঁচ হাজার। এত কবি, কিন্তু সেই অঘটনঘটনপটীয়সী 'প্রতিভা' কোথায়?

আমাদের কাব্যজগৎ প্রায় বাংলাদেশেরই মতো। জনসংখ্যা আছে, 'মানুষ' নেই।

কোনো শিল্পে উজ্জ্বল সাফল্যের জন্যে সেই শিল্পের বিস্তৃত অনুধাবন আর চর্চা অনিবার্য।

আমাদের তরুণ লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পঠন-পাঠন কেন আজ শূন্যের কোঠায়? 'জন্মগত প্রতিভা' এখন সুনীল আকাশে পতাকা উঁচিয়ে গাড়ল আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসছে।

সাহিত্যের প্রতিটা বর্ধিষ্ণু যুগে জ্ঞান আর প্রতিভা ছিল সমার্থক। বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর সময়কার সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষ; সেইসঙ্গে সে যুগের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত এবং বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত ব্যক্তি।

মাইকেল তাঁর সময়কার সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষ। একই সঙ্গে তাঁর কালের সবচেয়ে সুশিক্ষিত কবি।

বঙ্কিমের লোকশ্রুত প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্য ছিল সমার্থক; রবীন্দ্রনাথেরও তাই। তিরিশের শ্রেষ্ঠ কবি-লেখকদের কেউই এর ব্যতিক্রম নন।

সব কালে সব যুগে এই একই ব্যাপার।

আজ কী এক যুগে আমরা এসে পড়লাম যখন 'অশিক্ষিত' না হলে 'প্রতিভাবান' হবার পথই নেই!

৯৬

"আজ অনেক 'চোর বাবা' চাই তোমাদের"— 'রসিকতা' করে 'কেন্দ্রে'র ছেলেমেয়েদের মাঝেমধ্যে কথাটা বলি। বলি :

"বাবা কি ঘুষটুশ খায়, চুরিটুরি করে? খুন করেছে দু-চারটা? ডাকাতি লুটতরাজ, রাষ্ট্রীয় দস্যুতা করে টাকা করেছে কাঁড়ি কাঁড়ি? যদি এমন করে থাকেন, তবে তোমাকে বড় করে তোলার ব্যাপারে কষ্ট করতে আমি রাজি।"

"কেন?" অবাক হয়ে জিগ্যেস করে ছাত্রছাত্রীরা। আমি বলি :

"তিনি যদি ওভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ে গিয়ে থাকেন, তবে একটা বড় উপকার করে গিয়েছেন তোমার। দ্বিতীয়বার ওসব অপরাধ করার দায় থেকে তোমাকে অব্যাহতি দিয়ে গেছেন। তোমার হৃদয় যদি ভালো কিছুর জন্যে জেগে ওঠে, তবে ওই বিত্তের ওপর দাঁড়িয়ে তা করার সুযোগ তুমি পাবে।

"কিন্তু যদি তিনি ওই বিত্ত না করে গিয়ে থাকেন তাহলে তুমিই তো সেই দুর্বৃত্ত লোকটা— ধন-সম্পত্তির জগতে পা রাখা প্রথম প্রজন্মের সেই কুখ্যাত মানুষ— সেই ঘুষখোর, খুনি, রাষ্ট্রীয় দস্যু, জাতীয় দস্যু, সেই ডাকাত। তোমার শক্তি বাড়িয়ে এই জাতির জন্যে আরেকটা সুদক্ষ ঘাতকের জন্ম কেন দিতে যাব আমি?

"আর যদি তোমার দস্যু বা খুনি হওয়ার শক্তি না থাকে, তবে তুমি তো অনেকের মতো একালের নির্মম জীবনসংগ্রামের আরেকজন দুঃখজনক শহীদ। ভবিষ্যতে সন্দিহান, সততায় দ্বিধাগ্রস্ত, আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত একজন মানুষ। বড় কী দিতে পারবে তুমি জাতিকে?"

সত্যি আজ অনেক 'চোর বাবা' চাই আমাদের ছেলেমেয়েদের।

৯৭

যার জন্যে বসে থাকি সে কোনোদিন আসে না, শুধু আসতে থাকে।

৯৮

আমাদের নিবিড়তমভাবে পাওয়া জিনিসকেই কি আমরা 'অপ্রাপণীয়' নামে ডাকি ?

৯৯

একটা গান— যন্ত্রসংগীতের একটুখানি ছোট্ট মৃদু অভিঘাত— ব্যস্, আমার সারা অস্তিত্ব একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনে হল, এক আকাশ-জোড়া বিপুল জোছনা-ঝোরার নিচে অচেতন হয়ে পড়ে আছি— কোনো নির্দয় ডাইনি যেন সব রক্ত নিংড়ে আমার নির্জীব শরীরটাকে একটা অলীক ঝাউগাছের পাশে ফেলে রেখে গেছে। মাহমুদের বাসার বিরাট হলঘরটায় দামি যন্ত্রে গান শুনতে শুনতে কত রাতে এমনি নিঃসাড় হয়ে থেকেছি। বিদেশে থাকার সময় হাজার হাজার গানের রেকর্ড থেকে ক্যাসেটের পর ক্যাসেটে শুধু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগীত ধারণ করেছি। কী নিশিতে পাওয়া সেসব মুহূর্ত!

সংগীত-ধ্বনির মৃদুতম অভিঘাত আমাকে এমন বিবশ করে দেয় কেন? কেন এভাবে তার ক্রীতদাস বানায়?

তখনই বুঝি, সংগীতের প্রতিভা আমার নেই। না হলে বেহালা, সেতার, গান— কোন্‌টা চেষ্টা করিনি? কেন কোনোটাই হল না? না, ঈশ্বর বা রাজার মতো সংগীতকে আমি রচনা করতে পারি না। প্রভুত্ব নয়, আদেশচালিত ক্রীতদাসের ভাগ্যই আমার নিয়তি। আমি তার জাদুকর হাতের অলৌকিকতায় শুধু সৃজিতই হতে জানি, তার অলীক আনন্দে সাড়া দিয়ে কেবল উৎকর্ণভাবে বেজে উঠতেই জানি— জোছনান্বিত ঝাউয়ের পাশে নিহত মানুষের মতো কেবল পড়ে থাকতেই জানি।

অন্যকে আচ্ছন্ন সম্মোহিত করে রাখতে পারা— নির্মম মধুর শিকলে জড়িয়ে তাদের নিষ্কৃতিহীন ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারা— এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার 'রমণীয়' নামই কি 'প্রতিভা?'

১০০

এমন কোনো মানুষের কথা ভাবা যাক যার উচ্চতা একজন গড়পড়তা বাঙালির সমান : ধরা যাক পাঁচ ফুট ছয় বা আট ইঞ্চির সামান্য ওপরে বা নিচে। তার নাক কান চোখ চিবুক ঘাড় কিংবা গলার গড়নও একজন গড়পড়তা বাঙালির মতো। তার দুই পা এবং বাঁ হাতও আর দশটা বাঙালির সমান। শুধু একটা প্রত্যঙ্গ তার একটু অন্যরকম— সেটা তার ডান হাত। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে তার ডান হাতটা অবিশ্বাস্যরকম লম্বা। ধরা যাক— একজন সাধারণ মানুষের

তিন হাতের সমান। বাংলাদেশের কোনো সুদূর বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের এমনকি সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলেও যদি এমন একজন মানুষকে দেখা যায় তবে কী হবে পরবর্তী ঘটনাধারা? প্রথমেই তার ডান হাতের এই উৎকট দৈর্ঘ্য তার এলাকার মানুষদের কৌতূহলী করবে। সবার মুখে মুখে ব্যাপারটা আলোচিত পল্লবিত ও অতিরঞ্জিত হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই সে তার এলাকায় হয়ে উঠবে রীতিমতো পরিচিত আর খ্যাতিমান। দেখতে দেখতে সারা দেশের সবখানে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে খবরটা। দু'মাস যেতে না যেতেই নিউইয়র্ক, লন্ডন, টোকিও, প্যারিস থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের বড় বড় পত্রপত্রিকা এবং সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকেরা ক্যামেরা নিয়ে জড়ো হবে বাংলাদেশের ওই সুদূর জঙ্গলাকীর্ণ জায়গাটায়। পৃথিবীর তাবৎ পত্রপত্রিকায় তার সেই অস্বাভাবিক দীর্ঘ হাতের উৎকট ছবি ফলাও করে ছাপা হবে। গিনেস বুকে নাম উঠবে তার। পৃথিবীর ঘরে ঘরে রাতারাতি খ্যাতিমান হয়ে যাবে লোকটা।

মানুষের 'প্রতিভা'ও কি এমনি এক দীর্ঘ উৎকট ব্যতিক্রমী অস্বাভাবিকতার নাম? অস্তিত্বের কোনো একটা অংশের একপেশে অপ্রতিরোধ্য অসুস্থ বিকাশ? যক্ষ্মা রোগীদের মতো সারা শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত পুঞ্জীভূত করার মতোই, অস্তিত্বের বাকি সব কিছুকে নিঃস্ব করে সত্তার কোনো একটি বিশেষ অংশে জৈব প্রেরণার পরিপূর্ণ কেন্দ্রীভূতকরণ? তা না হলে প্রতিভাবান মানুষদের প্রতিভার এলাকায় শক্তির যে হিংস্র নির্মম উচ্ছৃত প্রাণধারা দেখা যায়, তার পাশাপাশি, ওই এলাকার বাইরে বা আর সবখানে তাঁদের বেদনাদায়ক শূন্যতার ব্যাখ্যা কোথায়!

১০১

কখনো দেখো না— কী কাজ হচ্ছে। দেখো, কে করছে।

১০২

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে কবিয়াল নিতাইচরণ সখেদ আক্ষেপে কেবলই বলেছে, 'জীবন এত ছোট্ট কেনে?' (জীবন বলতে সে কি কেবল জীবনের সুখের মুহূর্তগুলোকে বুঝিয়েছিল?)

আসলেই কি জীবন ছোট? কেবলই মনে হয়, আসলে যা ছোট তা জীবন নয়, আমাদের স্মৃতির পৃথিবী। আমাদের চোখের মতো আমাদের মনও দূরের জিনিসকে ছোট দেখে। আবার দেখার আগেই হারিয়ে ফেলে। আমরা যখন আমাদের বিশাল ধূসর অতীতের দিকে তাকাই তখন হাতে-গোনা গোটাকয় আলো-জ্বলা মুহূর্ত ছাড়া

কী-ই-বা আমাদের চোখে পড়ে? যেন ওই কটা স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তের সমাহারই জীবন। কিন্তু জীবন তো অত ছোট নয়। যদি মানুষের স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল আর অসহায় না হত, যদি জীবনের প্রতিটা ঘটনা ঘটিত-মুহূর্তের মতোই উজ্জ্বল আর বর্ণিলভাবে সারাজীবন চোখের সামনে দেখতে পেতাম, তবে বলতেই হত, এই ছোট্ট জীবনটার চেয়ে দীর্ঘ মহাকাব্য কেউ লেখেনি কোনোদিন।

১০৩

গতানুগতিক মানুষ যৌনতা করে শরীরের সঙ্গে, গভীর মানুষ শ্রেয়ের সঙ্গে।

১০৪

সব দাম্পত্যসম্পর্কেই— স্বামী-স্ত্রী দুজনার মধ্যে যে অধিকতর অমানুষ— শেষ পর্যন্ত সে-ই জয়ী।

১০৫

কেন আমরা প্রতিভাবান মানুষদের কাছ থেকে জীবনের প্রতিটা জায়গায় উজ্জ্বলতা প্রত্যাশা করি? কেন ভাবি, জীবনের প্রতিটা জানালায় তাঁরা হবেন আলোময়, দীপাবলিময়?

প্রতিভাবান মানুষেরা তো পৃথিবীর আর দশটা গড়পড়তা মানুষের মতোই। জন্মবন্ধন, মৃত্যুবন্ধন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি বাস্তব সুখ-দুঃখের দৈনন্দিন দুর্ভোগে একইরকম বিপর্যস্ত আর ছেঁড়াখোঁড়া।

তাহলে কোথায় পার্থক্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতিভাবানদের? আমার ধারণা, প্রতিভাবান মানুষদের মধ্যে জৈবসত্তার উচ্চতম শিখরটুকুতে থাকে চৈতন্যের উজ্জ্বল শাণিত একবিন্দু তীক্ষ্ণ রশ্মি। সাধারণ মানুষ থেকে ওইটুকুতেই তাঁরা কেবল আলাদা।

হিমশৈলের যেমন ন'ভাগের আট ভাগ পানির নিচে ডুবে থাকে— ওপরে থাকে মাত্র এক ভাগ— তেমনি প্রতিভাবানদেরও জৈবসত্তার ওপর ভেসে থাকে ওই তীব্র তীক্ষ্ণ শীর্ষবিন্দুটি। তাঁদের অস্তিত্বের বাকি আর সবকিছু জীবজাগতিক ধারার মতোই আদিম জড় আর অচেতন।

১০৬

উনিশশো ছেষট্টি থেকে একাত্তরের মাঝখানে, দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে, এদেশের শহরে-বন্দরে-গ্রামে একদল তরুণ নেতার জন্ম

ঘটতে শুরু করে। মিছিলে, বিক্ষোভে, জনসভায় তাদের হাজার হাজার জ্বালাময়ী ভাষণ কোটি কোটি হৃদয়কে আগ্নেয় দীপ্তিতে প্রজ্বলিত করেছিল।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চে পাকিস্তান সরকারের সামরিক অভিযান তাদের সেই জ্বলন্ত অগ্নিকাণ্ডের ওপর আচমকা ছিটিয়ে দেয় হিমশীতল জলধারা।

তাদের সব উদ্দীপনা স্তব্ধ হয়ে যায় চোখের পলকে, জাতির জীবন থেকে তারা মুছে যায় রাতারাতি; তাদের অস্তিত্ব এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয় যেন তারা কেউ ছিল না কোনোদিন এই দেশে, কোথাও।

দেশের এই বিপর্যয়ের মুহূর্তে যারা হতে পারত জাতির কাঙ্ক্ষিত ত্রাণকর্তা, পাশের দেশের একটি মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় তাদের সব আস্ফালন তখন বেদনাময় আত্মবিক্রয়ে অবসিত।

যুদ্ধের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ততদিনে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে প্রতিটি মানুষের হৃদয়। সবার ভেতর অজানিত আশঙ্কা : কে এখন বাঁচাবে এই জাতিকে? জাতির এই দুঃসময়ে অভাবিতভাবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেল বিমর্ষ দেশবাসী :

দেশের অসংখ্য সুদূর পল্লির অজ্ঞাত বুকের ভেতর থেকে তারা জেগে উঠতে দেখল হাজার হাজার নিষ্পাপ নিরপরাধ এক ধরনের অপরিচিত যুবককে, দেশের বিদগ্ধ নাগরিকেরা তাদের আগে কোনোদিন দেখেনি।

গ্রামবাংলার মতোই তাদের হৃদয় নির্বোধ এবং লাঞ্ছনাব্যথিত।

সেই সংকটাপন্ন সময়ে জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা দিল তারা। তাদের মূল্যহীন জীবন ও রক্তে জাতিকে একসময় উপহার দিল বেদনার্জিত স্বাধীনতা।

যুদ্ধ শেষ না হতেই এই 'নির্বোধে'রা টের পেল এ বিজয় তাদের জন্যে নয়। কোনোকিছু বোঝার আগেই সেই বাকসর্বস্ব পলাতক নেতারা মুক্তিযোদ্ধার বেশে প্রবেশ করল জাতির রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে।

নিষ্পাপ সরল ওই যোদ্ধাদের দীর্ঘশ্বাসের ওপর দিয়ে তাদেরই সামনে জয় করে নিল এই নগরী আর জাতির সমস্ত সম্ভাবনা।

নিঃশব্দ ম্লানমুখে ওইসব নিরপরাধ যুবকের দল মুছে গেল বাংলার বুকের ওপর থেকে— ঠিক যেভাবে তারা একদিন জেগে উঠেছিল, সেভাবে।

ভুল দেশপ্রেমিকদের অলজ্জ স্বার্থলিপ্সার সামনে জাতীয় সংগ্রামের সমস্ত গৌরব আর অশ্রু লজ্জায় অবনত হয়ে এল। সেই লজ্জা বাড়তে বাড়তে হয়ে উঠল জাতীয় অসম্মানের প্রতীক। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত আত্মোৎসর্গ এইসব রাষ্ট্রীয় দস্যুদের পায়ের তলায় আজো অশ্রুপাতরত।

একজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বশেষ মহিমা ততদিনে বিলুপ্ত প্রায়। যিনি সেই মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি একজন প্রাণবন্ত বলীয়ান মানুষ।

উদ্দীপ্ত ভাষায় তিনি সেই মুক্তিযোদ্ধার একটা দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে বোঝাতে লাগলেন কত বড় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তিনি, যুদ্ধে কোন্ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের কোন্ দায়িত্বে ছিলেন, কীভাবে কোথায় কতটা সাহসের সঙ্গে লড়েছেন— এইসব।

মুক্তিযোদ্ধা সেই পরিচয়কারীর উচ্ছ্বসিত বক্তব্য নীরবে শুনে গেলেন। কথা শেষ হলে মৃদু হেসে ব্যথিত কণ্ঠে শুধু বললেন : 'থাক সে লজ্জার কথা।'

দেখলাম ইস্পাতের ধারালো আক্রমণের সামনে যিনি অপরাজিত ছিলেন, সেদিনের নৈরাশ্যধৃত বাংলাদেশ তাঁকে পরাজিত করে ফেলেছে।

আমার জাতির নিয়তি আর কতবার ফিরে ফিরে এভাবে লজ্জিত হবে, হে ঈশ্বর!

১০৭

যে জীবন নিয়ে এতকাল এত খেদ আর অনুযোগ করেছি, অনুযোগ করার মতো সেই জীবনটাকেও তো একদিন পাব না।

১০৮

বেশি সত্য মিথ্যার প্রায় কাছাকাছি।

১০৯

একটা আশ্চর্য ব্যাপার প্রায়ই চোখে পড়ে আজকাল। আমাদের দেশে যার যত টাকা সে তত হতাশাগ্রস্ত। যারা জাতির দারিদ্র্যের ওপর সবচেয়ে বেশি দস্যুতা চালিয়ে ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়েছে তাদের গলায় সবচেয়ে নৈরাশ্যের সুর। এমনটা কেন হচ্ছে? অনটনক্লিষ্ট একটা নিকট অতীতকে পার হয়ে এরা যেভাবে সম্পদের শীর্ষে এসেছে, তাতে তো তাদের গরিলার আত্মবিশ্বাস নিয়ে অট্টহাসিতে চারদিক কাঁপিয়ে তোলার কথা। গত পঞ্চাশ বছরে দেশে বিত্তের যে অভাবিত বিকাশ ঘটেছে— যেভাবে কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট গড়ে উঠে দেশটাকে অচিন্তনীয় অগ্রগতির দিকে নিয়ে গেছে— তাতে হতাশার কী আছে? এই অবিশ্বাস্য অগ্রযাত্রা কি তারা দেখছে না? তীব্র আর্থিক সংকটে পর্যুদস্ত দেশের কোটি কোটি মানুষের তবু হতাশ হওয়ার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু এরা কেন ম্রিয়মাণ? দেশের সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী, ঐশ্বর্যশালীদের কণ্ঠস্বরে সাধারণ মানুষের মতো কেন এই নিঃস্বতা?

আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা তখন সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে কয়েকটা সরু

পিচঢালা রাস্তা, চোখেই প্রায় পড়ে না। বিকেলবেলা আমরা ওই মাঠে ফুটবল খেলতাম। মাঠের মাঝখানটায় প্রথম উঠল ওমর সন্স এন্ড কোম্পানির তিনতলা দালান। এত উঁচু দালান দেখে শিহরণ জেগেছিল আমাদের : ঢাকা 'নগর' হয়ে যাচ্ছে। সেই ওমর সন্সের দালান আজ তেজগাঁও, মিরপুর, উত্তরা, সাভার ছাড়িয়ে সারা বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলেছে, তবুও আমাদের নৈরাশ্য!

এই নৈরাশ্য আমাদের সমৃদ্ধির কারণে হয়নি। বিকাশ কি নৈরাশ্যের জন্ম দিতে পারে? এই হতাশা আসলে অবৈধতার হতাশা! এইসব নব্য কুবেরেরা সম্পদের যতবড় পর্বতই গড়ুক, আত্মার গভীরতম জায়গায় তারা জানে তাদের বিত্ত অবৈধ। বস্তুগত সম্পদ ছাড়া একটা জাতির যে চৈতন্য বা অন্য কোনো উচ্চতর সম্পদ থাকতে পারে, সে-সম্বন্ধে এই অকর্ষিত মানুষগুলো অজ্ঞ। কাজেই সারাটা জাতি তাদের কাছে, তাদের বিত্তের মতোই, অবৈধ হয়ে আছে। আর সাধারণ মানুষের কাছে অবৈধ হয়ে আছে তারা নিজেরা।

অবৈধতার মধ্যে আশাবাদকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং হয় হজ্বব্রত, নয়তো আটরশি, নয়তো আমেরিকায় টাকা পাচার কিংবা সেখানে এক বা একাধিক সুরম্য অট্টালিকা ক্রয়।

১১০

সেবাদাসীতে দেবতার লাভ নেই। লাভ পাণ্ডা আর পুরুতের।

১১১

সবুজ গাছপালার সেই জগতে তোমাকে লাগছিল একটা বড় শেফালি ফুলের মতো— সাদা পাপড়ির নিচে যার ম্লান-কমলা রঙের ছোট্ট একটা বৃন্ত।

কী বিস্ময়কর তোমাকে দেখার সে অভিজ্ঞতা। একটা ফুটে-থাকা বড় শেফালি হয়ে আমার চোখের আকাশ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলে।

পরে বুঝেছি, সেদিন নিজেই তুমি ছিলে সেই শেফালি। তোমার ফরসা শরীর জড়ানো ছিল সাদা ফুটফুটে শাড়িতে, প্রান্তে তার ম্লান কমলার পাড়।

তখন নিজেই তুমি বড় একটা শেফালি ছাড়া কী আর?

১১২

বাংলাদেশের যে কোনো মহাসড়ক ধরে এগিয়ে গেলে দেখবে যেখানেই কোনো নদীর ওপর দিয়ে সেতু চলে গেছে— সেখানেই, সেতুর শুরুর জায়গাটায় একটা ছোট্ট ফলকে লেখা আছে ওই নদীটার নাম। দিনকয়েক আগে উত্তরবঙ্গ ঘুরতে

গিয়ে একখানে একটা নদীর আশ্চর্য নাম চোখে পড়ল : 'চিকলি'। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে একটা উজ্জ্বল ক্ষিপ্র সাপের পালিয়ে যাবার চকিত ছবি মনে আসে। কী সুন্দর ঝাঁক ঝাঁক অপরূপ নাম আমাদের নদীগুলোর! ধলেশ্বরী, তিতাস, কপোতাক্ষ, আত্রাই, রূপসা, মধুমতি।

যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ এসব নদীর ধারে বাসা বেঁধে আছে— আর নারীর মতো ছলনাময়ী এই নদীগুলোকে নিজেদের ঘরের যৌবনবতী কুটিল বধূদের মতো ভালোবেসেছে। নইলে ভাষার মধুরতম শব্দ দিয়ে নদীগুলোর এমন অপূর্ব নাম কী করে রাখল তারা?

১১৩

সবাই যার যার জীবনের সত্য মানুষটাকে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু ফিরে ফিরে কেবলই ভুল মানুষটার মুখোমুখি হয়।

১১৪

সেদিন এক বাসায় একজন ভদ্রলোকের সাথে দেখা। ভদ্রলোক বিদেশ থেকে ছুটি কাটাতে দেশে এসেছেন। যতক্ষণ তিনি কথা বললেন ততক্ষণ এদেশের সবকিছুকে এমন অশালীন ভাষায় একতরফাভাবে গাল পেড়ে যেতে লাগলেন যে, আমরা আমাদের এই হতভাগ্য দেশটাকে নিয়ে যে কোথায় লুকোব ভেবে পেলাম না।

মনে হচ্ছিল, গাল দিয়ে ছুটিটা কাটাতেই যেন তিনি দেশে এসেছেন। এদেশের সবকিছুকে তিনি এমন ক্ষিপ্তভাবে গাল দিচ্ছিলেন যে ভয় হচ্ছিল তিনি হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

ব্যাপারটার জন্যে ভদ্রলোককে খুব একটা দোষ দিই না। যে দেশে তিনি আছেন সেখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়াস আমাদের তুলনায় এত বেশিরকম উন্নত আর উঁচুমানের যে তাতে একবার অভ্যস্ত হলে এদেশের ভ্যাপসা গরম আর নোংরা মনমানসিকতার মধ্যে পড়ে যে-কারো মেজাজ আর হজমশক্তি নষ্ট হবার কথা।

তবু মনে হল এভাবে গাল দেবার জন্যে দেশে আসার দরকারটাই বা কী তাঁর? অন্য অনেক দেশেও তো তিনি একই খরচে চলে গিয়ে সময়টা উপভোগ করতে পারতেন। দেশের দরিদ্র মানুষের টাকায় উচ্চশিক্ষা পেয়ে তিনি আজ একটা উন্নত দেশে বড় চাকরি জুটিয়েছেন, সেটা কি তাঁর মাতৃভূমির অপরাধ? যে দেশের জ্যাম জেলি মাখন পনিরের চমৎকার স্বাদের অপরাধে আজ তাঁর প্রিয় দেশ রাতারাতি

এত জঘন্য হয়ে গেল— সে দেশটাও তো চিরকাল এমন দুধ আর মধুপ্রবাহিত ছিল না। তিনি প্লেন থেকে সোজা নেমে সেদেশের ঘন পুরু সরটুকু প্রায় বিনা আয়াসে পেয়ে গিয়েছিলেন। একবার ভেবেও দেখেননি, সে-দেশের প্রতি টুকরো পনিরের জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই জাতির মানুষদের কত সংগ্রাম, ত্যাগ, অশ্রু, মৃত্যু, জীবনপাত— যে বেদনার তিনি কেউ নন।

'আপনার জাতির দুঃখের প্রত্যুত্তরে— ভালোবাসা দূরে থাক— এইসব নিন্দা আর ঘৃণার অপবাদ ছাড়া আর কী দিতে পেরেছেন আপনি, হে বীর সংগ্রামী পুঙ্গব!'

১১৫

গতবছর একটা আলোচনামালার সূত্র ধরে বারোটা রাজনৈতিক দল 'কেন্দ্রে' এসে পর পর তাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে গেল।

আমি প্রতিটা দলের নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছি। আমাদের জাতীয় জীবনে 'কেন্দ্রে'র গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তাঁদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি : কেবল রাজনীতি দিয়ে আপনারা দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। আজ সারা জাতির মতো রাজনৈতিক মুক্তিরও একটাই পথ : চিত্তের আলোকায়ন।

বলেছি : রাজনীতি তো মানুষই করে! যে মানুষেরা রাজনৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখবে তাদের উন্নতমান যদি নিশ্চিত করতে না পারেন তবে রাজনীতির উন্নতমানকে নিশ্চিত করবেন কীভাবে? বলেছি : ক্ষুদ্র মানুষ আর বড় জাতি কি একসঙ্গে হয়?

বলেছি : আপনারা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের হাতকে শক্ত করুন। আমরা জাতির হাত শক্ত করে দেব। সম্পন্ন মানুষেরাই কেবল একটা সম্পন্ন জাতির নিশ্চয়তা।

১১৬

আমরা পাণ্ডা নই, প্রেমিক। তাই দেবতার শুধু স্তব করি না, তার নিন্দাও করি।

১১৭

স্কুলে আমাদের অঙ্কের স্যারের নাম ছিল বনমালীবাবু। খুবই আন্তরিক আর অণুপ্রেরণায় ভরা মানুষ ছিলেন তিনি। আমাদের পড়াশোনায় উৎসাহ দেবার জন্যে প্রায়ই বিশুদ্ধ বিদ্যাসাগরী ভাষায় বলতেন : 'স্ফূর্তি কর্, স্ফূর্তি কর্।'

বনমালী স্যার এই সময় কিছুটা বার্ধক্য-আক্রান্ত হয়েছিলেন। স্যারের ওপরের

পাটির সামনের দিকের একটা দাঁত ছিল না। স্ফূর্তির 'ফ' সেই ফোকর দিয়ে অনায়াসে লোপাট হয়ে যেত। আমরা শুধু শুনতে পেতাম 'সুর্তি কর্, সুর্তি কর্।'

আজ স্যারকে ফিরে ফিরে আমার যুগের বেদনাব্যথিত প্রতীক মনে হয়। আমাদের কালের সব 'স্ফূর্তি' যেন কারো ঝরে-যাওয়া দাঁতের বিমূঢ় ফোকর গলে কেবলই 'সুর্তি' হয়ে যাচ্ছে।

১১৮

আমরা যারা পৃথিবীর ট্যারা চোখ আর খোঁড়া ঠ্যাংগুলোকে ভালোভাবে দেখতে পাই না, সেইসব নির্বোধদেরই লোকে বোধহয় 'আশাবাদী' বলে।

১১৯

আজ দেশের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানই এন.জি.ও*; রাষ্ট্র বৃহত্তম এন.জি.ও।

১২০

জনগণের আত্মাহুতি আর নেতৃত্বের ব্যর্থতা— এই ছিল আমার কালের বাংলাদেশ।

১২১

অপুত্রক রাজা আকস্মিকভাবে মারা গেছেন, নতুন রাজার নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। শেষমেশ সবাই মিলে পরামর্শ করে একটা সুসজ্জিত হাতি নামিয়ে দিল রাস্তায়। হাতি যাকে প্রথম শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নেবে, সে-ই হবে রাজা।

আমাদের দেশে রাজা হবার ইতিহাস মোটামুটি এটাই। এভাবেই ঘটে আসছে চিরকাল। হয়ত আরো অনেকদিন ঘটবে। যোগ্যতা নয়, গুণ নয়, শিক্ষা মেধা প্রতিভা সব নিরর্থক— নির্বোধ অকাটমূর্খ একটা রাজকীয় হাতি অজ্ঞাত কারণে রাস্তার ধার থেকে তাকে পিঠে তুলে নিয়েছে— এইটেই এদেশে রাজা হবার একমাত্র যোগ্যতা।

আজকের বাংলাদেশের কথা— এদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কথা— রাষ্ট্রপতি এরশাদের কথা মনে হলে ওই বুদ্ধিহীন মূর্খ জানোয়ারটার ওপরও খুন চেপে যায়। হোক মূর্খ, মূক, অবোধ— তাই বলে এমন আত্মঘাতী নির্বুদ্ধিতা— দেশের এগারো কোটি মানুষের ভেতর থেকে এমন একটা আপাদমস্তক মর্কটকে নির্বাচন— এমন দুরারোগ্যরকম লোভী আর নির্লজ্জ একটা মানুষকে— সারাদেশের সমস্ত সম্পদের

* বিদেশি অর্থসাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠান অর্থে।

ওপর দাঁত বসিয়েও যার স্বার্থলিপ্সু লোলুপতা শেষ হয় না। এরশাদ এই জাতির সমস্ত শক্তিকে ডাইনির মতো শুষে নিয়েছেন। মানুষের প্রতিরোধের শেষতম ইচ্ছাটুকুকেও যেন নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন।

তিনি আমাদের সর্বপ্রথম দুর্নীতিপরায়ণ সরকারপ্রধান এবং এ-ব্যাপারে হয়ত শ্রেষ্ঠতম হিসেবে থেকে যাবেন।

দেশটাকে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর চেয়েও কষ্টের কথা : এদেশের মানুষকে তিনি নৈতিকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার মোসাহেবরা বলে চলেছেন : রাষ্ট্রপতি এরশাদ সারাদেশে রাস্তা করেছেন, পুল বানিয়েছেন, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দালান-ইমারত-কারখানা সবকিছুই করেছেন। তবে আমার মনে হয় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ তিনি যা করেছেন তা হল, আজ না হলেও দশ বিশ পঞ্চাশ এমনকি একশো পাঁচশো বা হাজার বছর পরেও আমরা যে কোনোদিন কিছু করতে পারব আমাদের এই আশা করার শক্তিটুকুও তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন।

১২২

হয়ত সবই মিথ্যা আর অর্থহীন ছিল। তবু এটাই তো ছিল আমার জীবন।

১২৩

আমাদের পত্রপত্রিকাগুলো থেকে শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান— সব বিদায় নিয়েছে। কেবল আছে দুটো জিনিস : পর্নোগ্রাফি আর পলিটিক্স।

১২৪

আমার কেন যেন মনে হতে চায় আমরা বাঙালিরা এখনো 'আমরা' শব্দটার অর্থ বুঝে উঠতে পারিনি। আমরা 'আমি' শব্দটাকে ঠিকমতোই বুঝি, কিন্তু 'আমরা', 'সবাই', 'সকলে', 'রাষ্ট্র', 'জাতি' এসব শব্দের একটা মানেই আমাদের কাছে বোধগম্য : আমার পকেটে যা আছে এ-ই হল রাষ্ট্র, যা আমার পকেটে ঢোকানো যাবে তা-ই জাতি।

১২৫

জাতীয় নায়কদের ব্যর্থতা আজ আমাদের সব ব্যাপারে নিন্দুক করে তুলেছে। আমাদের পরনিন্দাগুলো আসলে তাই এক ধরনের কান্না।

১২৬

তারুণ্য তো এক সম্রাটের নাম। একটা বিশাল সুপরিসর জীবন পড়ে আছে সামনে, সে তার একচ্ছত্র অধিপতি। হাজার হাতে বিলিয়েও সে বিত্তের শেষ নেই। তাই সে এত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সবকিছু দু-হাতে উড়িয়ে দিতে পারে— এমনকি জীবনকেও। জীবনের প্রৌঢ় পর্বে এসে আমাদের সবকিছুই ফুরিয়ে আসে, নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পড়ি আমরা। আমাদের চাওয়াগুলো ছোট হয়ে আসে, কুশ্রী ভিখিরির মতো আমরা স্বার্থপর আর কৃপণ হয়ে উঠি। যে জীবনকে একদিন এত অগাধ আর অপরিমেয় ভেবে বিস্ময়ে আনত হয়েছিলাম, তাকেও দরিদ্র আর নিপতিত মনে হয়। যেন একরাশ মিথ্যা আর অপচ্ছায়ার পেছনে সব শেষ হয়ে গেছে।

দেবী বউদিকে মনে পড়ে, ফুটফুটে চাঁদের মতো বউদি। ঘরে কার্তিকের মতো স্বামী, তবু ফিরে ফিরে কেবলই বলতেন : জানো, সামনে বড় কিছু একটা ঘটবে! দেখো!

দেবী বউদি জানালা দিয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর চোখের সুন্দর চাউনি অভাবিত কিছু দেখার স্বপ্নে কোমল হয়ে আসত।

দেবী বউদি, আজ তিরিশ বছর পরে এখন তুমি কোথায়? আর তোমার সেই বড় কিছুর স্বপ্নেরা?

১২৭

এরশাদের পতনকে কেন্দ্র করে প্রায় দু'দুটো সপ্তাহ সারা জাতি এমন বিপুল উত্তাল বিরতিহীন উৎসবে মেতে রয়েছে কেন? দুর্বল মানুষের এত আনন্দ দেখলে আমার ভয় হয়!

১২৮

আজ দেশের ভবিষ্যৎহীন অবস্থা প্রায় প্রতিটি হৃদয়কে হতাশার খুপরি দিয়ে কুরে খাচ্ছে। নিষ্পাপ শিশু থেকে প্রবীণতম মানুষটির মধ্যে একই ধরনের নৈরাশ্য আর নিষ্ক্রিয়তা। প্রায় সবাই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথাও আস্থার সোনালি রেখা ঝলসে ওঠে কি না।

সব জাতির জীবনেই এমনি অন্ধকার মাঝেমাঝেই আসে। তখন দেশের শুভত্বসম্পন্ন মানুষদের প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি, শ্রেয়োবোধ পুরোপুরি বিমূঢ় ও হতবুদ্ধি হয়ে অশুভের দর্পিত বিজয়োল্লাসকে অসহায়ের মতো শুধু চেয়ে দেখে। আজ সবকিছুর অবসান দেখেও কেন অযথা হতাশায় ভুগছি? সর্বাত্মক বিনাশ স্বচক্ষে দেখেও কেন তা নিয়ে আশা করার দুরারোগ্য অভ্যাসটাকে ছাড়তে

পারছি না? যখন সবকিছুই শেষ, তখনো আমাদের দেশের মানুষ কেন আজো বুঝছে না আশা আমাদের জন্যে এক দুঃখময় প্রতারণা— আমাদের সব সোনালি সম্ভাবনার প্রতিপক্ষ।

আমরা কেন ভাবছি, এই ভেঙে-পড়া বিধ্বস্ত ঘরটাকে অলৌকিক জাদুতে আগের মতো ঠিকঠাক করতে পারব। কেন ভাবছি না, আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। সব হারিয়ে আমরা এখন শক্তিমান। যা গেছে তাকে নিয়ে আর আশা নয়, আমাদের নির্মাণ এখন সম্পূর্ণ নতুন স্বপ্নে আর উদ্যমে।

কেন আমরা এমন দৃশ্যের কথা ভাবতে পারছি না যে দুর্ভাগ্যজনক কোনো পারমাণবিক বিপর্যয়ে আমাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। সারাটা দেশ বিনষ্ট— ঘর-বাড়ি, শস্যক্ষেত্র, শিল্পাঞ্চল, রাস্তা, কারখানা— সবকিছু। জীবজন্তু, তৃণ, বৃক্ষ, প্রাণী— এমনকি এগারো কোটি মানুষের আমুণ্ডপদনখ শরীরগুলোও। সব লুপ্ত, শুধু কোনোভাবে বেঁচে আছে আমাদের বিলীয়মান চেতনাগুলো— আমাদের মনন স্পন্দনের মৃদু ক্ষীণ আলোড়নগুলো আমরা তো সেইসব চেতনার স্ফুলিঙ্গ দিয়ে পোড়ো জমিতে সম্পূর্ণ নতুন ধান বুনে আবার উঠে দাঁড়াতে পারি। নষ্ট জমিতে হারানো ফসলের মিথ্যা আশা করে কী হবে? নুহের প্লাবনে যখন সবকিছু নিশ্চিহ্ন তখন একটা ছোট্ট নৌকোয় প্রতিটা প্রাণের দ্বৈত একক থেকে আমরা তো জীবনের পুনরাবির্ভাব ফিরিয়ে আনতে পারি!

১২৯

সবারই ঈশ্বর দরকার হয়। হয়ত ঈশ্বরেরও।

১৩০

প্রশ্ন : বলুন তো, পৃথিবীর আর সব জাতির তুলনায় বাঙালির গড়পড়তা আয়ু আদ্দেক কেন?

উত্তর : আর সব জাতি বছরে পাকে একবার, বাঙালি দুবার।

প্রশ্ন : কীভাবে?

উত্তর : একবার জ্যৈষ্ঠে; যখন ভ্যাপসা গরমে গাছের ওপরে আম-কাঁঠালরা পাকে আর নিচে পাকি আমরা। দ্বিতীয়বার ভাদ্রে; যখন গাছের ওপরে পাকে বড় বড় তাল, নিচে বাঙালি। সবদেশেই গ্রীষ্ম একটা, কোনো কোনো দেশে আধটা। আমাদের দুটো।

১৩১

যোগ্যতা এদেশে আজ সবচেয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৩২

যে মানুষ প্রতিনিয়ত আমাদের পরাজিত করতে পারে, সেই তো আমাদের প্রিয়তম।

১৩৩

বছরতিনেক আগে কেন্দ্রে দেখা করতে এল জনকয় তরুণ কবি। দলপতি ছেলেটি পুরোদস্তুর বাগ্মী। দু-চারটে কথা থেকেই বোঝা গেল, সাহিত্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্যেই তাদের আসা। বাগ্মিতার বিপুল শক্তি নিয়ে সে বলে যেতে লাগল :

"ষাটের দশকে আপনার সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'কণ্ঠস্বর'— ওই দশকের তরুণ লেখকেরা সেদিন সমবেত হয়েছিল পত্রিকাটিকে ঘিরে। কী উত্তেজনায় ভরা দিন সেসব, কল্পনা করতেও ভালো লাগে।"

"কিন্তু দশটা বছরও পার হল না, পত্রিকাটা বন্ধ করে আপনি চলে গেলেন টেলিভিশনে। সবার কাছে আপনার অবস্থান ত্যাগের কারণ হিসেবে দেখিয়ে গেলেন নেহাতই এক খোঁড়া যুক্তি। লিখলেন : 'যৌবনের মৃত্যুই সুন্দর।' অথচ ভেবে দেখুন, তরুণ লেখকদের মধ্যে কী উদ্দীপনাই না তখন চলছিল পত্রিকাটিকে ঘিরে।"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলতে গিয়ে খানিকটা বোধহয় হাঁপিয়েই উঠেছিল কবি-বাগ্মী। কিছুটা দম নিয়ে ফের বলতে শুরু করল :

"আজ এতগুলো বছর ধরে 'কণ্ঠস্বর' বন্ধ। আপনিই বলুন, আমাদের সাহিত্যের এরচেয়ে বড় ক্ষতি একালে আর কেউ কি করেছে? কিন্তু যা যাবার তা গেছে। সুখের বিষয়, সম্ভাবনাময় নতুন ভূমিকায় জেগে ওঠার আরেকটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ হঠাৎ করেই এসে গেছে 'কণ্ঠস্বর'-এর সামনে। সে সুযোগ যেমন আচমকা তেমনি সম্মানজনক। কেউ লক্ষ করুন আর না-ই করুন, গত দুই দশকের ভেতর দিয়ে আমাদের কাল ও ভূগোল নতুন একটা জীবনানুভূতিতে জেগে উঠে নতুন একটা পালাবদল ঘটিয়ে ফেলেছে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে। আর সেই উত্থানের পেছনে পেছনে আজ এই আশির দশকের শুরুতে একটা সম্পূর্ণ নতুন সাহিত্যদল এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সাহিত্যের দোরগোড়ায়। না, এসে দাঁড়ায়নি শুধু, তারা আজ উদ্যত, একত্রিত, সমবেত। সবই আছে তাদের। ইচ্ছা, চেষ্টা, আত্মদান, শ্রম, প্রতিভা— কিছুরই ঘাটতি নেই। অভাব শুধু একটা ছোট্ট জিনিসের— তাদের এই উদ্দীপ্ত প্রেরণার একটা মুখপত্র— তাদের জ্বলন্ত চৈতন্যের একটা অগ্নিময় প্রতিনিধি। হ্যাঁ, একটা পত্রিকা— একটা জ্বলজ্বলে প্রাণবন্ত পত্রিকা, একটা রক্তিম গোলাপ, যার মধ্যে

দিয়ে এই নতুন যুগের শক্তিমান প্রবল নিষ্ঠুর আলোড়ন উৎক্ষিপ্ত হবে জ্বালামুখ দিয়ে। আমাদের অনুরোধ, আলসেমি ফেলে 'কণ্ঠস্বর' আর একবার বের করুন আপনি। আপনার নেতৃত্বে 'কণ্ঠস্বর' আবার জ্বলে উঠুক দুদশক আগের মতোই— বেগবান তারুণ্যের অনিবার্য মুখপত্র হিসেবে— তবে এবার আর ফুরিয়ে যাওয়া ষাটের জীবনানুভূতি নিয়ে নয়— আশির দশকের টগবগে তারুণ্যের জাগ্রত প্রতিভূ হিসেবে।"

সিরাজউদ্দৌলা নাটকে নবাবের শেষ সংলাপের মতোই তার ভাষণের বিষণ্ন আকুতি উতল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে বেড়াতে লাগল। সে একইভাবে বলে চলল: 'কণ্ঠস্বর' বের করার দায়িত্বটা কষ্ট করে আরেকবার শুধু নিন আপনি। ভেবে দেখুন, আপনার সামান্য একটু কষ্টের ওপর কতবড় একটা বিস্ফোরণ অপেক্ষা করে আছে। শুধু এটুকু পেলেই আশির দশকের শক্তিমান তারুণ্য উদ্যত তলোয়ারের মতো আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারবে আর এ সমস্ত কিছুই সম্ভব শুধু আপনার তুচ্ছ একটু দায়িত্ব নেওয়ার ওপর।"

অনেকক্ষণ একটানা শুনে একসময় বললাম, যা বুঝলাম তাতে তোমার কথার মানে তো দাঁড়ায় একটাই: "যৌবন তোমার আর বেদনা আমার!"

হঠাৎ ঘা খেয়ে হকচকিয়ে উঠল কবি-বাগ্মী। অনুরোধের অসঙ্গতিটুকু টের পেয়েই যেন, সলজ্জ মুখে, থেমে পড়ল।

বললাম: এভাবে কি হয়? প্রতিটা নতুন কালই তার পাশব দাবি নিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই যুগের শক্তিমান তারুণ্যের সামনে। নিজেদের স্বেদ রক্ত আত্মোৎসর্গ দিয়ে সে দাবি তাদের মেটাতে হয়। আমাদের যুগ-চৈতন্য যেসব নতুন অজানিত বক্তব্য উচ্চারণের দাবি নিয়ে আমাদের সামনে এসেছিল, সাধ্যমতো যত্নে আমরা সে ঋণ শোধের চেষ্টা করেছি। তোমাদের কাল ও ভূগোলের ঋণ তোমাদেরই শোধ করতে হবে। আমাদের নির্বীজ বার্ধক্য দিয়ে তোমাদের তারুণ্যের প্রতিকার করা কি সম্ভব?

১৩৪

ক

আশ্চর্য সুন্দর জায়গায়— প্রকৃতির একেবারে কোলের ভেতর— লেকের ধারে— আমাদের বাড়ি।* ইংরেজিতে যাকে 'কর্নার প্লট' বলে আমাদের প্লটটাও তাই। বাড়ির পুব-দক্ষিণ দুটো দিকেই রাস্তা। দুটো দিকই খোলা, আলো-উপচানো। বাড়ির সামনে দিয়ে লেকের ধারঘেঁষে দীর্ঘ সোজা রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর

* আমাদের বাড়ি

সরাসরি চলে গেছে। বাড়ির পাশের রাস্তাটা ওই রাস্তা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দক্ষিণ ঘেঁষে গাছপালার নিবিড় জগতের ভেতর সরু হতে হতে রহস্যময়ভাবে হারিয়ে গেছে। সামনের রাস্তার ধার বরাবর ইউক্যালিপটাসের রহস্যময় দীর্ঘ সারি। দক্ষিণ থেকে বয়ে-আসা উত্তাল হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসগুলোর বেণির মতো দীর্ঘ ঝোলানো সবুজ পাতাগুলো সারাদিন ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে আর গাছের কচিপাতাওয়ালা মাথাগুলো এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করে দিনরাত কেবলই নড়ে...কেবলই নড়ে...। এই চির-তারুণ্যের চির-রহস্যের যেন শেষ নেই।

উত্তরার সবচেয়ে শান্ত আর নির্জন জায়গায় এই বাড়ি। শহরের ভেতরকার একটা জায়গা যতটা জনবিরল হতে পারে, এই জায়গাটা ঠিক তাই। বাসার ঠিক সামনেই উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত এক কিলোমিটার দীর্ঘ বিরাট উত্তরা লেক। দক্ষিণে বিমানবন্দরের পাঁচ মাইল ফাঁকা জায়গার পর ক্যান্টনমেন্ট আর গলফ ক্লাবের সবুজ নিরবচ্ছিন্ন পৃথিবী। সারা বছর অফুরন্ত হাওয়া ওই বিস্তীর্ণ খালি জায়গাটার উপর দিয়ে বয়ে এসে আমাদের ঘরগুলোর পর্দায়, চাদরে বিরতিহীনভাবে খেলা করে। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সবুজ জীবনের মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

বিংশ শতাব্দীর নাগরিক যান্ত্রিকতার ভেতর কবি রফিক আজাদ এক নিরীহ সবুজ আর্কেডিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। গাছপালায় ঢাকা ওই ছোট্ট গ্রামটির নাম চুনিয়া। আমাদের উত্তরার বাড়ি আমার কাছে ঢাকা শহরের সেই চুনিয়া। আমাদের বাসার চারপাশের সতেজ হাওয়া ওই চুনিয়ার মতো বিশুদ্ধ আর নিরীহ।

শহরের দম-বন্ধ-করা ভারী বাতাস পেছনে ফেলে উত্তরার দিকে এগিয়ে আসার প্রতিমুহূর্তে বাতাসের এই সজীবতাকে টের পেতে থাকি আমি; মনে হয়, প্রতি পলে একটা মুক্ত জগতের অবারিত শান্তির দিকে এগিয়ে চলেছি। জ্যৈষ্ঠ কিংবা ভাদ্র মাসে যখন সমস্ত ঢাকা মহানগরী দুঃসহ গরমে গুমট আর ভ্যাপসা, গাছে একটা পাতাও নড়ছে না, ঘামে গরমে জনজীবন দুর্বিষহ, তখনও আমাদের এই জায়গাটায় নির্মল হাওয়ার পর্যাপ্ত ছড়াছড়ি। কুর্মিটোলা স্টেশন পেরোলেই টের পাই মিষ্টি হাওয়ায় গাছের চিরল চিরল পাতাগুলো সবার অজান্তে ঝিরঝির করে একটু একটু কাঁপছে। যখন লেকটা পার হয়ে বাসার কাছে পৌঁছি, তখন দেখি ইউক্যালিপটাসের দীর্ঘ রহস্যময় পাতাগুলো ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে অবিশ্রান্ত নড়ে চলেছে।

খ

রূপে, বিস্ময়ে সচকিত আমাদের ছোট্ট বাড়িটা। সন্ধ্যার পর দোতলার দক্ষিণ-পুবের ঘরটায় যখন আলো থাকে না, কেবল দক্ষিণের উত্তাল হাওয়া আর রাস্তার

আলোর অস্ফুট আলেয়া রহস্যলোক তৈরি করে, তখন আমি স্পষ্ট চোখে ঘরের ভেতর রূপের পরীদের চকিত পায়ে হেঁটে বেড়াতে দেখি। এই দেখা একান্তই আমার নিজের। পৃথিবীর পরিচিত-অপরিচিত আর কোনো মানুষের সঙ্গে এসব অতিপ্রাকৃতিক বিষয়-আশয়ে আমার মিল হবে না।

বাড়িটার আর্কিটেক্ট উত্তম— উত্তম কুমার সাহা। ঢাকার তরুণ স্থপতিদের মধ্যে ও এখন খ্যাতিমান। এটাই ছিল ওর স্থপতি জীবনের প্রথম বাড়ি। বাড়িটা করার আগে উত্তমকে একটা অনুরোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, আমাদের এই জায়গাটায় প্রকৃতি তার সব অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য হাত উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে : উত্তাল হাওয়া, লেকের পানি, রোদ, উজ্জ্বলতা সব উপচে পড়ছে এখানে! বাড়ি করার সময়, এসো, আদিম মানুষদের মতো প্রকৃতির এই অপরিমেয় দানকে আমরা সম্মান জানাই। প্ল্যান করার সময় আমার একটা অনুরোধ অন্তত রেখো, কোনো দেয়াল রেখো না বাড়িটাতে। চারপাশের প্রকৃতি যেন আমাদের বিরতিহীন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সারা বছর আমাদের ঘরের অতিথি হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করতে পারে।

উত্তম আমার অনুরোধটা রেখেছিল। কথাটা ওর শিল্পরুচির সপক্ষে মনে হয়েছিল বলেই রেখেছিল। একটা অবারিত জানালাওয়ালা বাড়ি বানিয়েছিল উত্তম। রোদের পড়ন্ত আঁচ থেকে বাঁচানোর জন্যেই হয়ত পশ্চিমদিকে সামান্য একটু দেয়ালের বরাদ্দ— না হলে বাকি সারাটা বাড়ি শুধুই জানালা।

পাড়ার লোকেরা রসিকতা করে এই বাড়িটাকে তাই বলে পিকনিক-বাড়ি।

এইসব খুলে-রাখা জানালা বাইরের জগতের প্রতি এ-বাড়ির অবারিত আমন্ত্রণ। দিনরাত উত্তাল হাওয়া ছোট্ট বলের মতো সারাটা বাড়িজুড়ে লাফিয়ে বেড়ায়। রাত্রিবেলা লেকের উল্টোদিক থেকে তাকালে আলো-জ্বালানো বাড়িটাকে দেখতে একটা সোনালি মৌচাকের মতো লাগে।

এত বড় জানালাওয়ালা বাড়ি রোশনা পছন্দ করে না। বাড়ির ভেতরকার নিভৃত, নিজের মতো করে বাঁচার ছোট্ট জগৎটুকুকে পৃথিবীর কাছে বেআবরুভাবে বিকিয়ে দিতে ও নারাজ। বাড়ির জানালাগুলোকে ও বলে 'রাক্ষুসে জানালা'। কিন্তু আমাদের চারপাশের লিলুয়া প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমি কেবলই বলি : হে অবাধ্য হাওয়া, হে মেঘ, হে রৌদ্র, হে লেকের জল আর উজ্জ্বল আকাশ, আমাদের এই অবারিত জানালাগুলো আসলে তোমাদের প্রতি আমাদের সাংবৎসরিক ভালোবাসার উদার আহ্বান। আমাদের পরিবারের স্বামী-স্ত্রী-সন্তানদের মতো আমৃত্যু সদস্য হয়ে তোমরা এর ভেতর ইচ্ছামতো আসো-যাও, এইসব পাথুরে দেয়াল সরিয়ে আমরা দুই ভেদাভেদহীন পড়শি একই পৃথিবীতে শরতের বৃষ্টিচপল উৎসবে বেঁচে থাকি।

গ

আমাদের বাসার সামনের লেকটা একসময় ছিল আদি তুরাগ নদী। টঙ্গী থেকে খানিকটা ভাটিতে নেমে বাঁক ঘুরে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বিমানবন্দরের কাছে মোড় ঘুরে মিরপুরের দিকে বয়ে চলত এককালে। পরে একসময় মূল নদীটা গতিধারা পাল্টে সরাসরি মিরপুরের দিকে বইতে শুরু করলে নদীর এই আদি ধারাটি আস্তে আস্তে মরে আসে। এখনও এই লেকের দুই পাড়ের ভূগঠন-স্বভাবে সেই জীবন্ত নদীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নীলনকশা অনুসারে মাটি ফেলে লেকের দুই ধার সমান্তরাল করার কাজ বছরখানেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। এই কর্মসূচি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এককালের এই শক্তিমন্ত স্রোতোধারার শেষ পরিচয়টুকুও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

লেকের ধারগুলো কোথাও খাড়া, কোথাও অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো। এককালে এই লেক যখন বর্ষার ঢলনামা পানিতে উপচে উঠত তখন সে এক বিশাল নদীর রূপ নিয়ে দেখা দিত। উত্তাল হাওয়ায় পাল তুলে শত শত নৌকার বহর এগিয়ে যেত এর ওপর দিয়ে। অনেক আনন্দ আর কলরবে উচ্চকিত হয়ে থাকত এর জলজ জগৎ। একদিনকার সেই বেগবান নদী এখন কেবলই একটা ভেদাভেদহীন দীর্ঘ নিটোল জলা, একটা সমৃদ্ধিশালী জলধারার নির্জীব নীরক্ত মৃতদেহ। এখন লেকের তিরতির করে কাঁপা পানিতে রাস্তার ধারের বিদ্যুতের আলোরা রাতভর কেবল সার-সার তরল সোনার জ্বলন্ত মিনার তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখানকার প্রকৃতির মতো এই লেকটাও আশ্চর্য সুন্দর। লেকের ওপর দিয়ে সারাক্ষণ হাওয়া আর কুয়াশার রহস্যময় ছোটাছুটি। ফাল্গুন থেকে ভাদ্র পর্যন্ত দক্ষিণ হাওয়ায় পদ্মবনের মতো ঢেউ তুলে সারাদিন সে কেবলই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে। আর ঝড় হেঁকে উঠলে যখন লেকের পানিতে কালো অজগরের মতো বিশাল ঢেউ চারধার তোলপাড় করে তোলে তখন আমাদের বাড়ির দোতলার জানালায় বসে মনে হয় আমি যেন লেকের ভেতরকার ওই ঝড়ের সংক্ষুব্ধ উত্তাল মাঝখানটায় বসে আছি। আমাকে ঘিরেই যেন ওইসব ভয়াল গোক্ষুরের কোটি কোটি সংক্ষুব্ধ ফণার উন্মাদনা। যখন ঠিক ঝড় ওঠে না কিন্তু বলদৃপ্ত হাওয়ায় লেকের পানিতে সাদা মাথাঅলা কোটি কোটি কালো ঢেউ জেগে ওঠে তখন এই মৃত অসহায় জলাশয়ের সঙ্গে অনেকদিন আগের সেই উদ্ধত নদীর রক্তসম্পর্ক ধরা পড়ে যায়।

আমাদের লেকের হাওয়াদের মতিগতিও এই জায়গাটার মতোই অদ্ভুত। ঢাকা শহরের অন্যসব জায়গার হাওয়াদের থেকে এ একেবারেই আলাদা। ফাল্গুন থেকে ভাদ্র পর্যন্ত দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পুবের অবিশ্রান্ত হাওয়ারা আমাদের সারা বাড়িটায় হল্লা করে বেড়ালেও ভাদ্র-আশ্বিন আসতে-না-আসতেই প্রকৃতিজগতে একটা

অলক্ষ পট-পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। তখন অনেক আগের পালিয়ে যাওয়া উত্তুরে হাওয়ারা আগের জায়গা দখল নেবার জন্যে বর্শা উঁচিয়ে লেকের উত্তরদিকে দল বেঁধে এসে দাঁড়ায়। তখন আমাদের লেকের শিশু-হাওয়ারা কোন্ দলে যাবে ঠিক করতে না পেরে গালে হাত দিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত গুম হয়ে বসে ভাবে। ওই দিনগুলো আমাদের জন্যে সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে বিমর্ষ সময়। গুমট গরমে আমাদের এই ছোট্ট এলাকার কোথাও নিশ্বাস নেওয়ার মতো এতটুকু হাওয়া থাকে না— ইউক্যালিপটাসের পাতাগুলোও যেন নড়াচড়া ভুলে যায়। রাতে লেকের নিশ্চল অপলক পানিতে রাস্তার আলোগুলো আয়নার মতো নিটোল অবয়বে ধরা পড়ে। এরপর বেশ কিছুদিন উত্তুরে আর দক্ষিণে হাওয়ার মধ্যে একটা বিবাদ চলার সময়। প্রথমে উত্তুরে হাওয়া দক্ষিণের বাতাসকে বিমানবন্দরের ওধার পর্যন্ত পিছু হটিয়ে লেকের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করে। কিন্তু সে নেহাতই দিনকয়েকের জন্যে। দক্ষিণে হাওয়ারা তাদের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের ডেকে জড়ো করে ফের বড় আকারের আক্রমণ চালালে উত্তুরে হাওয়ারা পিছু হটে তুরাগ নদীর ওধারের বিশাল বিলটার পদ্মবনে, পরাজিত দুর্যোধনের মতো, লুকিয়ে থাকে। এমনিভাবে বারকয়েক ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার পর দক্ষিণের হাওয়ারা পশ্চাদপসরণ করে একসময় লেক থেকে চার-পাঁচ মাসের জন্যে বিদায় নিয়ে চলে যায়। অনেকদিন আর তাদের কোনো খবরই থাকে না। উত্তুরে হাওয়ারা তখন এক পাখায় শীত আর অন্য পাখায় শিশিরকণা নিয়ে আমাদের এই বসতিতে অতিথি পাখিদের সঙ্গে সারা শীতের জন্যে বাসা বাঁধে।

যদি বৃষ্টির অবিশ্বাস্য রূপ দেখতে চাও তবে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটায় এসো। দেখবে কীভাবে দিগন্তকে ঝাপসা করে অপরূপ বৃষ্টিপরীরা হালকা খুশিতে তোমাকে পার হয়ে চলে যাচ্ছে। এখানকার বৃষ্টি আসাটা যেমন অপরূপ তেমনি বিস্ময়-মোড়ানো। এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি দেখবে বৃষ্টির বিপুল কালো মেঘ, এখানে এসে পৌঁছোবার আগে, আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের বিশাল প্রান্তরটার ওপর আনত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর হঠাৎ চোখের একফোঁটা পানি তোমার কপোলের ওপর টুপ করে ঝরিয়ে দিয়ে গাঢ় অভিমানে চুপ করে থাকবে খানিকটা সময়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে দেখবে অনেকক্ষণ পর ঝরবে আরেক ফোঁটা। তারপর একসময় শালুক, পানিফল আর রক্তপদ্মের ঠোঁট ভিজিয়ে সারা পৃথিবীর ওপর বিরতিহীন ঝরতে থাকবে। এই সময় যখন রাস্তাঘাট জনশূন্য, রিকশাওয়ালারা একটানা অনেকক্ষণ ভেজার পর হাল ছেড়ে বিমর্ষমুখে বিদায় নিয়েছে কিংবা রাস্তার পাশে গাছের নিচে কাকের মতো অঝোরে ভিজছে, জরুরি কাজে অগত্যা বের হওয়া দু-একজন নিঃসঙ্গ পথচারীর আচমকা তীক্ষ্ণ চিৎকার আর ক্ষিপ্র গাড়িগুলোর পানি ছিটিয়ে চলে যাবার বিরস শব্দ ছাড়া কিছুই

কানে আসছে না; তখন তুমি এখানে, এই ঢাকা শহরের মাঝখানে বসেই মধ্যযুগের বাংলাদেশের আর্ত আক্রান্ত জগৎটা দেখতে পাবে— সেই জগৎ যেখানে এমনি অবিরল বর্ষণধারার নিচে সমাজ সভ্যতা লুপ্ত, জনজীবন বিপর্যস্ত, রাস্তাঘাটে মানুষের দেখা নেই, কেবল সেই একটানা বিচ্ছিন্নতার ভেতর প্রেমিকার নিঃসঙ্গ একাকিত্বের গুমরে ওঠা বিরহ-বেদনার সুর কেঁপে কেঁপে উঠছে :

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

যদি সোনালি বৃষ্টি দেখতে চাও, রাতে এসো। আমাদের নির্জন বারান্দায় বসে চারপাশের ছড়িয়ে-থাকা স্নিগ্ধ বিদ্যুৎবাতির আলোয় সোনালি বৃষ্টির অঝোর নারীকে দেখতে পাবে। দেখবে আশপাশের প্রতিটি লাইটপোস্টের বিচূর্ণিত আলোর ভেতর, প্রতিটা বাড়ির গেট আর দরজা-জানালা দিয়ে ছিটকে-পড়া স্নিগ্ধ আভার সৌন্দর্যলোকে, পানি থেকে উঠে আসা বিচ্ছুরিত আলোক কণার ভেতর সেই বৃষ্টি অবিরাম ঝরে সমস্ত রাতটাকে কেমন রোদনরূপসী করে রেখেছে।

ঘ

কোনো কোনো পূর্ণিমাসন্ধ্যায় আমাদের বাসার ঠিক সামনে, পুব আকাশে, ডাকাতের মতো বিশাল গোল চাঁদ ওঠে। সোনার থালার মতো তার বিরাট শরীর গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে একসময় জোরালো আলোয় সবটা উত্তরাকে উপচে দেয়। আমি তখন বড় বড় গাছের ছায়ায় অস্ফুট রূপের পরীদের সারাটা এলাকায় হেঁটে বেড়াতে দেখি। পাতাদের খসখস আওয়াজের সাথে তাদের অপার্থিব কথাবার্তার শব্দ শুনি। এইসব রাত্রিতে একেক সময় লেখার কথা পুরোপুরি ভুলে ছাদের ওপরকার উত্তাল হাওয়ায় আপ্লুত জোছনাধারার নিচে শুয়ে থেকে আমি নিজের অজান্তে কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ি। সারারাত জোছনা আমার শরীর প্রত্যঙ্গ প্রাণকোষ ভিজিয়ে নির্জনে ঝরে ঝরে আমার সারা অস্তিত্বকে জোছনাস্নাত করে তোলে। একেকদিন ঘুম বেশি হয়ে গেলে আকাশ থেকে চাঁদ আমার অগোচরে ডুবে যায়। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে চরাচর-ঢাকা সেই চন্দ্রালোকিত রাতটাকে তাই আর দেখতে পাই না। টের পাই আমার জোছনাভেজা শরীর সেই স্নিগ্ধ ফুটফুটে রাতটি হয়ে ছাদের আকাশে শুয়ে আছে।

প্রকৃতির নিচে এই বাড়িতে এমনি শুয়ে থাকাটা সত্যি অদ্ভুত। একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের নিচের তলার সিঁড়ির ধারে বোগেনভেলিয়ার একটা

চারা বুনেছিলাম কয়েক বছর আগে— গাছটা দোতলার বারান্দার ধারঘেঁষে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। সারা বছর অফুরন্ত ফুল থাকত গাছটায়। ফুলের মরশুমে সারাটা গাছ ফুলে ফুলে এমনি ভরে যেত যে গাছের পাতাই আর দেখা যেত না। গাছটাকে তখন ফুলে ফুলে ভরা কোনো অপরূপ মেয়ের মতো লাগত। গাছটা থেকে একটা দুটো ফুল, চুপে, কাউকে এতটুকু টের পেতে না দিয়ে, কেবলই ঝরে যেত বারান্দার ওপর। একদিন রাতে ঘটেছিল সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা। আকাশে সোনার থালার মতো পূর্ণিমার বিশাল গোল চাঁদটাকে উঠে আসতে দেখে গাছের পাশের ছোট্ট বারান্দাটুকুতে আমি নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একসময় ঘুম ভাঙতেই দেখি, সারারাত ধরে ছোট ছোট অজস্র গোলাপি ফুল আমার ওপর টুপটুপ করে ঝরে আমার সারাটা শরীরকে ফুলের নরম ভালোবাসায় ঢেকে রেখেছে। আমার মৃত্যুর দিনেও যেন এসব ফুলেরা ঝরে ঝরে আমার শরীরটাকে এমনি অপলক আদরে ভরিয়ে রাখে।

বছর-দেড়েক হল শহর থেকে বাস উঠিয়ে এ-বাড়িতে আমরা এসেছি। এরই মধ্যে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে বাড়িটায়। ফুলগাছের মধ্যে আছে ম্যাগনোলিয়া, শেফালি, বটলব্রাশ, কাঁঠালিচাপা, নাগেশ্বর, অশোক, রাধাচূড়া, রঙ্গন, স্থলপদ্ম, দোলনচাঁপা, বেলি, জুঁই, হাসনাহেনা। লতাজাতের ফুলগাছও লাগিয়েছি বেশ কয়েকটা। গোল্ডেন শাওয়ার, মাধবীলতা, ঝুমকোলতা, বোগেনভেলিয়া এইসব। বাড়িতে জায়গা কম বলে ফলগাছ বেশি নেই— কামরাঙা, ডালিম আর গোটা দুই শাদা করমচা— সব মিলে গোটা-চারেক। সবুজ করমচার গায়ে পাক ধরলে তাদের বাইরের দিকটা লালচে-কালো আর ভেতরটা তাজা রক্তের মতো লাল টুকটুকে হয়ে ওঠে। আমি তাদের ফলের দলেই ফেলি। কিন্তু শাদা করমচার বেলায় একথা খাটবে না। থোকায় থোকায় ফলে-থাকা এইসব দুধশাদা করমচাগুলোর গায়ে যখন পেকে ওঠার রক্ত-রং ছড়িয়ে পড়ে, তখন থোকাগুলো কোথাও দুধ আর কোথাও আলতার ছোপ লেগে এমন রঙিন আর অপরূপ হয় যে সেগুলোকে তখন ফল না বলে ফুল বলতেই আমার বেশি ভালো লাগে। ফল নেই এমন গাছ গোটা-চারেক। চারপাশে না-ছড়িয়ে নিচের দিকে নুয়ে-পড়া ডালপাতার দেবদারু— হাত-দশেক দূরে দূরে— বাসার ঠিক সামনেটায় সার বেঁধে লাগিয়েছিলাম বছর-পাঁচেক আগে— এখন বেশ গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে তারা।

বছর-দশেক হল এই প্রজাতির দেবদারু ঢাকায় এসেছে। গতবার বাসার পেছন দিকে লাগিয়েছিলাম একটা সেগুনগাছ। নিচের দিকে ডালপালা ছেঁটে দেওয়ায় সম্রাটের মতো সবার ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে একবছরের মধ্যে। একটা গাছ নিয়ে কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। বছরখানেক হল একটা কাঠমালতী লাগিয়েছি বাসার সামনে— দেয়ালের বাঁ দিকটা ঘেঁষে—

দেবদারুগুলোর একই সারিতে। ঢাকায় দু-তিনটের বেশি জায়গায় এই জাতের কাঠমালতী আমার চোখে পড়েনি। যখন ফোটে তখন দুধের মতো রাশ রাশ ফুলের শাদা বড় থোকাগুলো গাছের ভেতর থেকে মুখ জাগিয়ে কালচে সবুজ পাতার জগৎকে আলো করে রাখে।

আমাদের বাড়ির প্লটটা ছোট— মাত্র সাড়ে তিন কাঠার। এরই মধ্যে মাত্র এক কাঠার ওপর আমাদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। এই বাড়ি সম্বন্ধে এত উদ্বেলিত কথা শোনার পর এর আয়তনের তুচ্ছতা হয়ত অনেকের কাছে করুণার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু আগেই তো বলেছি— এতক্ষণ বাড়ির যে বৈভবের কথা আমি বলে চলেছি সে নেহাতই আমার নিজস্ব ভালোবাসার রূপকথা। আমার নিজের স্বপ্নের গল্প। এই রূপ দেখতে পাওয়ার জন্যে রাজপ্রাসাদ, নহর আর গোলাপজলের ফোয়ারার দরকার নেই। ভাঙা কুঁড়েঘরে থেকেও অনেকে এমনি অপার্থিব কিছু দেখতে পারে। আমার নিজের চোখ দিয়ে বাড়িটার যে অনবদ্য রূপ দেখে আমি অবাক হই, এ তারই কথা। পৃথিবীর আর কারো সাথে এর মিল হবে না।

আমাদের বাড়ির সবচেয়ে রাজকীয় বৈভবটির কথা দেখছি গল্পের ফাঁকে বাদই পড়ে গেছে। হ্যাঁ, সেই বিশাল বটগাছ। বটগাছটা আমাদের জমির ওপরে নয়। এমন বিশাল একটা বটগাছ কী করেই-বা এই ছোট্ট জায়গাটুকুর ওপর থাকতে পারে!

আমাদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি লেকের উল্টোধার জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বটগাছটা। দিনেরবেলায় যতবারই আমরা নিচতলা থেকে কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাই ততবারই সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই লেকের উজ্জ্বল জলে ছায়া-ফেলা স্নিগ্ধ সবুজ বিশাল বটগাছটাকে দেখতে পাই। গাছটাকে এতবার দেখেছি তবু সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই যখন গাছটার সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আর পরাক্রান্ত চেহারাটা জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের মতো চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন মনে হয় কী সামান্য ব্যবধানে কত অপরিমেয় একটা পৃথিবীকে এতক্ষণ অপচয় করে চলছিলাম। গাছটাকে দেখলেই জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ হতে ইচ্ছে করে।

আমাদের বাড়িটা ছোট। তবু এর ভেতর যেন রয়ে গেছে এক বিরাট চরাচরের উপস্থিতি। বাড়িটার যে-কোনো জায়গা থেকে উত্তরে-দক্ষিণে কয়েক মাইলের এক প্রাকৃতিক লীলাজগৎ দেখতে পাই আমি। বটগাছটার মতো এ জগৎটাও আমাদের নয়। তবু ওই গাছের মতো একেও আমি আমাদের সম্পত্তি বলেই মনে করি। এ বাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত আমরা যা দেখতে পাই, ভালোবাসতে পাই, দেখে অবাক হবার অধিকার পাই, সে তো আমাদেরই সম্পত্তি। মালিকানার দাবি করে তাকে কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

আমাদের চেয়ে হাজারগুণ ধনী মানুষ আছে আজকের ঢাকা শহরে, প্রাসাদের মতো উঁচু বিশাল বৈভবদীপ্ত সব ঘরবাড়ি তাঁদের। এক-একটা বাড়ির চোখ-ধাঁধানো জৌলুশের বহর এমন অবিশ্বাস্য যে, মনে হয় ট্যাকের পয়সা খরচ করে তাজমহল দেখতে আগ্রায় না গেলেও চলবে। কিন্তু ঢাকা শহরের মতো এমন জায়গায় প্রকৃতির এমন মনোরম স্নিগ্ধ বুকের ভেতর এমন নিবিড় একটা বাড়ির ভাগ্য তাদের কজনারই-বা হয়েছে! আমরা কপর্দকশূন্য মানুষ, কিন্তু ও' হেনরির 'উপহার' গল্পের যে গরিব নায়িকা বিবাহবার্ষিকীতে উপহার দেবার জন্যে তার দীর্ঘ সোনালি অলকগুচ্ছ বিক্রি করে তরুণ স্বামীর সোনার ঘড়ির জন্যে সোনার চেন কিনে এনেছিল আর একই সঙ্গে যে কপর্দকশূন্য স্বামী উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া নিজের সেই ঘড়িটা বিক্রি করে স্ত্রীর ঘন কেশদামের জন্যে একটা সোনার চিরুনি কিনেছিল তাদের চেয়ে আমাদের পরিতৃপ্তি কম কিসে! নিয়তি আর সবকিছুতে আমাদের প্রতারিত করেছে, কেবল এই জায়গাটুকু ছাড়া। ভালোবাসার দুই হাত উজাড় করে, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' আমাদের আকণ্ঠ দিয়েছে সে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ধন নয় মান নয় একটুকু বাসা/ করেছিনু আশা'। আমাদের বাড়িটা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের সেই একটুকু বাসা।

আগেই বলেছি আমাদের প্লট ছোট। বাড়ি আরও ছোট। তবু এতেই আমি খুশি। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আমি পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, বাড়ির ব্যাপারে ভাগ্য আমাকে সত্যিকার আনুকূল্য দেখিয়েছে। আমরা যারা সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অনাদরে অবহেলায়' গান গাই, তাদের রক্তাক্ত বর্শায় ক্ষতবিক্ষত করার মানুষের যেমন অভাব হয় না, তেমনি আবার ভালোবাসার মানুষও বেশকিছু থাকে। যারা অপর্যাপ্ত বিত্তশালী তাদের সঙ্গে আমাদের— পাথেয়হীন নিঃস্ব এইসব মানুষদের— পার্থক্য এখানটাতেই। টি.এস. এলিয়ট হয়ত সঠিকভাবেই লিখেছিলেন এই পার্থক্যের কথা। 'ওদের খানসামা আছে বন্ধু নেই, আমাদের বন্ধু আছে খানসামা নেই' ('They have butlers and no friends, we have friends and no butlers.')। এই বন্ধুরাই আমার পাথেয়। এরাই সাহায্য জুগিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, ঠেলে, ধাক্কিয়ে, প্রায় গায়ের জোরে বাড়িটা বানিয়ে দিয়েছিল। সেদিক থেকে প্রকৃতপক্ষে বাড়িটা তাদেরই। আমি তাদের ভালোবাসার দখলদার কেবল।

আমি বাড়ি বানিয়েছি শুনে আমার পরিচিতেরা চমকে উঠেছিল। আমার কাছ থেকে তারা সবরকম সাফল্য প্রত্যাশা করেছে, কিন্তু এটা করেনি। আমারও মনে হয়, সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল বানানোর চাইতেও আমার বাড়ি-তৈরির

ব্যাপারটা বিস্ময়কর। শাহজাহানের তো পূর্বপুরুষের অর্জিত মণিমাণিক্যের রাজকোষ ছিল, স্ত্রী আর নিজের স্মৃতিকে 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' করে রাখার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আমার? না উৎসাহ, না সাশ্রয়, না সাধ্য। উপরন্তু আমি ছাড়া পরিবারের সবাই ছিল এর বিপক্ষে। বন্ধু-বান্ধবদের সবার ভালোবাসাতেই এ সম্ভব হয়েছে। যে যা চায় পৃথিবীতে তা-ই সে পায়। আমি পৃথিবীর কাছে বিত্ত চাইনি। রাজ্য সাম্রাজ্য রাজদণ্ড প্রতিপত্তি প্রত্যাশা করিনি, আমি সবার হৃদয়ের কাছে ছোট একমুঠো ভালোবাসার জায়গা চেয়েছিলাম। আমি তা পেয়েছি। সে ভালোবাসা খুশি হয়ে এই বাড়ি আমাকে উপহার দিয়েছে। একে তাই আমি বাড়ি না বলে তাদের ভালোবাসাই বলি। তবু আমি জানি, এ-বাড়ি নিয়ে আমার বিপদ আছে। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইন মনে পড়ে : 'চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা।' কথাটা আমার জীবনেও সত্য। পথের নেশায় চিরদিন পাথেয় উপেক্ষা করেছি আমি। অবহেলিত পাথেয় আজ হোক কাল হোক তার প্রতিশোধ নেবে। আমি জানি, আমাদের দেশে যারা আনন্দের অহংকারে বাস্তবকে তাচ্ছিল্য করেছে তাদের জীবনের দুঃখময় বিপর্যয়ের চেয়ে আমার পরিণতি এতটুকু আলাদা হবে না।

বাড়ি তৈরির আগের আর পরের বারোটা বছর কেন্দ্রের কাজে আত্মবিস্মৃতের মতো আমার কেটেছে। সেই স্বপ্নস্রস্ত পৃথিবীতে এই বাড়ির অস্তিত্ব আমার চেতনা থেকে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভাড়াটেদের অনেকেই এই অভাবিত সুযোগ হারাবার নির্বুদ্ধিতা দেখায়নি। সবাই মিলে প্রায় কয়েক বছরের ভাড়া বকেয়া রেখে বিভিন্ন সময়ে বাড়ি ছেড়ে লাপাত্তা হয়েছে।

এ বাড়ির প্রতিটা ইট বন্ধকের। ঋণদান সংস্থা আর ব্যাংকের কাছে বন্ধক রেখে তৈরি। ব্যক্তিগত ঋণও কম নয়। বাড়ি ভাড়া না-পাওয়ায় ঋণের পরিমাণ সুদে-আসলে বেড়ে কয়েকগুণ হয়েছে। সুস্থভাবে বছর-পাঁচেক বেঁচে থেকে ভালো রোজগার করে এই টাকা ফেরত দিতে না পারলে বাড়ি বেহাত হয়ে যাবে। কিন্তু আমার রোজগার কোথায়? বছরের ওপর হল আমি চাকরি ছেড়ে বসে আছি। স্বাধীন আনন্দে নিজের ইচ্ছায় কাজ করে কমবেশি রোজগার করতে আমার আপত্তি নেই। তাকে আমি ভাগ্যের উপহার বলেই মনে করি। আমি জানি, টাকা জীবনের জন্যে খুব দরকারি। কিন্তু কেবল টাকার জন্যে বেঁচে থাকার মধ্যে কোথায় যেন অস্তিত্বের একটা গভীর অমর্যাদাবোধ আছে। নিজেকে অসম্ভব ছোট মনে হয়। আমার হাত-পা ভেঙে শরীর ঘুলিয়ে আসে, ভেতরটা মা-মরা শিশুর মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদে।

আমি জানি, টাকা রোজগার আমাকে দিয়ে হবে না। এ পৃথিবীতে জীবন মাত্র একবার; টাকার পায়ে এর অশ্লীল উৎসর্গের কোনো মানে নেই। পাথেয়কে আমি

তাচ্ছিল্য করে অপমান করেছি, তার প্রতিশোধ আমি এড়াতে পারব না। আজ হোক, কাল হোক, এই বাড়ি ক্রোক হয়ে যাবে। আমার চেয়ে অনেক বিত্তশালী কোনো মানুষ এসে কিনে নেবে আমাদের এই শব্দময় বাড়ি, যাকে দূর থেকে সোনালি মৌচাক বলে আমার ভুল হয়। সে কিনে নেবে দোতলার সব নিসর্গবেষ্টিত ঘর— এর হাওয়ায়-ওড়া বেপরোয়া বারান্দা, দোতলায় ওঠার প্রিয় কাঠের সিঁড়ি, পূর্ণিমারাতের হত্যাকারীর মতো বিশাল গোল চাঁদ, সবকিছু। কিন্তু যে অলৌকিক রূপের জগৎ প্রতি পলে আমি এখানে দেখছি, তা সে কোনোদিন কিনতে পারবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর দেওয়া নোটের ক্রয়ক্ষমতার তা বাইরে।

আমাদের বাড়ির এই রূপ যদি দেখতে চাও, আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাবার আগেই এখানে এসো। না হলে, পরে, আমার এইসব বর্ণনা পড়ে তুমি যদি কখনও এখানে আস আর এখানকার বাসিন্দাদের জিগ্যেস কর, 'আচ্ছা, এমন একটা জায়গা এখানে কোথায় আছে বলতে পারেন'— তারা তখন তোমার প্রশ্ন শুনে হয়ত প্রথমে কিছুক্ষণ ভাববে, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আশপাশের এলাকাগুলো হয়ত খুঁজে দেখবে মনে মনে; তারপর হতাশার স্বরে বলবে : আপনি কোন্ জায়গার কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না তো। এ এলাকায় এমন কোনো জায়গা তো নেই।

যা কেবল আমার একলার ভালোবাসা আর স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, তার ঠিকানা অন্য মানুষ কী করে জানবে?*

১৩৫

আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল এবং বিয়ের আগের দিন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এ থেকে আমার অনেক শুভানুধ্যায়ীর ধারণা আমার মৃত্যুর সঙ্গেই নির্ঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতন একটা সার্বিক ধ্বংসযজ্ঞ যদি পৃথিবীতে ঘটতেই হয় তবে অনুগ্রহ করে তা যেন আমার মৃত্যুর অন্তত ঘণ্টাখানেক পরে ঘটে। সমস্ত দিক থেকেই তা হবে সন্তোষজনক। প্রথমত, এতে আমার নিয়তিনির্ধারিত আয়ু পুরোপুরি পূর্ণতা পাবার অবকাশ পাবে। কেননা এই আমি মানুষটা— যে মৃত্যুর আজন্ম আতঙ্কে অপরিসীমভাবে ভীত ও ব্যথিত ছিল বলে প্রতিপলে জীবনের দুই গণ্ড থেকে সম্ভব মতো রক্তিমতা ছিঁড়ে নিতে চাইতাম, সে একদিন শক্ত হয়ে টানটান চাদরের নিচে নিঃসাড় শুয়ে থাকবে অথচ পৃথিবীর সব রঙিন টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এমনি মুখর উৎসাহে চলতে থাকবে,

---

* এই রচনাটি লেখার দু'বছর পর বাড়িটা বিক্রি হয়ে যায়। এখন ওটা আর 'আমাদের বাড়ি' নয়, 'তাহাদের বাড়ি'।

লোকেরা বেলেল্লাহল্লায় গান গাইবে, ফুর্তি করবে— আমার মানবজন্মের জন্যে এর চেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য আর কী হতে পারে। কিন্তু ধরা যাক, দৃশ্যটা যদি এরকম না হয়ে এমন হয় : আমার মৃত্যুসংবাদে পৃথিবীর রাস্তায় রাস্তায় তাবৎ পথচারী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে গেছে, যানবাহন স্তব্ধ, দেশে দেশে রাষ্ট্রপ্রধানেরা আমার শেষকৃত্যে যোগদানের জন্যে তড়িঘড়ি রওনা হয়েছেন— এককথায়, সারা পৃথিবীর জনজীবনে শোকের কালো ছায়া— তবে তার চেয়ে আমার মৃত্যুর জ্যোতির্ময় ছবি আর কী হতে পারে? ধরা যাক, এর চেয়েও আরো আকাঙ্ক্ষিত সেই অসম্ভব ঘটনাটিই যদি ঘটে— আমার মৃত্যু-মুহূর্তেই বিশ্বসৃষ্টির সেই অন্তিম ধ্বংস-সংগীত তুলকালাম শব্দে গর্জে ওঠে— এককথায় পৃথিবীর সব হাসি-গান, অফিস-যাওয়া, সরগরম সন্ধ্যা আর টেলিভিশনের আনন্দিত রাত— এক তুড়িতে উধাও হয়ে যায়, তবে আমার চেয়ে সুখী কে?

তবু জানি, সব দুরাশার মতো আমার এই ভাবনাগুলোও নিরেট মূর্খতা। আমার মৃত্যুর ব্যথায় মহান বা সামান্য কোনো আপতিক বিপর্যয়ই ঘটবে না কোনোখানে, পৃথিবীতে একটা হল্লার শব্দও কম হবে না।

না, যুবরাজ হ্যামলেট আমি নই, আর তা হবার জন্যে জন্মিও নি পৃথিবীতে। আমি তো 'চলনসই পদ্য লিখি'— আমার ডাকে কোন্ নিঃশব্দ শূন্য সাড়া দেবে?

মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রা যাঁদের কাছে সম্পন্ন আত্মজীবনী প্রত্যাশা করে আমি সে দলের মানুষ নই। তবে কেন এই ঔদ্ধত্য? আত্মজীবনীর বেনামিতে এই হাস্যকর আত্মপ্রতারণা!

না, আমার রক্তের ধারায় প্রতিভার জ্বলন্ত অগ্নিকণা অসাধারণ স্ফুরণে জ্বলে ওঠেনি কখনো— অসম্ভবের নেশা জন্মান্ধ আক্রমণে হৃদয়কে হিংস্র করেনি। গৃহপালিত রক্তে আমি একটা নিরীহ আর গতানুগতিক মানুষের হৃদয়কেই লালন করেছি আজীবন।

তবু বলি : আমি নই, কিন্তু যে-যুগে আমি জন্মেছিলাম অন্তত একটা কারণে তা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তা হল : একটা বিরতিহীন বিশাল পতন আমার যুগে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

গিন্সবার্গের মতো বন্য চিৎকারে আমি শুধু বলতে পারি : 'আমার যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষদের উন্মাদ হয়ে যেতে দেখেছি আমি।'

আমার যুগের প্রায় প্রতিটি মানুষকে আমি ধুলোর দামে বিক্রি হতে দেখেছি। দেখেছি, কী করে একটা বিশাল অপরিমেয় জাতি পুরুষত্বহীন হয়; প্রতিটা মানুষ তার বিশ্বাসকে কত অল্পদামে বিক্রি করে নিরাশ্রয় হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মতো আমার যুগের কোনো কৃতার্থ কবি কি জীবনের পরিপূর্ণতা নিয়ে জেগে উঠে আর বলতে পারবে : 'আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি।'

এ যুগের তরুণ কবি কী করে তাঁর মতো করে লিখবে :

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'?

আমাদের সময়কার তরুণ কবির কালসম্মত উচ্চারণ এজন্যেই হয়ত এরকম :

'দীর্ঘ আয়ু ভালোবাসিনে
মরিতে চাই দ্রুত।'

আমাদের অকালপ্রয়াত কবিবন্ধু হুমায়ুন কবিরের একটা ছোট্ট কবিতার নায়কের মতোই ছিল এ-যুগের দুঃখময় অবয়ব :

'ফিরে আসি ফের। ভীরু,
পদাঘাতে পিষ্ট, তবু কুকুর যেমন করে
ফিরে আসে তার প্রভু ঘাতকের কাছে,
তেমনি আবার দ্যাখো ফিরে আসি তোমার দুয়ারে,
তোমার আলোর দিকে ফিরে আসি— ক্লান্ত ক্রীতদাস,
তোমার নিষ্ঠুর ঘরে, হে আমার পরম ঘাতক!'

অসহায়তা— উদ্ধারহীন বিশাল এক সর্বগ্রাসী অসহায়তার কাছে বারে বারে ফিরে আসার আত্মধ্বংসী দুর্ভাগ্যই আজ আমাদের বিধিলিপি। তবু, উজ্জ্বল আর বিভাময় একটা পৃথিবীকেও এর পাশাপাশি আমি দেখেছি আমার কালে। সম্ভাবনা এবং ব্যর্থতা, উদ্যম এবং আশাভঙ্গ, উৎসাহ এবং পতন পালাক্রমে বা পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে আমার সমকালে।

নির্লজ্জ স্বার্থপরতা এবং স্থূল রজতলিপ্সার দুঃখময় রাস্তায় আমার যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষদের অসহায়ের মতো ভেঙে যেতে দেখেছি আমি।

আর্থিক সংকটের নির্দয় অভিঘাতের পাশাপাশি জাগতিক উন্নতির অবাধ লিপ্সা আমার কালের সবচেয়ে মূল্যবোধসম্মত মানুষদেরও নিঃস্ব করে দিয়েছে। দেখেছি, কী করে তাদের সৃজনশীল সম্ভাবনা ভিখিরি হয়ে গেছে।

দেখেছি, জাতীয় জাগরণের প্রাথমিক বিপুল সূচনা, সর্বগ্রাসী জলোচ্ছ্বাসের মতোই, বর্বর উল্লাসে, মূল্যবোধের দীর্ঘকালবাহিত সুস্থিত সীমিত অঙ্গনকে দলে ধর্ষে শ্রেয়োবোধের সব শ্রদ্ধেয় সৌধকে কীভাবে অসম্মানিত করেছে।

আমি বিজয় দেখেছি এবং দেখেছি বিজয় কী দুঃখজনকভাবে পরাজিত হতে পারে।

স্বাধীনতার অর্থ কীভাবে হয়ে দাঁড়ায় অকর্ষিত দস্যুতার বিবেকহীন অবাধ উপনিবেশ। চিরায়ত মূল্যবোধ এবং বৈদগ্ধ্যের গর্বোদ্ধত মাথা কীভাবে ধুলা আর কাদায় নিপতিত হয়ে যায়।

তবু অবক্ষয়ের কালো অন্ধকারের ভেতর তিমিরহননের অম্লান স্ফুরণ আশান্বিত

মুখ দেখিয়েছে প্রতিটি সম্ভাব্য বিরতিতে। জাতীয় জীবনের ভিত থেকে মুক্তির অপরাজিত পিপাসা ক্ষুধিত জাগুয়ারের মতো জেগে উঠে এই সময়ের মধ্যে ছিনিয়ে এনেছে দু-দুটি স্বাধীনতার অনিন্দ্য নিষ্ঠুর রক্তগোলাপ।

একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিশেবে এই দেশের জন্মমুহূর্ত প্রত্যক্ষ করেছি আমি। আশঙ্কাস্পন্দিত বুকে সুনীল আকাশে জাতীয় পতাকার প্রথম দর্পিত উত্তোলন স্বচক্ষে দেখার দুর্লভ ভাগ্যের আমি অধিকারী ছিলাম। অশ্রু এবং উল্লাসের অকথ্য অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন হতে হতে বাংলার প্রতিটি গৃহের কার্নিশে সেই পতাকার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠা দেখেছি।

তিন-তিনটি রাষ্ট্রকাঠামোর সার্বভৌমত্বের নিচে এই দেশ ও জাতি এই সময়ে অস্থির বিপুল এক পরিবর্তমানতার ভেতর আত্মস্বরূপের অন্বেষণে ক্ষান্তহীন ছিল।

অসংখ্য উজ্জ্বল সংগ্রাম এবং দুঃখময় আত্মদান— এই কালপরিধিকে মথিত করেছে।

বৈরী অন্ধকার এবং দাঁতাল বর্বরতার মুখে ফিরে ফিরে দুর্জয় হয়েছে সেই অমেয় ও জন্মান্ধ চেতনা— যা কালে ও ভূগোলে পরাভবহীন।

এককথায় উত্থান এবং উন্মোচন, বিজয় এবং বিপর্যয়, উন্মুখতা এবং ক্ষান্তি এই ক্রান্তিযুগের রক্তাক্ত মুখাবয়বকে এক বিরোধব্যথিত দ্বৈতচরিত্রে দ্বিখণ্ডিত ও অনিন্দ্য করে তুলেছে। সুতরাং আমি নই, কিন্তু যে সময়-পরিসরে আমি এই পৃথিবীতে বেঁচে ছিলাম (কিংবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে : একটি অবধারিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম), নানা কারণে তা ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের এযাবৎকালের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়।

এটা সেই সময়, যখন আবহমানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই নিষ্ক্রিয় জনগোষ্ঠী একটা সর্বাত্মক জাতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আত্মদানের ভেতর দিয়ে মহান পবিত্রতায় স্নাত হয়েছে; যখন ভেদাভেদহীন দুঃখ সারা জাতিকে একটা অভিন্ন চাঁদোয়ার নিচে এক ও অভেদ্য করে তুলেছিল এবং মুখরিত যুদ্ধযাত্রার উচ্চকিত পদশব্দের ভেতর দিয়ে এই জাতি প্রথমবারের মতো জেগে উঠেছিল সামরিক পরিচয়ে।

এটা সেই সময়, যখন আবহমানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, এক বিশাল রক্তসাগরের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে, নতুন চরের মতো, একটা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে অভ্যুদয় ঘটেছিল আমাদের। আমাদের এই সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী বিশ্বজনীনতার উজ্জ্বল আকাশে স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

আবার বলি : আমি নই, কিন্তু যে দেশ ও কালে আমি জন্মেছিলাম নানা কারণে তা আগামীকালের মানুষদের চোখে ফিরে ফিরে বিস্ময় জাগাবে। সেই মহান ও মর্মন্তুদ, অভাবনীয় ও আত্মবিরোধী, বিস্ময়কর ও বিভ্রান্তিপূর্ণ কালপরিধিই আমার আত্মচরিতের মূল বিষয়।

এমন একটা যুগে আমরা বেঁচে আছি যখন গভীরতম হতাশা এবং অফুরন্ত আশাবাদ একই সঙ্গে আমাদের উজ্জীবিত ও স্নায়ুহীন করে রেখেছে।

হতাশার দিকটিই প্রথমে বলি।

আজ এদেশের ষোল থেকে ছিয়াত্তর বছরের প্রতিটা মানুষের কথাবার্তাতেই বেদনার একই বেহালা : "হবে না, হবে না! যতই চেষ্টা করুন কিছুই হবে না।" মূল্যবোধের ধস, সার্বিক বিশৃঙ্খলতা এবং অরাজকতা সবচেয়ে শক্তিশালী হৃদয়কেও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

এবার আসুন দেখি, এই অবক্ষয়ের চেহারাটা কী রকম। বেশিদিনের কথা নয়, আমাদের ছেলেবেলাতেই, একজন শিক্ষককে মাইলখানেক দূর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলেও আমরা নির্ভুলভাবেই বলে দিতে পারতাম : একজন শিক্ষক যাচ্ছেন।

ওই শিক্ষকের হেঁটে যাবার বিশিষ্ট ভঙ্গি, পোশাকের স্বাতন্ত্র্য, হাতের মুঠোয় বই ধরার বিনীত বিশিষ্টতা— সবকিছু মিলে এমন একটা শিক্ষকোচিত চরিত্র ফুটিয়ে তুলত যে, তাঁকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হত না। এখন ব্যাপারটা আর সেরকম নেই।

এমন বেশকিছু শিক্ষককে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, যাঁদের দেখে বোঝা মুশকিল— তাঁদের পেশা ঠিক কী? তারা কি ডাক্তার, কন্ট্রাক্টর, দারোগা, না আমলা, নাকি অন্যকিছু— কিছুই ঠিকমতো বোঝা যায় না।

সবকিছু একাকার হয়ে আজ আদ্যোপান্ত 'এক পাতলুনের ভেতর' চলে গেছে।

কেউ আর তার নিজস্ব মর্যাদার অবস্থানে দাঁড়িয়ে নেই।

দেশ বা জাতির উত্থানকে কেউ আর তার নিজের কল্যাণ বা উত্থান বলে ভাবছে না। ভাবছেই না, জাতি এবং রাষ্ট্রের দৃঢ়প্রোথিত ভিত্তিই শুধুমাত্র হতে পারে সকলের মর্যাদাবান অস্তিত্বের একমাত্র নিশ্চয়তা।

পাড়ায় আগুন লাগলে এখন যে যার ব্যক্তিগত কপাট শক্ত হাতে এঁটে দিয়ে একা একা বাঁচতে চাচ্ছে।

বুঝতে পারছে না, চারধার থেকে মৃত্যু-সাম্রাজ্য পরিবেষ্টিত হয়ে মানুষ একা বাঁচতে পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে চারপাশের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম চালানো আজ তার প্রয়োজন; সকলের অস্তিত্বের স্বার্থে এবং সেইসঙ্গে নিজের।

চিকিৎসক এখন রোগীর হিত দেখছে না, শিক্ষক ছাত্রের হিত না, আমলা লোকহিত না, রাজনীতিবিদ জাতির হিত না।

সব হিতের ওপর দিয়ে সারাদেশে শুধুমাত্র একটি হিতের মাথাই আজ দাঁতালের মতো দাঁড়িয়ে আছে : আত্মহিত। 'আমার হবে তো', 'আমি পাব তো', 'আমি খাব তো'— এই কদর্য অশ্লীল চিৎকারের নিচে আজ সারাদেশের সমস্ত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ।

সমষ্টির হিতকে পায়ে মাড়িয়ে সারাদেশ আজ আত্মস্বার্থের ক্লেদাক্ত অধঃপতনের নিচে ক্রন্দনরত।

কোনো ন্যায়নীতি নেই, সামাজিক কল্যাণ নেই, ন্যূনতম বিবেক বা চক্ষুলজ্জার অবকাশ নেই, আদর্শ বা মূল্যবোধ নেই— আছে কেবল 'ব্যক্তি' আর তার বর্বর অলজ্জ স্বার্থ— অদ্ভুত আঁধারের নিচে সারাদেশ আজ বিমূঢ় ও উদ্ধাররহিত।

কেন ঘটল এই অবক্ষয়? চার বা পাঁচ দশক আগে, এমনকি আমাদের ছেলেবেলার অবস্থা তো এমন ছিল না; বরং সুস্থিত বুদ্ধি এবং শুভ চেতনাকে জাতীয় অস্তিত্বের সবখানে তখন অম্লান আলো ছড়াতে দেখেছি।

অথচ এই সময়ের মধ্যে জাতির বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটেছে অবিশ্বাস্য হারে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই উন্নতি এমন বিপুল যে, এর আগের যে-কোনো কাল-পরিসরের সঙ্গে তা তুলনীয়ই নয়। সহজেই প্রশ্ন আসে, এমন বিপুল সমৃদ্ধির পাশাপাশি এই বেদনাদায়ক অবক্ষয় ঘটল কী করে! এ ব্যাপারে আমার উত্তর সাদামাটা। আমার ধারণা, আমাদের আজকের এই অবক্ষয় আমাদের আজকের বিপুল বিকাশেরই ফলশ্রুতি। কথাটা পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে বলে প্রথমেই এর ব্যাখ্যা দিয়ে নিতে চাই।

আমাদের ছেলেবেলায় এদেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি দেখেছি তার আয়তন ছিল একেবারেই ছোট। দেশের ভেতর তখন যে অল্পবিস্তর বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিত, তা ছিল কমবেশি এদেরই দখলে। দেশের আপামর জনসাধারণের তাতে কোনো অধিকার ছিল না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন সবকিছু বদলে গেল। সাতচল্লিশের পর অল্পস্বল্প এবং একাত্তরের পর পুরোপুরি দেশের সমস্ত জনসাধারণের সামনে কোটি কোটি সুযোগের অবিশ্বাস্য দরজা হঠাৎ করেই খুলে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এ সুযোগের বিশাল প্রসার দেশের প্রায় প্রতিটি আঙিনাকে স্পর্শ করেছে।

আমাদের ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল সীমিত। লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়া ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। গত চল্লিশ বছরে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা-সুযোগের যে কী বিশাল প্রসার ঘটেছে তা সবারই জানা। হাজার হাজার নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার সুযোগের মধ্যে নিয়ে এসেছে। বহু নতুন কল-কারখানা ব্যবসা চাকরির মতো অসংখ্য কর্মসংস্থান তৈরি হয়ে জাতীয় জীবনে সূচিত করেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-উদ্যোগ যেমন বেড়েছে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি স্নায়ুতন্ত্রীর মতো অজস্ররেখায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দেশের সবচেয়ে সুদূর এবং পশ্চাৎপদ

গ্রামটির স্তব্ধ অনড় জীবনযাত্রার নিশ্চল অচলায়তনের ভেতরেও আজ এই উন্নয়নের হাওয়া। আমি নিশ্চিত গত চল্লিশ বছরে আমাদের দেশে ঐহিক উন্নতি যে বিপুল বিকাশ ঘটেছে তা তার আগের এক হাজার বছরের বৈষয়িক সমৃদ্ধিকেও অতিক্রম করেছে। এই ধরনের প্রস্তুতিহীন, আকস্মিক ও সর্বগ্রাসী বিকাশের মুখে যে-কোনো সুশীল মূল্যবোধের পতন ঘটে যাবার কথা এবং ঘটেছেও তা-ই। আমাদের ছেলেবেলার ছোট্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণির সেই শান্ত নিরুদ্বেগ মূল্যবোধগুলোকে এখন, এই বিশাল 'উত্থানের' মুখে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন নীতিবোধ পদদলিত, সুবচন নির্বাসনে, শুভ্র সুন্দর কল্যাণ আনন্দ পলাতক এবং ব্যক্তি আর ব্যক্তিস্বার্থের বর্বর আগ্রাসনের নিচে সারাটা জাতি লুণ্ঠিত এবং বিস্রস্ত।

শুধুমাত্র এ থেকেই কিন্তু এমন বিশ্বাসে পৌঁছোতে চাই না যে, এই পতন সামগ্রিক বা উদ্ধারহীন। বরং অবস্থাটাকে তুলনা করা যেতে পারে নদীর প্রথম বর্ষার হিংস্র উচ্ছ্রিত জলস্রোতের সঙ্গে। সকলেরই জানা আছে, নদীতে যখন প্রথম বর্ষার পানি দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তা কী পরিমাণ কদর্যতাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটাই নদীর চিরকালীন রূপ নয়। কেননা এরপরই নদীর পানি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সে থিতিয়ে আসতে থাকে, শুরু হয় তার সম্পন্ন ও গভীর হয়ে ওঠার পর্ব। আর এমনি এক সহজ পরিণতির ভেতর থেকেই আমরা ভাদ্রের পরিপূর্ণ নিটোল নদীটাকে প্রাকৃতিক নিয়মেই একসময় পেয়ে যাই।

কাজেই যাকে আমরা অনেক সময় পশ্চাৎযাত্রা বা পতন বলে ধরে নিই, অনেক সময়েই তা ঠিক পতন নয়; বরং হেরে-যাওয়ার ছদ্মাবরণের আড়ালে তা একধরনের অগ্রযাত্রারই অন্য নাম। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ধরা যাক, একটা গাড়ি পাহাড় বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে। আমরা এই ওঠার পর্বটার কী নাম দেব? আমরা বলব : গাড়িটা উঠছে, মানে উত্থান হচ্ছে। কিন্তু গাড়িটা যখন পাহাড় বেয়ে নামতে শুরু করবে তখন আমরা কি বলতে পারব, গাড়িটা যেহেতু নামছে, কাজেই তার পতন হচ্ছে? না, তা বলতে পারব না। কেননা গাড়িটা নিচের দিকে নামলেও তার চাকা পেছন দিকে ঘুরছে না। সে তো সামনেই যাচ্ছে। প্রশ্ন আসবে, তাহলে নামছে কেন? উত্তরে বলা যাবে, নামছে সামনের পাহাড়ে উঠবে বলে। সুতরাং এই অবতরণ আসলে একটা আরোহণেরই অন্য নাম। আমার ধারণা, আমাদের মূল্যবোধের আজকের এই পতন আসলে আমাদের জাতির উত্থানেরই এক ছদ্মবেশী প্রস্তুতি। আমরা যেন না ভুলি মূল্যবোধের এই পতন আমাদের জাতীয় জীবনে বিত্তের অভাবিত প্রবেশের ফলশ্রুতি, যা থিতিয়ে আসার পর তার ভেতর থেকে উচ্চতর মূল্যবোধসম্পন্ন একটা জাতির জন্ম আমরা প্রত্যাশা করতে পারব।

আমি বুঝি না, একটা জাতির জীবনে পুঁজির প্রথম পদপাত অপরাধের ইতিহাস ছাড়া কীভাবে সম্ভব!

আজ আমরা এই জাতির দূর অতীতের দিকে যখন তাকাই তখন এর কোন্ চেহারা আমাদের চোখে ভাসে? অনাহারক্লিষ্ট নির্জীব নিরন্ন একটা বিশাল জনগোষ্ঠী— পৃথিবীর জন্মের পর থেকে যারা প্রায় কিছুই পায়নি। রুটি, মাখন, জ্যাম, জেলি, পনির— না, কোনোকিছুরই স্বাদ নেওয়া হয়নি এদের। একটা ভালো জামা গায়ে দেয়নি; ভালো কাপড় পরেনি; ভালো বিছানায় শোয়নি। এমনি সময়ে, এই উপবাসক্লিষ্ট মানুষের সামনে, প্রায় অলৌকিক ঘটনার মতো বৈষয়িক সুযোগের কোটি কোটি দরজা একসঙ্গে খুলে গেল। কেবল দেশের নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ আজ তার সামনে দরজার মতো খোলা। হংকং, দুবাই, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, নিউইয়র্ক, প্যারিস— সারা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডারের কোনোকিছুই আজ তার আয়ত্তের বাইরে নয়। ঐশ্বর্যের এই অবারিত হাতছানির সামনে দাঁড়িয়ে এখন, এই মুহূর্তে, সে কী করবে? আদর্শ আর মূল্যবোধের ধুয়ো তুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? চোখের সামনে ঈপ্সিত ঐশ্বর্যের অবাধ লুণ্ঠন তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করবে? আমার ধারণা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-আশ্রয়হীন নিঃস্ব মানুষের যা করার কথা, সে তা-ই করেছে। দুর্বল রাষ্ট্রব্যবস্থার সুযোগে এই বিশাল সুযোগযজ্ঞের ওপর উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সে জানে, তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। খুন করে হোক, মেরে হোক, কেড়ে হোক, তাকে আজ সব পেতে হবে। যুগ-যুগের অনেক অসমাপ্ত সাধ, অচরিতার্থ বাসনা পূর্ণ করতে হবে এই সুযোগে। মহান কথার ছেঁদো বুলি দিয়ে ঐশ্বর্যের এই অপ্রত্যাশিত সুযোগকে সে হাতছাড়া করতে পারে না। এ সুযোগ তার আর আসবে না। সে জেনেছে: এটা তার 'মূল্যবোধে'র যুগ নয়, এটা তার 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'র যুগ। আজ আদর্শের দোহাই তুলে, বিত্তকে বর্বরতা বলে, সম্পদ জড়ো করার উন্মাদনা থেকে নিজেকে নিরস্ত করতে গেলে নিজের প্রতি তার নিষ্ঠুরতা করাই হবে। এখন সে জড়ো করুক, বিত্তের পাহাড় গড়ুক, লিপ্সায় ভোগে মাতাল হোক, সাধ মেটাক, তৃপ্ত হোক, তারপরে প্রকৃতির নিয়মে একদিন সে আপনিই 'মূল্যবোধ' উপহার দেবে। First we have to feed ourselves and then philosophise.

আমাদের এই মূল্যবোধের অবক্ষয়কে যত নৈরাজ্যজনক বলেই মনে হোক, আমার ধারণা, আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ একটা প্রগতিশীল ঘটনা— বাইরে নৈরাশ্যের অন্তরালে একটা বিপুল জাতীয় উত্থান।

[বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'মুক্তধারা' অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতার ঈষৎ পরিমার্জিত রূপ : ১৯৯৪]

প্রথম পর্ব : ২

[১৯৮৪-১৯৯০]

১

বিজ্ঞান কলেজে (তখন নাম ছিল ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ) যখন যোগ দিয়েছিলাম, তখন আমি তারুণ্যের দরজায়। অনেক সজীব স্বপ্ন তখন দু-চোখ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। অবিশ্বাস্য অসম্ভব কিছু ঘটবে ভেবে যে জীবনকে সেদিন এত গরীয়ান, এত আকাশস্পর্শী ভেবেছিলাম, আজ টের পাচ্ছি তার তুলনায় কত সামান্য আর ভিখিরি এই জীবন। তবু সেদিন স্বপ্ন দেখতাম, দেখতে পারতাম, এটাই ছিল শক্তি।

ওই কলেজের কথা মনে হলে সেই স্বপ্ন দেখার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। তখন শিক্ষাকে শিক্ষকতাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈভব বলে সম্মান জানিয়েছিলাম। এখন চারপাশে তার দুরপনেয় পতন দেখে দুরূহতর সংগ্রামের পদধ্বনি শুনছি। এই কলেজ ছেড়ে আসার পর কত বদলে গেছে এই শিক্ষায়তন। কত মুখ ছিল, এখন তারা নেই। কত নতুন মানুষের পদপাতে এর চত্বর মুখর হয়েছে এর মধ্যে। কত মানুষ ছিল স্বাস্থ্য আর যৌবনে পরাক্রান্ত। তারা এখন ন্যুব্জদেহ, বার্ধক্যের দিকে নোয়ানো।

একটা পুনর্মিলনী এইসব মনে করিয়ে দেয়।

২

সবকিছুকে এমন মিথ্যাচারী আর ভানসর্বস্ব মনে হচ্ছে কেন? মানুষের সব প্রতিজ্ঞাই কি শেষ পর্যন্ত কুকুরের চিৎকার? স্বপ্ন মানেই বর্শাবিদ্ধ লাশ? প্রিয় মুখ আর স্মৃতি মানেই বিবমিষা?

কোন্ দিকে যাব?

৩

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-এর কথার জবাবে, মনে মনে :

ওরা অন্যদের ফাঁকি দিয়ে নিজের মিথ্যাকে বাঁচাতে চাচ্ছে, স্যার! আমি মরছি নিজেকে ফাঁকি দেবার অশ্লীলতা থেকে বাঁচবার যন্ত্রণায়।

৪

অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। এই না-দেখার ছায়াগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে সমস্ত বাস্তবকে ঢেকে ফেললেই সবকিছুর অবসান।

৫

আমাদের দেশের উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েগুলো প্রায় দুর্ভাগ্যের প্রতীক। না-চাইতেই সবকিছু পেয়ে অকালে বুড়িয়ে শেষ হয়ে যায়। বিস্মিত হবার, স্বপ্ন দেখার, নিজের সঙ্গে প্রতিযোগিতার হিংস্র তীব্র সুখটুকু খুইয়ে মরে ঝরে শুকিয়ে যায় একেবারে। আমার ধারণা, এদের বুদ্ধিমান বাপ-মায়েরা একটাই দামি সম্পদ রেখে যেতে পারেন এদের ভালোর জন্যে। তা হচ্ছে : অল্পস্বল্প কিছু দুর্ভাগ্যের যৎসামান্য সুযোগ— যে রক্তাক্ত বলটাকে লোফালুফি করে এরা এই জীবনকে কাটিয়ে দিতে পারবে।

৬

একাত্তরে এত রক্ত দিয়েছি, অথচ আজ দেশের এমন আশঙ্কাকর পরিস্থিতিতেও কেউ কিছু করতে পারছি না। 'দেবার মতো রক্ত' আমাদের কি তবে শেষ!

৭

ভালোবাসলে দুজনকে দুজনের কিছুই জানাতে হয় না। অপার্থিব পুলকানুভূতির ভেতর তারা টের পায় : পরস্পরের দিকে তারা শুধু আসছে...।

৮

যাদের কিছুই দেবার নেই, তাদেরও আমাদের কিছু দেবার আছে।...

৯

আমারও একটা সুন্দর যৌবন ছিল একদিন। তোমাদের অনেকের চাইতে সুন্দর!

১০

শামসুর রাহমান লিখেছিলেন : 'বেগম পেতে চায় বাঁদীর সুখ।' আমাদের যুগের সঙ্গে কথাটা আশ্চর্যভাবে মেলে! সবাই রাজমুকুট ফেলে 'গোলাম'— একটা পরিতৃপ্ত সুখী গোলামের জীবন খুঁজে নিল? কেউ নিজের হৃৎপিণ্ডের আগুনকে বিশ্বাস করার সাহস করল না!

১১

আজ মিন্টো রোড ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম। সকাল তখন ন'টা-সাড়ে ন'টা। গাছপালায় ঢাকা সবুজ নির্জন রাস্তাটা অপরূপ! হঠাৎ একটা মিষ্টি নরম হাওয়া কারো স্নিগ্ধ হাতের মতো গায়ে এসে লাগল। চমকে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে নিলাম। না, কেউ নেই কোথাও।

এমনি সময় হঠাৎ সামনেই একটা লাশ দেখলাম— কয়েকটা মানুষ একটা খাটিয়ায় করে নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে চলেছে।

কেন এসব দৃশ্য আমার সব অপরূপ মুহূর্তগুলোকে এভাবে ছিঁড়ে কেবলই বীভৎস মুখ জাগায়?

১২

আমাদের কেন্দ্রের ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। এরা এমন সুন্দর আর গুণান্বিত যে প্লেটোর একাডেমিও হয়ত এদের পেলে গর্ব করত। কিন্তু সমস্যা একটাই : এদের মধ্যে যারা সন্ন্যাসী তারা যৌবনকে চেনে না— যারা তারুণ্যদীপ্ত তারা প্রত্যাখ্যানে পরাঙ্মুখ। একহাতে যৌবন অন্যহাতে প্রত্যাখ্যান— যৌবরাজ্যের সেই কান্তিমান বরপুত্রদের কোথায় পাই?

১৩

কী হল একটা জাতির? এত কোটি কোটি মানুষ একসঙ্গে নির্বীজ হয়ে গেল! কী অসহায় আর নিঃস্বতার মধ্যে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। প্রিয় দেশবাসী, তোমরা এত অল্প দামে তোমাদের 'দ্বীন আর মিল্লাত'কে বিক্রি করে দিলে?

১৪

এক ধরনের স্ত্রী আছে যারা যৌবনের জন্যে ভালো; এক ধরনের স্ত্রী বার্ধক্যের জন্যে। প্রথম ধরনের স্ত্রীরা পৃথিবীতে সত্যিই বিরল। দ্বিতীয় জাতের সংখ্যা প্রথম জাতের তুলনায় হয়ত বেশি, তবুও বিরল। আরেক ধরনের স্ত্রী আছে যারা যৌবন এবং বার্ধক্য— দুয়ের জন্যেই ভালো। এরা যে কত বিরল তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তবে সবচেয়ে বিরল এ পৃথিবীতে যা, তা হল, চলনসই একটা মোটামুটি ভালো বউ।

১৫

জীবন তো একগুচ্ছ প্রদীপ— এর সব উঁকিতেই আলো। শুধু একটাকে হারিয়ে আরেকটায় জ্বলে ওঠা।

১৬

জন্মগতভাবেই যারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত, ধরে নিতে হবে না কি যে ওই কারণেই, এক অর্থে, তাদের বিকাশও রুদ্ধ। নিঃশেষিত ও পরিণত একটা অগ্রসররহিত মৃত স্থির অসাধারণত্বের আলোকোজ্জ্বল জগতে বেঁচে থাকাই তাদের বিধিলিপি। কী হবার আর থাকল তাদের? কার সঙ্গে সংগ্রামে নিজেকে রক্তাক্ত করবে? পৃথিবীতে জন্মে যাদের নিষ্ঠুরতম সংগ্রাম করতে হয়, করে লাভবান হওয়া সম্ভব হয়, তারা তো 'মাঝারি'। নিজেদেরই ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে, দৈন্যের বিরুদ্ধে, জন্মগত অপারগতা আর বৈকল্যের বিরুদ্ধে জিতে জিতে অসাধারণত্বকে তাদের রোজগার করতে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে। মানবসভ্যতার ইতিহাস যাদের মাথায় অসাধারণত্বের শিরোপা দিয়েছে কিংবা সেইসব মৃত্যুঞ্জয়ী লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের রক্তমাখা চন্দ্রমল্লিকায় আজ সভ্যতা কান্তিমান, তারা কি এইসব 'জন্মগত প্রতিভা' নাকি সাধারণের ছদ্মবেশে অনুপ্রেরণাদীপ্র ওইসব উপেক্ষিত 'মাঝারি'?

১৭

প্রত্যেকটা জন্মদিন একেকটা ছোট্ট মৃত্যুকে পায়ের সামনে ফেলে রেখে যায়।

১৮

সেদিন একজন পরিচিত ভদ্রলোক বলছিলেন, "যদি ধরে নিই কারো কাছ থেকে আমাকে কিছু পেতে হবে, তবে প্রথমে তার কাছে সেটার জন্যে হাতজোড় করে 'অনুরোধ জানাব'। বলব, জিনিসটা দেবে ভাই, বড় দরকার, না হলেই নয়, দিতেই হবে তোমাকে, দাও। যদি তাতে না হয় তবে হাতজোড় করে তার কাছে 'ভিক্ষা চাইব'। পা ধরে বলব, না হলে চলবেই না, দাও দয়া করে, ভিক্ষা দাও। তাতেও যদি উদ্ধার না হয়, তবে শেষ কাজটা করব। লোকটাকে খুন করব। কিন্তু জিনিসটা আমার চাই।"

প্রতিকূল একটা পৃথিবীকে জয় করে যাকে প্রতিদিন ইঞ্চি ইঞ্চি এগোতে হচ্ছে, এই হিংস্র আগ্রাসন তার নিয়তি। চারপাশে বেশকিছু মানুষের মধ্যেই তো জীবনের এই দুর্ধর্ষ শক্তি আর বন্যতা লক্ষ করি।

এই রক্তবীজের উৎসার নিজের গৃহপালিত শোণিতধারায় খুঁজে পাই না কেন?

১৯

ভালোবাসার কাছ থেকে তিনটি মূল্যবান জিনিস প্রায় অবধারিতভাবেই উপহার পেয়েছি :

অকথ্য সুখ, অসহ্য যন্ত্রণা, আর একটা বিশাল সুপরিপক্ব ব্যর্থতা।

২০

কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলেকে সত্যি সত্যি পটাতে চায় তবে অযথা সময় নষ্ট না করে ছেলেটাকে সোজাসুজি 'ভাইজান' বলে ডাকতে শুরু করা উচিত। লাভ হাতেনাতে। কয়েকদিনের মধ্যেই ভাইজানের 'ভাই'টা লেজের মতো খসে পড়ে যাবে, থেকে যাবে শুধু 'জান'টা।

২১

আজ সকালে শ. ফোন করে বলল : কলেজটাকে এমন অদ্ভুতভাবে জুড়ে থাকেন যে, যতক্ষণ এখানে থাকেন ততক্ষণ তো চোখে পড়েই, যখন থাকেন না তখনো জায়গাটা জুড়ে থাকেন। কথাটা একই রকম অনুভূতি দিয়ে বছরকয়েক আগে বলেছিল আরেকজন লোক। লোকটা নেহাতই সাধারণ। আমি তখন সবে গ্রিন রোডের বাসা ছেড়ে বেইলি স্কোয়ারের বাসায় উঠে এসেছি। মাসখানেক পর, বোধহয় কোনো কাজের সূত্রেই, একদিন গ্রিন রোডের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কলোনির সেই পুরনো বাসাটা দেখে মনে পড়ল, একসময় এই বাসায় ছিলাম বারোটা বছর। জীবনের কত স্বপ্ন, আনন্দ, রক্তক্ষরণ বাসাটার মেঝেতে আজ মরে পড়ে আছে। বাসাটার নতুন বাসিন্দারা তাদের নতুন সাজানো ঘরগুলোয়, ড্রয়িংরুমে, বারান্দায় সেসবের কোনোকিছুর চিহ্নও দেখতে পায়নি।

হঠাৎ পাশেই একটা অনুরোধের স্বর শুনে ফিরে তাকালাম : 'আমাদের দোকানটায় একটু বসে যান-না স্যার।'

লোকটা গ্রিন রোড কলোনির সামনে রাস্তার ধারের একটা ওষুধের দোকানের কর্মচারী। আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্যে দোকান ফেলে প্রায় পঞ্চাশ গজ হেঁটে এসেছে। আমার খুব একটা পরিচয় ছিল এমন নয়; কিন্তু তার আমন্ত্রণের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে তার দোকানে না গিয়ে পারলাম না। মূঢ় মমতা নিয়ে লোকটা বলল : আপনি ছিলেন, জায়গাটা আলো হয়ে ছিল। এখন সবকিছুই কেমন অন্ধকার লাগে।

এমন মমতার সঙ্গে লোকটা কথাগুলো বলল যে আদৌ বানানো মনে হল না। লোকটার সঙ্গে এমন কোনো সম্পর্ক নেই। হয়ত আমার টেলিভিশন ভক্তদের একজন। সারাটা দিন দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ বেচা-বিক্রি করে বাড়িতে ফিরে টেলিভিশন দেখার মতো শরীর বা মনের অবস্থা থাকার কথাও নয় তার। আর এ-ধরনের একজন গরিব কর্মচারীর বাড়িতে টেলিভিশনই-বা থাকবে কী করে? হয়ত লোকটার নিজেরই বাসা নেই ঢাকায়। হয়ত কোনো অবস্থাপন্ন আত্মীয় বা অন্য কারো বাড়িতে থাকে, সেখানে টিভি দেখার সুযোগ পায়।

তাহলে কীভাবে এমন গভীর আবেগ উঠে এল লোকটার গলায়? এত মমতা কোথা থেকে আসে? এত আদর কোথায় থাকে মানুষের মধ্যে?

২২

বুঝে কি কেউ ভুল করে? যদি কেউ বলে সে বুঝে ভুল করছে, তবে কি বুঝতে হবে না তার বোঝাটাই ভুল?

২৩

দুটো ব্যাপারে আমার দুটো থিয়োরি আছে।

প্রথমটা হল : "ক্ষতিকর না হলে কোনোকিছু মজাদার হয় না।"

আপনার প্রিয় জিনিসগুলোর নাম মনে করুন না একবার? সিগারেট, চা, বোতল, কফি, মেয়েমানুষ, সুখাদ্য, ক্ষমতা, বিত্ত— এদের মধ্যে ক্ষতিকর নয় কোন্‌টা! কার কাছ থেকে উল্টো চড় খান নি এখনো? না-খেলে অপেক্ষা করুন। মহামান্য হালাকু আসছেন!

দ্বিতীয় থিয়োরি : 'প্রিয় স্বামীরা তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়।'

সব পতিপ্রাণা স্ত্রী-ই চান, তাঁর প্রিয় স্বামীটি নিদেনপক্ষে আরো অন্তত একশো বছর বাঁচুক, কিন্তু 'বৃদ্ধ আকারে'। স্বামীদের যৌবন নিয়েই কেবল তাদের সমস্যা।

বেচারা স্বামী দেবতাগুলো তখন বৃদ্ধ না হয়ে করেটা কী?

২৪

সাতান্ন থেকে একষট্টির দিনগুলো মনে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ গাছপালার ছায়ায় কাটছে আমার জীবনের সুন্দরতম দিনগুলো। মনে আছে, শীতের তীক্ষ্ণ হাওয়ায় কার্জন হলের সামনের বিদেশি গাছগুলোর চিরল চিরল পাতাগুলো কেমনভাবে এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে থাকত আর আমার বুকের ভেতরটা বিষণ্ন বেদনায় কনকন করে উঠত।

এম. এ. পরীক্ষার পর মুন্সীগঞ্জ কলেজে চার মাসের মেয়াদে একটা খণ্ডকালীন চাকরি জুটল। কাজেই হন্যে হয়ে তড়িঘড়ি একটা সার্বক্ষণিক চাকরি খুঁজে বেড়াবার দায় পড়ল। হঠাৎ আতাউল (তখন অধ্যাপক) জানাল সিলেট মহিলা কলেজে একটা প্রভাষকের পদ খালি হয়েছে। ওর বোন চাকরি ছেড়ে চলে এসেছেন সেখান থেকে। চেষ্টা করে দেখতে পারি।

পলকে চোখের ওপর এক হাজার রঙিন বেলুনের ওড়াউড়ি। কমলার মতো মেয়েদের দেশ সিলেট। তার ওপর মহিলা কলেজের রক্তিম সম্ভাবনা। রাতের

ট্রেনে সিলেট পৌঁছে পরদিনই দেখা করলাম অধ্যক্ষার সঙ্গে। চাকরির জন্যে সব যোগ্যতাতেই টিকে গেলাম, কিন্তু গোল বাধাল ভিন্ন একটা ব্যাপার। কিছুদিন আগে ওই কলেজেরই এক তরুণ অধ্যাপক সহৃদয়-গোছের কোনো প্রস্তাব করেছিলেন ওই কলেজেরই একটি মেয়ের কাছে। সে-সময়কার রক্ষণশীল সিলেট ব্যাপারটাকে খুবই নির্দয়ভাবে নিয়েছিল। তাঁকে বিদায় করা হয়েছিল কলেজ থেকে। ঘটনাটার তুচ্ছ অজুহাতে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল : আপাতত কোনো পুরুষ-শিক্ষককে আর কলেজে নেওয়া হবে না।

তবু অদ্ভুতভাবেই চাকরিটা হয়ে গেল। কলেজের অধ্যক্ষার ঘরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ইন্টারভিউ চলল। কলেজের বেশ কজন বর্ষীয়সী অধ্যাপিকা যতদিক থেকে সম্ভব আমাকে যাচিয়ে, খুঁটিয়ে, বাজিয়ে কনে দেখার মতো করে দেখলেন। তারপর আমাকে স্টাফরুমে পাঠিয়ে শুরু হল তাঁদের গোপন, উত্তেজিত, রুদ্ধদ্বার মন্ত্রণা। প্রচণ্ড সে বাদানুবাদ, দূরের স্টাফরুমে বসেও আমি তা টের পাচ্ছিলাম। আধঘণ্টা পরে অধ্যক্ষার অফিসে আবার ডাক পড়ল। হ্যাঁ, চাকরি হয়েছে।

কিন্তু কেন হল চাকরিটা? এমন অসম্ভব কী করে সম্ভব হল? কিছুদিন পরে ওই বর্ষীয়সী অধ্যাপিকাদের একজনের কাছে আসল কারণটা শুনেছিলাম। নেহাতই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। আমার সরল নিরপরাধ চোখ দুটো তাঁদের সবারই মনে ধরেছিল। এমন সহজ সরল চোখ থেকে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা খুঁজে পাননি তাঁরা। কাজেই কিছুদিন পরীক্ষামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে আপত্তি কী। অধ্যাপিকা, অধ্যক্ষা সবাই বর্ষীয়সী, সবাই আমার শ্রদ্ধেয়। আমার চোখের প্রেমে পড়ে তাঁরা এমন সিদ্ধান্ত নেবেন, এটা অমূলক। তবু একটা প্রশ্ন মনে জাগে : তাঁদের মতো অধ্যাপিকাদের বর্ষীয়সী চোখে যে চোখদুটোকে এতটা সরল আর স্বপ্ন-ভরা লেগেছিল সেই চোখদুটোকে তাঁরা তাঁদের নিরপরাধ মেয়েগুলোর জন্যে নির্ভেজাল ভেবেছিলেন কোন্ বিবেচনায়! বিপত্তিই কি পৃথিবীতে সবসময় বিপজ্জনক?

কলেজের পাশেই একটা পুরনো ভাঙা অভিজাত দালানবাড়িতে থাকার জায়গা পেলাম। দালানটা কলেজেরই, অবিবাহিত অধ্যাপকদের থাকার একটা নামমাত্র সাময়িক ব্যবস্থা। বাড়ির অর্ধেকটা জরাজীর্ণ হয়ে ধসে পড়েছে। সেদিকটার দেয়ালে, ছাদে, ইটের ভাঙা পাঁজরে শ্যাওলা আর আগাছার রাজত্ব। বাকি অর্ধেকটা অবশ্যি অতীতের বনেদি চেহারা নিয়ে আগের বৈভবেই বর্তমান। বাড়িটাতে ঢুকে বুঝলাম বাড়ির বাসিন্দা মাত্র একজন। ভদ্রলোক ইংরেজির অধ্যাপক, নামটা ঠিক মনে নেই, আমাদের কথাবার্তার শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁচিশ কি পঁয়ষট্টি বোঝা মুশকিল। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে অবাক হতে হল। বেরিয়ে এসেই আমাকে সস্নেহে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন। নিজের হাতে জিনিসপত্র গোছগাছ করে আমার দায়-দায়িত্ব প্রায় জোর করেই তুলে নিলেন।

সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে বসে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ টের পেলাম। দেখলাম, পৃথিবী-জোড়া এক ভয়ের রাজ্যে যেন আমুণ্ডু ডুবে আছেন তিনি। তাঁকে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত মনে হল তাঁর আটত্রিশ বছরের 'নবীন যৌবন'টাকে নিয়ে। টেবিলে বসেই সভয়ে কলেজ-বিল্ডিংটার দিকে আঙুল উঁচিয়ে আমাকে আরেকবার ভালো করে কলেজটাকে দেখিয়ে নিলেন, তারপর স্বগতোক্তির মতন বলে চললেন, 'ভেতরে সত্তর, বাইরে বাইশ।' ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। ভেতরে সত্তর বাইরে বাইশ— কী মানে এসব রহস্যময় কথাবার্তার!

শান্তভাবে অভয় দিয়ে পুরো তাৎপর্যটা নিজেই ব্যাখ্যা করলেন তিনি : 'ওই যে সামনে দেখছ কলেজ, ওর মধ্যে ঢুকলেই তোমার বয়স হয়ে যাবে সত্তর। তোমার গালভর্তি গজিয়ে যাবে লম্বা সাদা দাড়ি। চোখ বসে যাবে গর্তে, দাঁত হবে নড়বড়ে, আর ওই-যে মিষ্টি মেয়েগুলো— ওরা হয়ে যাবে তোমার সাক্ষাৎ সব নাতনির দল, কামনা-বাসনার দশ মাইলের মধ্যে কোথাও কোনোকিছু থাকবে না। কিন্তু দাদা যেই-না কলেজ থেকে বেরোলে অমনি তোমার বয়স আবার বাইশ, পুরো বাইশ বছরের তরতাজা ছোকরা তখন তুমি হে, মেয়েদের নিয়ে যা খুশি ভাবো, স্বপ্ন দেখো, কবিতা লেখো, কিংবা অন্য যা-খুশি।'— বলে সারা মুখে একরাশ অশ্লীল হাসি ছড়িয়ে বললেন : 'বুঝলে, এইভাবে বাইশ-সত্তর বাইশ-সত্তর করে কলেজে আসো-যাও, কোনো ভয় নেই। আমার দিকেই তাকিয়ে দ্যাখো না! দশ-দশটা বছর চাকরি করছি, কেউ একটা কথা বলতে পেরেছে কোনোদিন! আসলে জানো, তোমার মায়া-মায়া চেহারাটা দেখে কেমন একটু ভয় করছে।'

ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধরন-ধারণের আদ্যোপান্ত শুনে টের পেলাম প্রথম দেখেই কেন তাঁকে যাদুঘরের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন মনে হয়েছিল। দশ বছর ধরে একটানা আটত্রিশ-বাহাত্তর আটত্রিশ-বাহাত্তর করে এই আসা-যাওয়া আর যাওয়া-আসার ভেতর একসময় তাঁর আটত্রিশ বছরের লেজটা শরীর থেকে কখন যে নিঃশব্দে খসে গেছে বেচারা টেরই পাননি। এখন ঘর আর কলেজ সব জায়গাতে তাঁর শুধু একটাই চেহারা— বাহাত্তর।

আড়াই মাস চাকরি করেছিলাম কলেজটায়। এর মধ্যেও এক মাস আবার বন্ধ। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজ-কর্তৃপক্ষ মর্মান্তিকভাবে টের পেতে শুরু করলেন, কলেজের অধ্যক্ষা আর বর্ষীয়সী অধ্যাপিকারা তাদের সারাজীবনের দূরদৃষ্টি ব্যবহার করে ছাত্রীদের জন্যে একটা জলজ্যান্ত উপদ্রব আমদানি করে বসেছেন।

এমনি সময় হঠাৎ খবর এল সরকারি কলেজে আমার চাকরি হয়েছে। নতুন চাকরিতে যোগ দেবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। খুব যে আনন্দের সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম বলব না। বুকের ভেতর কোথায় যেন স্বর্গ থেকে বিদায়ের একটা করুণ সুর বাজছিল। পরের দিন অধ্যক্ষার সঙ্গে দেখা করে নতুন চাকরির প্রসঙ্গ

তুললাম। আশা ছিল আমার যাবার কথা শুনে তিনি দুঃখিত হবেন। কিন্তু দেখা গেল তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। 'বাঁচালেন শেষ পর্যন্ত', বলেই ফেললেন সরাসরি। কষ্ট লাগল। জিগ্যেস করলাম, 'কীভাবে?'

'আপনি না গেলে আমাদেরই আপনাকে যেতে বলতে হত!'

কিছুটা আহত হলাম। বললাম, 'আমার অপরাধ?'

'মানুষ সবসময় অপরাধের জন্যে শাস্তি পায় না।' মিষ্টি হেসে জানালেন অধ্যক্ষা।

হে আমার নিরপরাধ চোখেরা, তোমরা কোথায় এখন! তোমাদের সরলতার অপরাধে কেউ করুণা করেও এখন আর আমাকে চাকরি থেকে অপসারণের সম্মানটুকু দেখবে না!

সবশেষে একটা ছোট্ট খবর। আমাকে কেউ চাকরি ছাড়ার কথা বলুন আর না-ই বলুন— সেই আটত্রিশ-বাহাত্তর সাহেব কিন্তু ঠিকই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এর কয়েকদিনের মধ্যেই। তবে একা নয়, কলেজের সবচেয়ে ডাঁসা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে।

২৫

ছেলেবেলার রূপকথার বইয়ে পড়া একটা ঘুমের দেশের গল্প এখনো মনে পড়ে। সেখানে হাতিশালে হাতি ঘুমোয়, ঘোড়াশালে ঘোড়া। সিংহাসনে রাজা ঘুমোন, দরজায় শান্ত্রি। পাত্র-মিত্র অমাত্য সভাসদ সব ঘুমোয়।

এই ঘুম বা মৃত্যু থেকে দেশটাকে বাঁচাবার পথ কিন্তু সোজা। সামান্য একটা কাজ : রাজকন্যার শিয়রের সোনার কাঠি আর পায়ের রুপোর কাঠির সামান্য একটু জায়গা-বদল। ব্যস, দুদ্দাড় শব্দে জেগে উঠবে সারা দেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় : উদ্ধারের এই সামান্য মন্ত্রটুকু মৃত্যুগ্রস্ত দেশটার কারো জানা নেই। আর সেজন্যেই দূর অপরিচিত দেশের এক অচেনা রাজপুত্রকে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, কড়ির পাহাড় শঙ্খের পাহাড় পিছে রেখে, যন্ত্রণার রক্তময় অভিযাত্রায় একদিন সেই দেশে এসে উপস্থিত হতে হয়— মৃত্যুর ঊষরতা থেকে দেশটাকে বাঁচানোর জন্যে।

দুঃসাধ্য পথের এই দুর্জয় অভিযাত্রীটিকেই কি 'প্রতিভা' ডাকা হয়?

২৬

স্রষ্টাও নিশ্চয়ই পাপকে স্বীকৃতি দেন। না হলে শয়তান সৃষ্টি করলেন কেন?

২৭

আমাদের দেশটায় সৃষ্টিছাড়া সবকিছুই। স্মরণীয় মানুষদের জন্ম বা মৃত্যুদিন এলেই স্কুল-কলেজ সব ছুটি। অথচ এর ঠিক উল্টোটাই তো বেশি করে হওয়া উচিত। উচিত তো ওসব দিনেই স্কুল-কলেজ আরো বেশি করে খোলা রাখা। এ্যাসেমব্লিতে ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে বুঝিয়ে বলা : 'তাকাও এইসব মানুষদের দিকে। কাজ থেকে কোনোদিন ছুটি নেননি বলেই এঁরা এত বড় আর স্মরণীয় হয়েছিলেন। তোমরাও বেশি ছুটি নিও না, তাঁদের মতো অগ্রাহ্য করো বিশ্রাম, তোমরাও তাঁদের মতো বড় হবে।'

২৮

কোনো সমস্যা সমাধানে যদি তোমার আগ্রহ না থাকে, তবে বুঝতে হবে তুমি নিজেই সেই সমস্যা।

২৯

লিখতে শুরু করেছি ছিটেফোঁটা। অন্তত কয়েকটা বছর বেঁচে থাকা ভীষণ প্রয়োজন। মস্তিষ্কের খাঁজে খাঁজে লেলিহান আগুনের মতো অজস্র শব্দের গনগনানি। অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার পৃষ্ঠা না লিখলে কিছুই জানানো হবে না।

বছর-পনেরো আগেও আমার হাতে রবি রেখা (সানলাইন?) ছিল না। যখন সাহিত্য-আন্দোলনের দিনগুলোয় মেতে ছিলাম— 'কণ্ঠস্বর' বেশ সাড়া তুলেছে, তখনো না। টেলিভিশনে যাবার পর অবাক হয়ে দেখি অনামিকার ঠিক নিচে তালুর মাঝ-বরাবর একটা ধারালো সরু রেখা, অস্ফুটে, ফুটে উঠতে শুরু করেছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দিনগুলোতে রেখাটা আগের চেয়ে অনেক গভীর হয়ে দাঁড়াল। কিছুদিন থেকে আবার লক্ষ করছি, রেখাটার ওপরের দিকটা সরু আর অস্পষ্ট হয়ে আবার আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে।

তবে কি ওই কয়েকটা বছরের আগেই সব শেষ?

কিছুই তো বিশ্বাস করি না। ঈশ্বরের পুত্রকে না, ঈশ্বরকে না, ভাগ্যকে না, ভাগ্যের রেখাকে না— তবু কেন ফিরে ফিরে শুধু এসব অশুভ কথা মনে আসে?

৩০

আমি স্বাস্থ্যবান অসুস্থ। আমার শরীরের কাঠামো বলিষ্ঠ দোহারা, কিন্তু শরীরের অন্ধকার খাঁজের ভেতর আজন্ম লালন করছি মূর্তিমান রুগ্‌ণতার এক ধারাবাহিক কষ্ট।

আর্ত জন্তুর মতো একটা জীবনে বেঁচে থাকতে হল। ছেলেবেলায় প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগত। সেই ঠাণ্ডা বেড়ে বেড়ে বছর-পঁচিশেক আগে, আততায়ীর মতো, জীবনের ভিতে স্থায়ীভাবে বসে গেল। সারাক্ষণ মাথাটা ভারী, ব্যথা আর ক্লান্ত হয়ে থাকে, যেন একটা দুঃখের পাথর। আর তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সারা গায়ে একই পরিমাণ ক্লান্তি আর কষ্ট। একদিন দুদিন নয়...পঁচিশটা বছর...।

পঁচিশটা বছর ধরে এই নিগ্রহ— আমার শরীর এখন ক্লিষ্ট।

আর কত দুঃখের যৌতুক চাও, হে আমার অমেয় জীবন!

ডাক্তাররা বলেন (আমিও জানি) এই অসুখের কারণ বাংলাদেশের আবহাওয়া, এখানকার গুমট ভ্যাপসা জলবায়ু। বাতাস আর্দ্র হয়ে উঠলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। শরীরটাকে মনে হয় আহত জন্তুর মতো ভারী আর জরাগ্রস্ত।

এ রোগের আরোগ্য নেই। সব চিকিৎসাই মোটামুটি শেষ।

কষ্টে অনেকবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। এখন ক্লান্ত।

জীবনের বাকি দিনগুলোয় এই কষ্টই আমার নিয়তি।

আমার হৃদয় দেশপ্রেমিক, শরীর দেশদ্রোহী। একালের প্রায় সব বাঙালির মতোই আমার অবস্থা। আমার বাঁচার একমাত্র পথ বাংলাদেশ ত্যাগ।

হে প্রিয় মাতৃভূমি, আমার কর্তব্য বলে দাও।

৩১

ত্বকে ভাঁজ পড়া আর অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জীবনে একসঙ্গে শুরু হয়।

৩২

কোনো দেশ যখন নতুন টাকা ছাপে তখন ওই টাকার বিপরীতে বিশেষ পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত রাখতে হয়। নইলে ওই টাকা কাগজ হয়ে যায়। প্রতিটা কথার বিপরীতেও তেমনি থাকতে হয় সমপরিমাণ কাজের পৃথিবী। নইলে ওই 'কথা' কেবলই 'আওয়াজ'।

৩৩

যে পারে সে শেষ করে, যে পারে না সে নালিশ করে।

৩৪

সকলে একজোট হয়ে হাত লাগানোয় উত্তরার বাড়িটা অলৌকিকভাবে শেষ হল। নিজের একটা কড়িও প্রায় ব্যয় করিনি, প্রতিটা ইটই বন্ধকের।

কোনোদিনই বাড়িটাতে থাকা হবে না। বড়জোর সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে করতে বলা যাবে : বাড়িটা আমার।

বাড়িটার একটা ছোট্ট নাম মনে মনে রেখেছি : 'সুরঞ্জনা'। কেন্দ্রের গেটের পাশের ছোট্ট সুন্দর ঘরটার নামও তাই। ভেবেছিলাম একটা ছোট্ট শাদা পাথরের ওপর নামটা লিখে নিচে রাবীন্দ্রিক কায়দায় চার লাইনের একটা পদ্য লিখে রাখব :

"আমাদের ছোট মেয়েটির নাম রঞ্জনা,
বড় মেয়েটির স্নিগ্ধ নাম নীলাঞ্জনা,
আমাদের নাম কে-ই-বা এখন শুনতে চায়,
আমাদের বাড়ি ছোট্ট, নাম 'সুরঞ্জনা'।"

পাথরের ওপর পদ্যটা আজো লেখা হয়নি, হয়ত হবেও না। আপাতত এই শাদা কাগজেই লেখা থাক।

৩৫

প্রগতিশীলেরা আমাকে রটায় প্রতিক্রিয়ার স্যাঙাৎ বলে, প্রতিক্রিয়াশীলেরা বলে প্রগতিবাদীদের দোসর। ধর্মান্ধেরা চিৎকার করছে 'নাস্তিক' বলে। কেউ যদি রাস্তায় খুন করে ফেলে রেখে যায়, কেউ বুঝবে না কারা খুন করেছে।

৩৬

রোজ রোজ চর্ব্যচোষ্য মেলে না।

প্রতিদিন যা দিয়ে আমাদের জীবন বাঁচে, তার নাম ভাত।

প্রতিদিন যাকে নিয়ে আমাদের ঘর সাজাতে হয়, তার নাম বউ।

৩৭

সকালে লুনা বলল : 'আব্বু, বিকেলে আমাকে একটু আসমাদের বাড়িতে দিয়ে আসবে?'

শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। বললাম, 'এতদূর যেতে হবে!'

লুনা (চোখ নাচিয়ে) : 'বাবার দায়িত্ব একটু করো-টরো! একেবারে ফাঁকি দিয়েই জীবনটা পার করে দিলে যে!'

৩৮

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আর উৎপলা সেন (স্বামী-স্ত্রী) কিছুদিন আগে ঢাকা ঘুরে গেলেন। একসময় কী মিষ্টি কণ্ঠই না ছিল দুজনারই। সতীনাথের গানে ছিল

বিষাদাচ্ছন্ন মাধুর্যেভরা নিঃসঙ্গতা। আমাদের যৌবনের দিনগুলোয় প্রতিটা বাঙালির হৃদয় সেই গানে সুস্মিত হয়েছে! অনবদ্য সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারিণী উৎপলার 'ঝিকমিক জোনাকির দীপ জ্বলে শিয়রে' গানটার মতো অনেক স্নিগ্ধ গানের মাধুর্য এখনো কানে লেগে আছে।

সেদিন টেলিভিশনে তাঁদের দেখলাম। ঔৎসুক্য নিয়ে গান শুনতে বসেছিলাম— আমার যৌবনের কিংবদন্তির নায়ক-নায়িকার সামনে একটা নতজানু স্মৃতির মতো। গান শুরু হতেই টের পেলাম আমাদের সেই লোকশ্রুত রাজপুত্র-রাজকন্যা এখন বিমূঢ় বার্ধক্যের শিকার। উৎপলা এখন ৬৫, সতীনাথ ৭০ বা তারও বেশি। উৎপলার কণ্ঠ এখনো পুরো শেষ হয়ে যায়নি, কিন্তু সতীনাথ একেবারেই জরাগ্রস্ত— যেন ভালো করে চারপাশের সবকিছু বুঝতেও পারছেন না। কিছুতেই গানের লয় ঠিক রাখতে পারলেন না সতীনাথ, তবলচিকে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় তাঁর ব্যর্থতাকে অনুসরণ করতে হল। বয়সের ভারে সবকিছুই যেন জড়িয়ে গেছে। দুজনার গানেরই সেই সূক্ষ্ম মিষ্টি অসাধারণ কারুকাজগুলোই শুধু হারিয়ে গেছে— যে অনিন্দ্য জিনিসগুলো ছিল তাঁদের সংগীতের অনির্বচনীয় মাধুরী। হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে অক্ষম গলায় সতীনাথ বৃথাই তাঁর এককালের গানের সেই সোনালি কাজগুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন— শিল্পের অনির্বচনীয়তার সামনে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত আর হাস্যকর।

পৃথিবীতে 'আবার' বলে কিছু নেই।

৩৯

কোনো যুগই নায়ক-বিহীন নয়। সবচেয়ে অনটনকবলিত কালও সে যুগের ভাঁড়দের ভেতর থেকে তার যুগনায়কদের তৈরি করে নেয়।

৪০

কিছুদিন আগে একজন তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক আমাকে জানালেন, জনাব আ. শ. নাকি তাঁকে বলেছেন আমি সি.আই.এ-র (আমেরিকান) এজেন্ট। এসব কথাবার্তা রাস্তার লোকদের কাছ থেকে শুনতে ও উপেক্ষা করতেই আমি অভ্যস্ত। কিন্তু জনাব আ.শ. দেশের অতিপ্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার পুরোধা এবং দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের একজন প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাই কথাটা শুনে হতচকিত হয়ে পড়লাম।

এর কয়েকদিন পর এমন আরেকজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হল, যাঁকে ওই একই কথা তিনি বলেছেন।

সপ্তাহখানেক আগে একজন নাট্যকারের কাছ থেকে পেলাম আরো খানিকটা বাড়তি খবর। তাঁকে জনাব আ.শ. জানিয়েছেন এ-ব্যাপারে তাঁর হাতে নাকি সুনির্দিষ্ট দলিল আছে। জনাব আ.শ. আমার তরুণ বয়সের শিক্ষক। তাঁর মতাদর্শকে গ্রহণ করতে না পারলেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি আমি চিরদিনই শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধা তিনি যোগ্যতা দিয়েই পেয়েছেন। তাঁর মধ্যে আবেগময় অপরিণতি এবং চিন্তার অতিসরলতা থাকলেও এমন একজন প্রবল এবং বলিষ্ঠ মানুষ আছে যিনি তরুণচিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারেন। ক্রমে তাঁর উজ্জ্বল চিন্তাভাবনা আমার বিশ্বাসের জগৎকে বিপুলভাবে ওলটপালট করে দিতে শুরু করে। কোনো কথা বলার সময় তিনি তা এমন জোরের সঙ্গে বলতেন যে তাঁর বক্তব্য, সাময়িকভাবে হলেও, সত্যি এবং অভ্রান্ত মনে হত।

তখন আমার জীবনের প্রথম আত্ম-অন্বেষণের সময়। অল্পদিনের মধ্যেই আমি টের পেলাম তাঁর আর আমার পথ আলাদা। আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করতে লাগলাম যে, খুবই অপর্যাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের চরিত্রহননে মাতেন এবং বিভিন্ন সময়ে অনেকের প্রশংসা করেন অবোধগম্য কারণে। আমার মনে হত, মানুষের বিশ্বাস-ভালোবাসার ব্যাপারে অবিশ্বাসী একজন নেতিবাচক মানুষ তিনি— যিনি জীবনের কোনো পর্বে তাঁর ওপরে অনুষ্ঠিত কোনো অযৌক্তিক ও অসন্তোষজনক অবিচারের নির্মম প্রতিশোধ খুঁজছেন।

আগেই বলেছি, তিনি তাঁর কথাগুলোকে এমন শক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করতেন যে, সেই বয়সের বুদ্ধি বা যুক্তিক্ষমতার সামান্য পুঁজি দিয়ে তা খণ্ডন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত, অথচ হৃদয়ের অন্তস্তলে আমি তা মেনে নিতেও পারতাম না। আমার হৃদয় তাঁর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করল এবং আমি তাঁর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এভাবে কয়েক বছর পার হলে আমি একদিন তাঁর ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা আটকিয়ে, অসহায়ের মতো চিৎকার করে তাঁকে অনুরোধ করলাম— আমাদের মতো সরল বিশ্বাসপ্রবণ তরুণদের সামনে জীবন সম্বন্ধে এইসব মোহহীন নিষ্ঠুর নেতিবাচক কথা না বলতে; আমাদের বিশ্বাসের শক্তি নষ্ট না করে দিতে। আমি চিরকাল বিশ্বাস করি, মানুষের চিন্তার ইতিহাস আসলে তাদের মতপার্থক্যেরই ইতিহাস। কিন্তু এদেশে প্রায় কেউই কোনোকিছুকে মতবাদ হিসেবে নিতে চায় না। সবকিছুকেই নিয়ে বসে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তিনিও তাই করলেন। তাঁর সঙ্গে আমার দৃষ্টির ভিন্নতাকে তিনি আমার ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে ধরে নিলেন। প্রথমদিকে আমার সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিলেন। তারপর মেহনতি মানুষের কল্যাণের পক্ষ থেকে আমার প্রতিটি কাজকে গণবিরোধী আখ্যা দিয়ে চললেন। সবশেষে সি.আই.এ. এজেন্টের অভিযোগ।

আজ জনাব আ.শ.-র বয়স সাতষট্টি বছর। এ বয়সের একজন দায়িত্বশীল পরিণত মানুষ তাঁরই পরিপার্শ্বের একজন মানুষ এবং এককালের ছাত্র সম্বন্ধে এমন একটা মারাত্মক অভিযোগ করছেন শুধু ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে— এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে? আমি জানি, আমি যদি তাঁকে প্রকাশ্যে এই বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে চ্যালেঞ্জ করি, তবে তিনি সবার সামনে একজন মিথ্যাভাষী হিসেবে প্রমাণিত হবেন। অথচ কথাটা একজন মানুষের নামে কত অনায়াসে বলে ফেলতে পারছেন! যা আমাকে সবচেয়ে দুঃখ দিচ্ছে তা হচ্ছে— তাঁর মতো এমন একজন শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ মানুষ এমন একটা অপপ্রচারে নামবার আগে একবার ভেবেও দেখছেন না যে, কথাগুলো রটাবার আগে পরীক্ষা-অনুসন্ধান করে এই বিষয়ে অন্তত কিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে নেওয়া উচিত!

আর কতকাল নিজেদের ছুরিতে আমরা এভাবে নিজেরা খুন হব!

৪১

এক ধরনের মেয়ে আছে যাদের সেজে থাকলে সুন্দর দেখায়, এক ধরনের মেয়ে আছে যাদের না সেজে।

৪২

যাকে ক্লেদাক্ত করতে পারায় অকথ্যতম সুখ, সেই কি আমাদের প্রিয়তম?

৪৩

দিনকয় আগে গোপালগঞ্জ থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন কেন্দ্রে। ভদ্রলোক যেমন রসিক তেমনি ধারালো আর আমুদে। কথায় গল্পে রসের ভিয়েন দিয়ে আসরটাকে একেবারে জমজমাট করে রাখলেন। ভদ্রলোক স্কুলশিক্ষক। নানা ধরনের গল্পের ফাঁকে একটা মজার গল্প শোনালেন তিনি।

ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন : "একজন বড় গোছের আমলা এসেছিলেন আমাদের স্কুলে। তা আমাদের সেই অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের দাপটে আমরা তো কেঁইপেই সারা। আজকালকার স্কুল-কলেজের মান যে কোথায় নেইমেছে এ নিয়ে বক্তৃতা করেই তিনি কাটায়ে দেলেন ঘণ্টাখানেক। এমনভাবে সবকিছু তুলোধোনা কত্তি লাগলেন যে, আমরা যে আমাদের ইশকুল আর নিজেদের নিয়ে কোথায় লুকোবো ভেবেই পাইনে। দুঃখ কত্তি কত্তি একসময় বললেন, কী যে হয়ে গেছে আজকালকার ইশকুল-কলেজের অবস্থা। আমাদের ছেলেবেলায়— সেই ব্রিটিশ আমলে— কী দেখিছি আর এখন কী! বলতি বলতি শেষে বড় একখানা

দীর্ঘশ্বাস ছেইড়ে বললেন, 'হায়রে, কোন্ পথ দিয়ে চলে গেলেন আমাদের ছেলেবেলার সেইসব আদর্শ শিক্ষকেরা, সেইসব মহান শিক্ষকেরা।'

আমি আর থাকতি পাল্লাম না, বললাম, আমি কিন্তু বইলে দিতি পারি স্যার, কোন্ পথ দিয়ে তাঁরা গেছেন।

'একটা স্কুলমাস্টার বলবে কোন্ পথ দিয়ে সেই মহান শিক্ষকেরা গেছেন! এ কি ভাবা যায়! ঘপ করে তিনি বললেন, 'পারবেন, বলতি পারবেন, কোন্‌পথ দিয়ে তাঁরা গেছেন।' 'আমি আর দেরি করলাম না। বইলে ওঠলাম, যে পথ দিয়ে চলে গেছেন সেকালের বাঘা বাঘা জজ হাকিমেরা, জাঁদরেল ম্যাজিস্ট্রেটরা, বড় বড় অফিসারেরা— তাঁরাও সেই পথ দিয়েই গেছেন।

শুনে স্যারের মুখখানা হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেল। হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন, 'আপনার হিসাবের খাতাটা আনেন তো। ভালো কইরে দেখতি হবে।' সবাই লুকায়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি কত্তি লাগল।"

এমনি করে একের-পর-এক গল্প করে ভদ্রলোক অনেক রাতে বিদায় নিলেন। মনে হল, কত অনায়াসে এই জাতির সার্বিক অবক্ষয়টাকে তুলে ধরলেন ভদ্রলোক। জজ হোক, হাকিম হোক, শিক্ষক অধ্যাপক হোক, খাদ্য বা আবগারি অফিসের লোক হোক— যেই হোক, বাঙালি তো! চলে গিয়ে থাকলে কি আর আলাদা পথ দিয়ে গেছেন!

এমনি অভিজ্ঞতা হয়েছিল আরেকবার— বছর পাঁচ-ছয় আগে। কেন্দ্রের ছেলেদের নিয়ে সাইকেল-ভ্রমণে বেরিয়েছি। দিন কয়েকের যাত্রা। তৃতীয় দিনে রাত প্রায় দশটার দিকে আমরা একটা প্রাইমারি ইশকুলের বারান্দায় রাতের আশ্রয় নিলাম। বাংলাদেশের অজ-পাড়াগাঁর একটা স্কুল। আমাদের ছেলেরা স্কুলের বারান্দায় বাক্স-প্যাটরা রেখে মাঠের পাশে চুলো জ্বালিয়ে রান্নার আয়োজনে লেগে গেল। চুলোর আগুনে কালো রাতটা লাল হয়ে উঠল। এদিকে আচমকা এই প্রত্যন্ত এলাকায় এতগুলো শহুরে লোকজন দেখে গাঁয়ের লোকেরা কৌতূহলী হয়ে ভিড় করেছে। তাদের নানান জেরা : কোথা থেকে আসছি, কেন সাইকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সাইকেলে ঘুরে কী হয়— এইসব।

গেঁয়ো মানুষের ভিড়ে একজন লোকের সপ্রতিভ কথাবার্তায় সচকিত হয়ে উঠলাম। লোকটার চেহারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট। পরনে ছেঁড়া শার্ট আর লুঙ্গি, চোখের নিচে কালি। দৃষ্টি উপবাস-আতুর। কিন্তু প্রতিটা কথায় যেন তলোয়ারের ঝিলিক। এমন ক্ষুরধার কথাবার্তা তার, অবাক না হয়ে পারা যায় না। তার কথার ধারালো সরস মন্তব্যে আর ব্যঙ্গবিদ্রূপে দমকে দমকে হেসে উঠতে লাগল আমাদের ছেলেরা। কথায় বোঝা যায়, লোকটার লেখাপড়া সামান্য— খুবজোর সপ্তম-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। আমাদের এভাবে ইচ্ছামতো খেলাতে পেরে লোকটাও যেন খানিকটা

অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। কথার ধার তার ক্রমেই বাড়ছে। এক পর্যায়ে সপ্রশংসভাবে বলেই ফেললাম, 'আপনার বুদ্ধি তো ভাই বেশ চমৎকার!' আমার কথা শেষ না হতেই উত্তর দিয়ে বসল সে :

"প্রেসিডেন্ট হইনি বলে বুদ্ধিও কি প্রেসিডেন্টের চেয়ে কম হবে নাকি?" কী প্রশ্ন আর কী উত্তর! আবার সবার দমফাটা হাসি।

হকচকিয়ে গেলাম। কী বলে লোকটা! কিছুতেই বুঝি না যে গাল-বসা, ছেঁড়া জামা-কাপড়-পরা এই তুচ্ছ লোকটার বুদ্ধির আলোচনায় দেশের প্রেসিডেন্টের প্রসঙ্গ আসে কী করে। একটু সুস্থির হতেই টের পেলাম, কত সহজে সে ছোট্ট একটা কথায় আমাদের জাতির দুটো বড় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে।

এক : এদেশের কোনো মানুষ— এমনকি তুচ্ছতম মানুষটা পর্যন্ত কোনোকালে নিজেকে কারো চেয়ে— হোক না সে প্রেসিডেন্ট— এক ইঞ্চি কম ভাবতে নারাজ!

দুই : কী আশ্চর্যভাবে সে টের পেয়ে গেছে আমাদের দেশের প্রেসিডেন্টরা অন্তত তার চেয়ে নির্বোধ।

৪৪

জীবনের শেষে এসে একটা কথা ভেবে কেবলই কষ্ট হচ্ছে : অনেক কিছু লেখার ছিল, প্রায় কিছু না-লিখেই সব শেষ হচ্ছে।

মনে হচ্ছে : আমি লেখক হবার জন্যেই জন্মেছিলাম, অন্য কাজ করে বিদায় নিচ্ছি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সবসময় মস্তিষ্কের ভেতরে লিখেই গেছি শুধু, কাজ আর দায়িত্বের চাপে সেগুলো কাগজের পাতায় লিখে যাবার সময় হল না।

আমি একসঙ্গে একের বেশি কাজ করতে পারি না। কোনো কাজ করার সময় তার সর্বগ্রাসী উত্তেজনা গোটা স্নায়ুমণ্ডলীকে এমন নেকড়ের মতো কামড়ে ধরে যে আমার চৈতন্য থেকে বাকি পৃথিবীটা পুরোপুরি মিথ্যা হয়ে যায়।

আমি একেশ্বরবাদী; আমি একসঙ্গে কেবল একজনের কাছেই নতজানু হতে জানি। বড় মানুষেরা একসঙ্গে অনেক পারেন, ক্ষমতা অপরিমেয় বলে। আমাদের শক্তি সীমিত, অল্পস্বল্প কাজেই পুঁজি ফুরিয়ে যায়।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কী উপায়? আমাদের— যারা 'চলনসই পদ্য লিখি'!

'বেরিয়েছিলাম হাজার বাগান দেখার বাসনা নিয়ে— একটা গোলাপের পাশেই জীবন শেষ হয়ে গেল।'

৪৫

তারকারা কয়েক বছর পরেই ঝরে যায়, কিন্তু শিল্পীরা চিরকাল তারকা থাকে।

৪৬

যে তোমাকে তার বিত্তের কথা বলে সে তোমার শরীরকে চায়, যে নিঃস্বতার কথা বলে সে হৃদয়কে।

৪৭

আসহাবউদ্দীন আহমদ আমাদের ঢাকা কলেজের প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর মতো শ্রেয়োবোধসম্পন্ন অবিচল সুন্দর মানুষ জীবনে অল্পই দেখেছি। মাঝখানে কয়েক মাস আমাদের কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। শারীরিক মানসিকভাবে সতেজ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আসহাব সাহেব সারা কলেজে তাকিয়ে দেখার মতন মানুষ ছিলেন। বছরখানেক আগে বেঁচে থাকার গভীরতম পূর্ণতার মুহূর্তে আমাকে বলেছিলেন : 'জানেন, আমার মনে হয়, আমি কোনোদিনই হয়ত মরব না।' আসহাব সাহেব জানতেন না, যখন তিনি কথাগুলো বলছিলেন তখন ক্যান্সার তাঁর কোষে কোষে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

আমাদের ভরা বসন্তের পরিপূর্ণ দিনগুলোই কি আমাদের বিদায় নেবার মুহূর্ত?

অসুখে অসুখে ক্লিষ্ট বিধ্বস্ত শরীরে আসহাব সাহেব হয়ত এই মুহূর্তে জীবনের দিকে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। গত পনেরো দিন ধরে প্রতিদিনই তাকে দেখতে যাব ভাবছি। তিনি কলেজের ভেতরেই থাকেন, আমাকেও রোজ কলেজে যেতে হয়। তবু নানা কাজের চাপে দেখতে যাওয়া হল না। আমি জানি 'কাজের চাপ' কথাটা আসলে না-দেখতে-চাওয়ার একটা সুপরিকল্পিত অজুহাত মাত্র। সমস্যাটা আসলে অবচেতন মনের কোনো রহস্যময় নির্দেশের ভেতর থেকে জেগে-ওঠা। যে-মানুষটিকে সেদিন পর্যন্ত চোখের সামনে এমন জীবন্ত আর দীপান্বিত দেখেছি, তাঁকে এই বিমর্ষ ক্লিষ্ট চেহারায় দেখতে চাওয়ার স্নায়বিক অক্ষমতাই হয়ত 'কাজের চাপ' কথাটার আড়ালে নিজেকে লুকোতে চেষ্টা করছে।

৪৮*

দিনকয় আগে সকালের দিকে একটা টেলিফোন এল। রিসিভার তুলতেই ওধার থেকে জেগে উঠল অনেকগুলো ছেলেমেয়ের বুকভাঙা কান্নার শব্দ— কোনো

* ছোট বোনের মৃত্যু

বাড়িতে মা-বাবা মারা গেলে আর কোনোদিন তিনি ফিরবেন না টের পেয়ে, ছেলেমেয়েরা যেভাবে একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে, সেভাবে। উৎকণ্ঠিত হয়ে বারে বারে জানতে চাইলাম কী ব্যাপার! যে ফোন করেছিল সে রহস্যজনকভাবে রিসিভারটা আগের জায়গায় রেখে দিল। আবার সব সুনসান। মুহূর্তের জন্যে যে মৃত্যুব্যথিত পৃথিবী চোখের সামনে জেগে উঠেছিল সেখান থেকে আবার নিজের ঘরের সুস্থির বাস্তবতায় ফিরে এলাম।

না, ভয় নেই। একমুহূর্তের মিথ্যা দুঃস্বপ্ন উৎরে সবকিছু আবার নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে গেছে। হয়ত ক্রস-কানেকশন। অন্য কারও বা অন্য কোনো বাড়ির ব্যাপার। অন্য কোনো টেলিফোনের লাইন এসে হয়ত চড়াও হয়েছিল আমাদের ওপর। রোশনাকেও গল্পটা বললাম।

আমার কথা শেষ হয়নি, আবার বেজে উঠল সেই অনিবার্য টেলিফোন। এবারে কিন্তু নিষ্কৃতিহীনভাবে শুনতে হল সেই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ : মিনিট দশেক আগে টাঙ্গাইলে আমার ছোট বোন মিকু মারা গেছে।

অনেক দুঃখ নিয়ে অল্পবয়সে জীবন থেকে বিদায় নিল ও। পৃথিবীর কোনোখান থেকেও কিছুই প্রায় পায়নি। কেউ কিছুই দেয়নি ওকে। জীবনও ওকে জন্মের পর থেকেই বঞ্চিত করে এসেছে। জন্মের বছরখানেক পর পোলিও হয়ে ওর একটা হাত আর একটা পা আধাপঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। তারপর সারাটা জীবন সেই নির্জীব কাঠি কাঠি হাত-পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে জীবন কাটাল। আড়াই বছর বয়েসে হারিয়েছে মা-কে। সারাজীবন আর্থিক অনটন আর প্রচণ্ড পরিশ্রম করে দম-আটকানো অশান্তি নিয়ে জীবন কাটাল। যে দুটো ছেলেমেয়েকে গাঢ় মমতায় আঁকড়ে শেষ অব্দি বাঁচার চেষ্টা করেছিল, সেখানেও ক্রমাগত ব্যর্থতার উপলব্ধি জীবনের ব্যাপারে আরও বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল ওকে। এর ওপর পিত্তের পাথরের ব্যথা, রক্তচাপ, আলসার আর হাঁপানিতে ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে এসেছিল ওর অদমিত জীবন-পিপাসা। সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমার অনুরোধে চিকিৎসার জন্যে আমার বাসায় আসার প্রস্তুতিও নিয়েছিল মৃত্যুর আগের দিন। ব্যাগে সবকিছু গুছিয়ে তৈরিও হয়েছিল সেদিন সকালে আসবে বলে। (কাপড়চোপড় গোছানো সেই রংচটা ব্যাগটা আমি টাঙ্গাইলে পৌঁছেই ওর বিছানার ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম)।

যতদূর জানতে পেরেছি, কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে উত্তপ্ত তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াঝাঁটির পরিণামে ওর রক্তচাপ খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল হাঁপানিজনিত নিশ্বাসের কষ্ট আর অক্সিজেনের স্বল্পতা। ফলে হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়ে যায়। বাতাসের অভাবে একসময় বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে ও। সামান্য একটু নিশ্বাসের জন্যে পাগলের মতো ঘরের ভেতর ছোটাছুটি করতে থাকে। নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে আসছে দেখে দিশাহারার মতো

ট্যাবলেটের পর ট্যাবলেট খেতে শুরু করে আর ক্রমাগত ইনহেলার দিয়ে শ্বাসনালিতে স্প্রে করতে থাকে। কিন্তু প্রাণপণে নিশ্বাস টেনেও সারা পৃথিবীতে এতটুকু বাতাস খুঁজে পায়নি মিকু। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নীল হয়ে বিছানার ওপর পড়ে ও শেষ হয়।

ওর মৃত্যুমুহূর্তে আমার এক ভাগনি ওর পাশে ছিল। মিকুর শরীরের খারাপ অবস্থা দেখে ভাগনিটা নিজেই ওর কাছে এসে থাকছিল কিছুদিন থেকে। মরার ঠিক আগের মুহূর্তে মিকু ওকে বলেছিল, 'তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।' মৃত্যুর সময় ওর ছেলেমেয়ে-স্বামী পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিল। আমার ভাগনি ছুটে গিয়ে ওর স্বামীকে বলেছিল, 'খালা মরে যাচ্ছে। একটু অক্সিজেনের ব্যবস্থা করুন!' কথাগুলো শুনেও সে গা করেনি। তবে সুখের বিষয়, কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই মিকু চলে গিয়েছিল।

আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে ও ছিল খুবই ব্যতিক্রমী। সুরেলা, আবেগময়, জীবনমুখর আর বন্য প্রাণশক্তির অধিকারী। একটা দুরতিক্রম্য শারীরিক অক্ষমতা সহ্য করেও সবার অবহেলা-উপহাসের ওপর দিয়ে ও এক-এক করে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক হয়ে দর্শনে এম.এ. পাশ করেছিল। বিয়েও করেছিল প্রেম করে। সম্পূর্ণ নিজস্ব শক্তি দিয়ে প্রচণ্ডভাবে জীবনকে কামড়ে ধরেছিল ও। নিয়তি চারপাশ থেকে অলঙ্ঘ্য হয়ে দেখা দিলে দুর্জয় হতাশা নিয়ে চলে এসেছিল লেখার জগতে— অনুবাদে। সম্পূর্ণ একা, সাহায্যহীন। ভালো ইংরেজি জানত না বলে অমানুষিক পরিশ্রমে অভিধান থেকে শব্দার্থ দেখে দেখে অনুবাদের মধ্যে একটানা ব্যস্ত হয়ে থাকত ঘরকন্নার পর দিনরাত্রির সমস্ত সময়। সময় ফুরিয়ে আসার ব্যাপারটা ও যেন ভেতরে ভেতরে টের পেয়ে গিয়েছিল, তাই হয়ত এমন অসুস্থের মতো কাজের মধ্যে জেগে থাকত। আয়ারল্যান্ডের রূপকথা, সমারসেট মমের গল্প, আজটেক সভ্যতার মহাকাব্য প্রপোলভু-এর অনুবাদ শেষ না করতেই আমাদের কাছে এই দুঃসংবাদ।

মিকুর জন্যে কিছুই করতে পারিনি, আজ সেই কথা মনে হলে আত্মগ্লানি জাগে। কতদিন মিকু সামান্য একটু সাহায্যের জন্যে ভিখিরির মতো কাতরে কাতরে ফিরে গেছে, ব্যস্ততার জন্যে কিছুই করতে পারিনি। নিতান্তই সামান্য একটু সাহায্য— হয়ত অনুবাদটা কেমন হচ্ছে দু'মিনিট দেখে দেওয়া, কোন্ গল্প অনুবাদ করবে সে-সম্বন্ধে এক-আধটু উপদেশ, লেখা ছাপার ব্যাপারে কাউকে এক-আধটু তদবির— এমনি নেহায়েতই ছোটখাটো দুয়েকটা টুকিটাকি। বারবার নিষ্ফল জেনেও আমার কাছে ছুটে আসত। পঙ্গু পা-টা ঘসটাতে ঘসটাতে সিঁড়ি বেয়ে আমাদের বাসার দরজায় এসে বেল টিপত— সিঁড়ি বেয়ে ওর হেঁটে আসার শব্দ শুনেই বুঝতে পারতাম ও আসছে।

আমার মা'র কবর টাঙ্গাইল শহরের পাশেই, করটিয়াতে। করটিয়া কলেজের নিজস্ব গোরস্তানে। মায়ের মৃত্যুর সময় আব্বা ছিলেন করটিয়া কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। মিকুর মৃত্যুর সময়ও ওর স্বামী ছিল ঠিক তাই। মিলটা আশ্চর্য। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল যাবার পথে করটিয়া কলেজে পৌঁছোবার সময় ডানদিকে চোখ ফেরালেই নির্জন মাঠের মধ্যে শান্ত ছোট্ট একটা গোরস্তানে আমার মায়ের লাল টুকটুকে কবরটা চোখে পড়ে। পঁয়তাল্লিশটা বছর ধরে মাঠের মাঝখানকার উঁচু সবুজ জায়গায় মা'র কবরটা রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে একটা নিঃসঙ্গ বড় রক্তগোলাপের মতো ফুটে আছে। কবরের গায়ে শ্বেতপাথরে সেকেলে ভঙ্গিতে লেখা আব্বার একটা বিমর্ষ কবিতা :

বেগম করিমউন্নিসা

নবজাত শিশু রাখি চরণকমলে
মহানিদ্রাবৃতা তুমি এ শূন্যপ্রান্তরে,
ভুলি পুত্র-কন্যা-স্বামী, সোনার সংসার
হে কল্যাণী, সেবাদাসী, দুর্গত জননী,
পুণ্যশীলা, হাস্যময়ী, তরঙ্গচঞ্চলা,
সুগন্ধকুসুম প্রাণ, চির-আত্মভোলা,
নারীকুল শিরোমণি, হে আনন্দ প্রিয়া,
জেন্নাতের দ্বার মুক্ত তব প্রতীক্ষায়!

আমার সবচেয়ে ছোট ভাইটি হবার সময় মা মারা গিয়েছিলেন। ভাইটিও মারা গিয়েছিল একই দিনে। দিনের পর সন্ধ্যা নেমে এলে যখন সমস্ত জায়গাটা অপার্থিব পবিত্রতায় নিমগ্ন আর বিষণ্ন হয়ে আসে, তখন কখনও-সখনও কলেজের দু-চারজন নির্জন ছাত্র হাঁটতে হাঁটতে এই কবরটার পাশে দাঁড়িয়ে প্রস্তরফলকের ওপর খোদাই-করা এই কবিতাটা পড়ে এর গাঢ় বেদনাটুকু অনুভব করে। আর তারপর এই কলেজের একদা খ্যাতিমান একজন অধ্যাপকের ব্যক্তিগত নিঃস্বতা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আবার নিজ নিজ ছাত্রাবাসে ফিরে যায়। হয়ত অনেকদিন পর্যন্ত তাদের মনে স্বামী-সন্তান ফেলে-যাওয়া এই মহিলার কথা কাজের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয়। অনেকের মুখেই শুনেছি কথাগুলো। এই এলাকায় এমনিভাবে ঘটে আসছে ব্যাপারটা অনেকদিন থেকেই। আজ এতদিন পরে এই কলেজের আর-একজন ইংরেজির অধ্যাপকের স্ত্রী, মিকু, মেহের নিগার, স্বামী-সন্তান ফেলে একই জায়গায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় শুয়ে রইল। শ্বেতপাথরের ওপর আব্বার লেখা কবিতাটার ঠিক বাঁ-

পাশেই লেখা আছে মা-র ছেলেমেয়েদের নাম, আমাদের সবার ছোট বলে মিকুর নাম সবার নিচে। সেই মিকুই আমাদের সবার আগে চলে গেল।

কয়েক মাস ধরেই মিকু নাকি আশপাশের সবার কাছে কেবলই বলত : মৃত্যুর পরে মা'র কবরের পাশেই যেন ওর কবর দেওয়া হয়। মনে আছে, মা'র মুখ থেকেও ছেলেবেলায় তাঁর মৃত্যুর আগে ফিরে ফিরে এমনি শুধু মৃত্যুর কথা শুনতাম। জানি না কোন্‌টা সত্যি : মানুষ নিজের মৃত্যুকে সহজাত অনুভবের ভেতর নিজের অজান্তেই এমনি টের পেয়ে যায়, নাকি আজীবন প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুকে এমনিভাবে অনুভব করে, যার কোনো এক মুহূর্তে তার মৃত্যু ঘটে। আমার ধারণা, সত্যি আসলে দ্বিতীয়টাই, অথচ আমরা প্রথমটার কথাই কেবল ফিরে ফিরে বলি— হয়ত জীবনের মধ্যে অলৌকিকের দ্যোতনা সৃষ্টি করে জীবনকে বড় করে দেখতে চাই বলেই।

প্রত্যাবর্তনকে অসম্ভব করে তুলে মৃত্যু সামান্যকে অপ্রাপণীয় করে দেয়। মারা যাবার পাঁচ-সাত দিন আগে মিকু হঠাৎ টাঙ্গাইল থেকে আমাকে ফোন করেছিল। হয়ত কারো কাছ থেকে আমার লিভারের অসুখ সম্বন্ধে কোনো খারাপ সংবাদ পেয়েছিল। ফোন তুলতেই বলল : কেমন আছেন?

বললাম : ভালো। তুই কেমন?

ওর গলার স্বরে কেমন একটা অর্থশূন্যতা। বলল : আমাদের মতো মানুষদের বেঁচে থাকা না-থাকায় কী এসে যায়। আপনারা কত কাজ করেন। পৃথিবীতে আপনাদের বেঁচে থাকা দরকার। আপনার অসুখের কথা শুনলে দুশ্চিন্তা হয়।

ওর কথা শুনে চুপ করে থাকলাম। কী করে বোঝাই, সামান্য বা শ্রেয়ের পার্থক্য আমাদের কাছে আছে, মৃত্যুর কাছে নেই।

ওদের বাসায় পৌঁছে পাড়া-পড়শিদের একটা ছোটখাটো ভিড় দেখলাম। ওর স্বামীর জনাকয় সহকর্মীরও দেখা মিলল। সবাই কমবেশি শোকবিহ্বল। দু'একজনের চোখের কোনায় পানি চিকচিক করছে। আমার ভাগনিটা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, আমাদের দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল।

ওদের বাসার মাঝখানকার ঘরের মেঝের ওপর মিকু নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে। কিছুদিন আগে টাঙ্গাইলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখা খুলতে এসে এই ঘরে আমরা অনেক হইহল্লা করেছি। আমি আসব জেনে আধাপঙ্গু ডান হাতটা দিয়ে সারাদিনের চেষ্টায় হরেকরকম খাবার রান্না করেছিল মিকু। আমাকে নিয়ে মিকুর ভেতর একটা গর্বের ভাব ছিল। ওদের বাসায় আসছি জানলে পাড়ার লোকদের ঘরে ঘরে সংবাদ পাঠিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসত। যে-ঘরে কয়েকদিন আগে আমরা সবাই মিলে হইচই করেছি, আর সবাইকে মিকু সাধ্যমতো খাবার পরিবেশন করেছে, সে-ঘরের মেঝেতে ঠিক সেই জায়গাতেই, মিকু এখন টানটান হয়ে শুয়ে আছে।

ওর ঘরটা নানারকম পুরুষ-মহিলায় ভরা। একজন উদ্যোগী স্থানীয় মহিলাকে দেখা গেল, শেষকৃত্যের নানান কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের সবাইকে কাঁদতে দেখে নির্বিকার উঁচুগলায় ধর্মীয় দর্শনের কথা বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন : আপনারা বুঝমান হইয়া কান্দেন ক্যান্। যার জিনিশ সে লইয়া গেছে। এখন কাঁদলে কী পাইবেন, ইত্যাদি। আমাদের কান্না যে ওকে ফিরে পাওয়ার আশায় নয়, আর কখনও পাব না বলে; তা সে কী করে বুঝবে?

নানান ধরনের লোক বাড়িতে এল-গেল। মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা নিয়ে কিছু লোককে সারাদিন কর্মব্যস্ত হয়ে থাকতে দেখলাম। গোর-খোদকদের খবর দেওয়া থেকে শুরু করে বাঁশ-চাটাই কেনা, ট্রাকভাড়া, গোসল, কাফন— ইত্যাকার তাবৎ বাস্তব কাজগুলোকে এঁরা এমন নির্বিকার দায়িত্ববোধের সঙ্গে করে যেতে লাগল যে তাঁদের দেখে মনেই হয় না মৃত্যুর মতো একটা এত বড় বেদনাদায়ক ব্যাপার এই বাড়িতে ঘটেছে। তাঁদের ভাবটা এমন যে, মৃত্যুর মতো একটা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এত হইচই করার কী আছে। বরং এসব জোলো ভাবালুতা রেখে জীবনকে ক্লেদমুক্ত এবং সতেজ রাখার দরকারি দায়িত্বেই সবার নিমগ্ন থাকা উচিত এবং তারা তাই করছে। এই লোকগুলো আমাদের থেকে একটু আলাদা জাতের। জীবনের প্রত্যেকটা মৃত্যু-বাসরে এমনি বেশকিছু নিরাবেগ জোগাড়ে এবং দায়িত্বশীল লোককে আমি দেখেছি।

পাড়া-প্রতিবেশীরা একে একে লাশ দেখা শেষ করেই যে-যার মতো নিজেদের মধ্যে নানান বিষয়ে অল্পস্বল্প কথা শুরু করলেন। মৃত্যু নিয়ে বেশিক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকার সময় নেই কারো। এটা জীবনের স্বভাব নয়। কেউ কেউ এগিয়ে এসে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা— এমনি নানান বিষয় নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আমি যে একজন মৃত্যুকাতর মানুষ— কথাটা যেন এঁরা বেমালুম ভুলেই গেছেন। না-ভুললেও মনে রাখতেও খুব-একটা যেন আগ্রহী নন কেউ। এক ফাঁকে এক ভদ্রলোক আমাকে কাছে পাওয়ার সুযোগটা হাতিয়েই নিলেন পুরোপুরি— মন্ত্রণালয়ের একজন উঁচুদরের আমলার কাছে তাঁর চাকরির বদলিসংক্রান্ত তদবিরের অনুরোধটা পেড়েই ফেললেন। না, মৃত্যুকে— তা সে যত বড় বা বেদনাদায়কই হোক— কেউ একখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে চায় না। জীবন এর চেয়ে অনেক বড়। তাই হয়ত সংসারের স্রোত, দরকারের স্রোত, অস্তিত্বের স্রোত মৃত্যুকে হটিয়ে জীবনকে জয়ী করে রাখে।

গোসল করানোর পর সকলকে দেখাবার জন্যে মিকুর মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নেওয়া হল। আশ্চর্য পবিত্র লাগছিল ওকে। মিকুর মুখে কষ্টের কোনো চিহ্ন নেই। শেষ অভিনয়টা ভালোই করে গেল মিকু। মনে হচ্ছিল জীবনভর অনেক কষ্ট আর যন্ত্রণার পর নিষ্পাপ শিশুর মতো ঘুমোচ্ছে। আমার বড়

মেয়ে লুনা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কী সুন্দর হয়ে গিয়েছে মিকু ফুপু।' আমিও তাই ভাবছিলাম, চুপ করে ওর কথা শুনলাম।

মিকুর স্বামী চিরদিনই নির্লিপ্ত স্বভাবের মানুষ, নিঃসঙ্গ, জাগতিক ব্যাপারে কেমন যেন একটু বহিরাগত। সারাটা দিন তাঁকে চিরাচরিতের মতোই নির্বিকার আর একাকী দেখাল। একেকবার ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এ-বাড়িতে যে একটা মৃত্যু ঘটেছে খবরটা তাঁর আদৌ জানা আছে কি না! নিরাসক্ত চোখে দূর থেকে উনি সবার কাজকর্ম দেখে যাচ্ছিলেন। একসময় একটা ক্যামেরা এনে মিকুর মৃত মুখের গোটাকয় ছবি তুললেন। তাঁকে দেখে একেক সময় মনে হচ্ছিল যেন এদেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অপরিচিত কোনো বিদেশি পর্যটক— আমাদের দেশে কারো মৃত্যু হলে কী কী আনুষ্ঠানিকতা হয়, নিস্পৃহ চোখে তার প্রামাণ্যচিত্র তুলে রাখছেন।

মিকুর ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। ওর শেষ ইচ্ছামতো মা'র কবরের সঙ্গেই ওর কবর হয়েছে। এখানে 'ভাগ্য ভালো' কথাটা হয়ত সেই পরিচিত হাসির গল্পটার কথাই মনে করিয়ে দেবে— সেই গল্পটার কথা— যাতে গালের ওপর সাপের কামড় খেয়ে একজন লোক মারা গেছে শুনে আরেকজন দুঃখিত পথচারী স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলেছিল : তবু 'ভাগ্য' যে চোখটা বেঁচে গেছে। যে মানুষ আজ সব সুখ-দুঃখের অতীত, তার কাছে পৃথিবীর কোথায় কোন্ প্রান্তে তাকে কীভাবে শুইয়ে রাখা হল, সম্মানে না অনাদরে, ভালোবেসে না উপেক্ষায়— এসবের কী অর্থ? ওসব তো আমাদের অনুভূতি, আমরা যারা বেঁচে আছি, তাদের!

একটা ভাড়া-করা ট্রাকে মিকুর মৃতদেহটাকে নিয়ে আমরা কবরস্থানের দিকে চললাম। গোরস্তানে যাবার আগে করটিয়া কলেজের মসজিদের সামনে ওর লাশ নামানো হল, দ্বিতীয়বার জানাজা পড়াবার জন্যে। মসজিদের ইমাম মাইকে আশপাশের ছাত্রাবাসগুলোর উদ্দেশে জানাজায় যোগ দেবার আহ্বান জানাতে লাগলেন। স্পষ্ট মনে আছে, পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আমার মায়ের জানাজাও হয়েছিল ঠিক এমনিভাবেই, এই জায়গাটা থেকে একটু দূরে, কলেজসংলগ্ন ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তার ডানদিকের মাঠে। অনেক মানুষ হয়েছিল তাঁর জানাজায়। মিকুর জানাজাতেও হয়ত আসবে অনেকে। কেবল এই অসম্পৃক্ত ভেদাভেদহীন মানুষগুলো বুঝতে পারবে না, এই কলেজের একজন ইংরেজির অধ্যাপকের এই অপরিচিত অখ্যাত স্ত্রীটি— যার জানাজার জন্যে এই মুহূর্তে সকলকে ডাকা হচ্ছে, আর যার মুখ কাফনের শাদা কাপড়ের নিচে চির-অপরিচিত হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই— সে এই মুহূর্তে আমাকে কীভাবে নিঃস্ব করে রেখেছে।

মসজিদের মাইকটা নষ্ট থাকায় ইমাম সাহেবের অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে গলার স্বর বা বক্তব্য কেউ খুব একটা বুঝতে পারছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া কলেজ বন্ধ। ফলে কলেজ বা হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অপ্রতুল। তবু মুখে মুখে খবর

ছড়িয়ে পড়ায় বেশকিছু ছাত্র-শিক্ষক এসে জড়ো হল জানাজায়। কখন কী অসুখে মৃত্যু হয়েছে জেনে প্রায় সবাই এই অকালমৃত্যুর জন্যে বিলাপ করতে লাগল। অনেকেই কখন কবে শেষবার মিকুকে দেখেছে সেই কথা তুলে মৃত্যুর সর্বজয়ী শক্তি নিয়ে কথা বলে চলল।

ওর কবরটা খোঁড়া হয়েছিল বেশ যত্ন করে। সকাল থেকে জনাকয় গোর-খোদক পরিপাটি করে কবরটা খুঁড়েছিল। এমনি একটা কবর যে তাদের প্রত্যেকেরও বিধিলিপি— ব্যাপারটাকে তারা এমনি নির্বিকারভাবে ভুলে আছে যে দেখলে অবাক লাগে। এত পরিচ্ছন্ন আর নিখুঁতভাবে কবরটাকে খোঁড়া হয়েছে যে মৃত্যুকেও একটা পবিত্র কিছু বলে মনে হয়। বড় ভাই হিশেবে মিকুকে কবরে নামাবার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ওপরেই বর্তাল। আমার সঙ্গে আরও দুজন সহযোগী ছিল। আমরা মিকুকে ধর্মীয় প্রথা অনুসরণ করে কবরে নামিয়ে দিলাম।

নিজের হাতে এতদিনের ছোট্ট বোনটাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে ফিরে এলাম আমি। মিকুর কবরের মধ্যে শান্তি, পবিত্রতা আর নিঃসীম অন্ধকার। কেবলই মনে হচ্ছিল, আমিও যদি ওই কবরের ভেতর ওর সঙ্গে শুয়ে থাকতে পারতাম— ঠিক ওইভাবে— কোনোদিন উঠতে হবে না জেনে।

মিকুর বর কবরের মধ্যে একমুঠো মাটি ফেলতেই উপস্থিত লোকজন নির্দয়ভাবে মাটি ফেলে ওর কবর ভরে তুলতে লাগল। দেখতে দেখতে মিকু চিরদিনের জন্যে সামনে থেকে মুছে গেল। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কাফনের কাপড় সরিয়ে হলেও ওর মুখ দেখার সুযোগ ছিল, এখন তা-ও শেষ। আর কোনোদিন কোনোভাবেই ওকে দেখা যাবে না। গোর-খোদকেরা কবরের ওপর উঁচু আর পরিপাটি করে মাটি বিছিয়ে দিলে আমরা কবরের ওপর খেজুরের ডাল পুঁতে টাঙ্গাইলে ফিরে এলাম।

ফেরার পথে লুনা বিলাপের মতো বারবার বলতে লাগল, 'একটা দিনের মধ্যে ফুফু চলে গেল!' আমার সঙ্গে গোরস্তানে গিয়েছিল ও। দুদিন ধরে কাঁদতে কাঁদতে বারে বারে কেবল বলেছে, 'মিকু ফুফুকে তোমরা কোথায় রেখে এলে আব্বু! কী নির্জন কবর! ঠাণ্ডা— অন্ধকার!' সবার চোখের পানি থেমে গেছে, ওর চোখের পানি এখনও থামেনি। লুনার মধ্যে শিল্পীর হৃদয় আছে, ও গান গায়। সবাই জীবনকে ভুলে যায়, শিল্পীরা ভোলে না।

জানি না মিকুর বর আবার বিয়ে করবে কি না! হয়ত খুব বেশিদিন পার হবে না— পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজনেরা ওঁর কাছে ওঁর ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার কথা তুলে ওঁর ভেতরকার চাপা-পড়া অপরিপূর্ণ মানুষটাকে ফের জাগিয়ে তুলতে শুরু করবে। হয়ত ওঁর একাকিত্ব আর দুঃখ-কষ্টের কথা ওঁকে ফিরে ফিরে স্মরণ করাবে, ভবিষ্যৎ একাকিত্বের করুণতর দিনগুলোর ছবি তুলে ধরবে চোখের

সামনে। কিছু কিছু পাড়া-প্রতিবেশী হয়ত বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাতায়াত শুরু করবে— ওঁর এই দুঃখপূর্ণ জীবন থেকে মুক্তির একমাত্র উদ্ধার হিশেবে। ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে ধরবে। হয়ত আস্তে আস্তে ওঁর প্রতিরোধের দেয়াল ভেঙে যাবে— অস্তিত্বের ভেতর থেকে গভীরতর জীবনাগ্রহ ক্ষুধার্ত জাগুয়ারের মতো জেগে উঠে ওঁর বাইরের সব প্রতিবাদ ভাসিয়ে নেবে।

যা ঘটার তাই ঘটুক। এক নদীতে মানুষ দুবার গোসল করে না। জীবন, যে যাই বলুক, শেষ পর্যন্ত, ক্ষান্তিহীন। তার প্রতিটা নৃশংসতায় সূর্যকরোজ্জ্বলতার দীপ্তি।

সন্ধ্যার পর গাড়িতে করে ঢাকার পথে রওনা হলাম। পথে করটিয়া কলেজ পেরোতেই গাড়ির সবাই প্রাণপণে বাঁ-দিকের মাঠের মধ্যে মিকুর কবরটা আঁতিপাঁতি করে খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নির্জন কালো বিশাল একটা অন্ধকার তুলকালাম বৃষ্টির মতো সারা আকাশজুড়ে নেমে এসে ততক্ষণে কয়েক ঘণ্টা আগের পরিচিত জায়গাটাকে দিকচিহ্নহীনতার মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়েছে। চারপাশের দুর্ভেদ্য কালো রাত্রির মধ্যে মিকুর কবরটা ততক্ষণে এক টুকরো ভেদাভেদহীন কালো অন্ধকার।

দ্বিতীয় পর্ব
(১৯৯২-১৯৯৮)

১

মোল্লা আছে সব জায়গায়। প্রতিক্রিয়াশীলতার যেমন মোল্লা আছে, তেমনি আছে প্রগতিশীলতার মোল্লা। বাঙালি মোল্লা, রাবীন্দ্রিক মোল্লা— কোনখানে মোল্লা নেই?

মোল্লা সম্প্রদায়গত নয়, জন্মগত ও পরিবেশগত।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ধাঁচে বলতে গেলে : মোল্লা মানে অদার্শনিক, অমননশীল একমাত্রিক মানুষ। বুদ্ধি ও চিন্তার সামনে হতবুদ্ধি হওয়া তেড়িয়া মানুষ। অকর্ষিত, কঠোর, ত্বকসর্বস্ব জল্লাদ মানুষ। বোকা, অপ্রস্তুত, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন উপস্থিত মানুষ। অবিকশিত করুণাযোগ্য মানুষ।

২

পৃথিবীতে মানুষ প্রথম যেদিন সাইকেল চালিয়েছিল, সেদিন, কল্পনা করা যায় দুটো চাকার ওপর জলজ্যান্ত একজন মানুষকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসতে দেখে কীভাবে ভড়কে গিয়েছিল পথচারীরা। হয়ত পথ ছেড়ে দৌড়েই পালিয়েছিল অনেকে, ভীতিবিহ্বল চোখে চেয়ে দেখেছিল সেই যন্ত্রযানটির আশ্চর্য কাজ-কারবার।

স্কুলে পড়ার সময় আমার দাদার এক বন্ধুর কাছে তাঁর প্রথম রেলগাড়ি দেখার গল্প শুনেছিলাম। তখন তাঁর বয়স দশ-এগারো। ট্রেনের কথা এর আগেই তাঁর কানে এসেছে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়েছিল সেদিনই— পাড়া-গাঁ থেকে শহরে যাবার পথে। চোখের সামনে হঠাৎ সেই বিশাল ট্রেনটাকে দানবের মতো বাষ্প ছুড়ে সগর্জনে তেড়ে আসতে দেখে তিনি ভয় পাওয়া প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের মতো রেললাইন ছেড়ে দৌড় দিয়েছিলেন মাঠের ওপর দিয়ে— ট্রেনটাকে তার মনে হয়েছিল রূপকথার অতিকায় দৈত্যের মতো, যেন তাকে গিলে খাবার জন্যে ছুটে আসছে। এরপর জীবনে যতবারই ট্রেন দেখেছেন ততবারই ওই ভয় তাঁকে অস্থির করেছে।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রতিটি উদ্ভাবনই মানুষকে যুগে যুগে এভাবে বিস্রস্ত করেছে। প্রথম যেদিন মানুষ একটা ছোট্ট সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়েছে, হাতির

মতো বিশাল একটা মানুষ-বোঝাই জাহাজকে আকাশে উড়ে যেতে দেখেছে, সেদিনকার ভীতিবিহ্বল মানুষের রোমাঞ্চকর ও অভূতপূর্ব বিস্ময়ের পরিমাণ আজ আন্দাজ করা সোজা নয়। আজ কিন্তু এ সবকিছুই মানুষের অতি চেনা ব্যাপার, সাধারণ, গা-সওয়া, সাদামাঠা ঘটনা।

ঢাকায় যখন প্রথম টেলিভিশন এল, মনে আছে, তখন এর অবাক-করা ভেল্কিবাজি দেখে কী অভিভূতই না হয়েছি! যে আমি নিজে সেই টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করতাম, সেই আমারও বিস্ময়ের শেষ ছিল না। অনুষ্ঠান তখন শুরু হত সন্ধ্যা ছটায়। ঘরে ঘরে সবাই ঠিক সেই সময় টিভির সামনে বসে যেত, রাত সাড়ে এগারোটায় জাতীয় সংগীত শুনে তবে ক্ষান্তি। কিন্তু বেশিদিন এভাবে যায়নি, বিস্ময়ের সেই প্রাথমিক ধাক্কার মৃত্যু ঘটেছে কিছুদিনের মধ্যেই। টেলিভিশন একসময় হয়ে পড়েছে 'মাঝেমধ্যে দেখার জিনিস'। এরপর ভিসিআর এলে আবার সেই উত্তেজনা। আজ তাও আটপৌরে। এরপর ডিশ এ্যান্টেনা— কেব্‌ল্ টিভি— চোখের সামনে সারা পৃথিবীর টিভি দেখার সুযোগ। কিন্তু কোথায় সেই রোমহর্ষ আর শিহরণ।

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির হাজার হাজার অভাবনীয় বা বিস্ময়কর আবিষ্কার, কত সহজেই না একসময় তুচ্ছ হয়ে যায় মানুষের কাছে।

মানুষ যে এসব কিছুর চেয়ে অনেক বড়, এটা তারই প্রমাণ।

৩

প্রতিক্রিয়াশীলতার সমস্যা দুটো : তার সামনে যাবার জায়গা নেই, পেছনে যাবার দরকার নেই।

৪

আঠারো শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি— ইউরোপ জুড়ে রেনেসাঁর জোয়ার যখন উপচে উঠছে— সে সময়ে, এদেশে ইংরেজ আধিপত্যের যুগে ব্যবসায়ী আর রাজকর্মচারীদের সঙ্গে রেনেসাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ একদল ইউরোপীয় এসে হাজির হয়েছিল শহর কলকাতায়। কলকাতার প্রথম আমলের পথঘাট তাদের পদপাতে সচকিত ছিল।

সেকালের আত্মোন্নতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হিন্দুরা এই মানুষদের চোখের সামনে দেখেছিল। তারা তাদের সমান হবার স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের মতো বড় হতে পারাকে জীবনের সর্বোচ্চ মহিমা বলে মনে করেছিল। তাদের সে আকুতি ব্যর্থ হয়নি। বিদ্যাসাগর মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সেই সমাজে

অনেক ঋদ্ধ মানুষের উত্থান ঘটেছিল সে সময়ে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এমন অসাধারণ দীপ্তি দেখা গেছে, যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলোর রাজপথেই কেবল দেখা যায়।

পরবর্তীতে, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, মুসলমানেরা যখন আত্মজাগৃতির পথে পা বাড়াল তখন তাদের স্বপ্ন ছিল ওইসব জাগ্রত হিন্দুদের সমকক্ষ হওয়া। তাদের সেই স্বপ্নও ব্যর্থ হয়নি। মীর মোশাররফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, কাজী নজরুল ইসলাম, এ কে ফজলুল হক, জয়নুল আবেদিন, কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতো সম্পন্ন মানুষ জন্মেছিলেন তাঁদের ভেতর— ওই স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার পথ ধরে।

কিন্তু আজ আমাদের সামনে বড় মানুষ কে? কাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা? নিজেদের নিঃস্বতা ছাড়া কে আজ প্রতিদ্বন্দ্বী?

৫

কাউকে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করলে আসলে যে মানুষটাকে রিক্ত করা হয়— সে তো আমি নিজে।

৬

চেখভের গল্প প্রথম পড়েছিলাম, পঁচিশ বছর বয়সে, ইংরেজিতে। এবার পড়া হল বাংলায়, কেন্দ্রের প্রকাশনা বিভাগের দরকারে। সম্পাদনার দায়বদ্ধতার কারণে, অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হল।

বুঝতে পারছি না, কেন গল্পগুলো এমন প্রবল শক্তিতে আমার অন্তর্জগৎকে এভাবে তছনছ করে দিল।

আমার ভেতরকার আগের মানুষটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেন জন্ম নিল একটা নতুন মানুষ। সারাজীবন মানুষকে যেভাবে দেখেছি, তার থেকে আলাদা চোখে যেন তাদের দেখতে পেলাম।

তাঁর গল্প পড়ে কেবলই মনে হচ্ছে, মানুষ এত দুঃখী! এত মমতা দিয়ে মানুষকে দেখা যায়! চেখভ আমাকে ক্ষমা করতে শেখালেন।

কেন এমন লাগল এবার? ইংরেজির বদলে মাতৃভাষায় বেশি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম বলে? বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়া হল, তাই? বয়স আর অভিজ্ঞতায় বোঝার শক্তি বেড়েছে বলে? নাকি চেখভ মানেই এই, ঠিকমতো পড়লে এমনটাই হবে।

৭

ধর্মান্ধতা আমাদের নিয়তি। আমাদের প্রতিক্রিয়াশীলেরা যেমন ধর্মান্ধ, তেমনি ধর্মান্ধ প্রগতিশীলেরা। শক্তির অভাবে সবাই অবতারবাদী, সমর্পিত। ছাত্র-কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী সবাই উত্তেজিত, ভাবোন্মাদ। শক্তি নেই বলে যুক্তির ভারসাম্য নেই। পরমতসহিষ্ণুতা নেই। সবচেয়ে যুক্তিবাদীও অন্তর্গত রক্তে মোল্লা, ফতোয়াবাজ।

বুঝতে অসুবিধা হয় না— কেন এই জাতির ভেতর এত কবি, শিল্পী, গায়ক, ধার্মিক আর মরমীয়া। কেন নেই কর্মবীর? কেন একজনও দার্শনিক নেই।

৮

সবারই ঈশ্বর দরকার হয়, হয়ত ঈশ্বরেরও।

৯

জন্মের পর থেকে মিত্রা আমাদের সঙ্গেই আছে। দিনকয় আগে চার মাসে পড়ল। জন্মের পর, চাউনির ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতেই জ্বলজ্বলে চোখে তাকাতে শুরু করে ও। ওর ঝকঝকে চাউনিটা ছিল ওর জন্মেরই সমবয়সী। ও জন্ম নেবার আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের বন্ধু মাহবুবুর রব সাদী হাসপাতালে ওকে দেখে এসে কমলালেবুর গন্ধ-মাখানো তাঁর বিশুদ্ধ সিলেটি উচ্চারণে বলেছিলেন, "দ্যাখে এ্যালাম আপনার নাতনিকে, সবাইকে প্রফেসারের মতো ধমকাচ্ছে।" কেউ সামনে এলে ও এমনভাবে তার দিকে হেসে তাকাবে, যেন তার ভেতরকার সব জারিজুরি ধরে ফেলে হাসছে।

সারা বাড়িটার জন্যে ও হয়ে দাঁড়িয়েছে এক অপার্থিব আনন্দের উৎস। স্বভাবটাও বেশ দিলখোলা আর তরতাজা— সারাক্ষণ মুখে ফুটফুটে হাসি ছড়িয়ে রেখে জীবনটাকে খুশি করে দেয়। কেউ ওকে দেখে মুচকি হাসলেই ওর চোখমুখ খুশিতে জ্বলে ওঠে, আর তখন আকাশের দিকে জোরে জোরে হাত পা ছুড়ে, শরীর নাড়িয়ে, বড় বড় পাপড়িওয়ালা চোখের আশ্চর্য ফুলগুলোকে খুশিতে নাচিয়ে হাসতে থাকে। ওর চাউনি ঝকঝকে, কিন্তু তাতে বাড়তি চালাকি নেই। বড় বড় চোখ জুড়ে বিনম্র মাধুরী। তাকানোর ভঙ্গি বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু সরল, কিছুটা হয়ত আমারই মতো।

ভোরে জেগে ওঠার পর থেকেই নানান রকমের শব্দে বাড়িটাকে ও উল্লাসমুখর করে রাখে। ওর মা লুনা আর ওর নানী ওকে কোলে নিয়ে সারাদিন পাখির বিচিত্র ভাষায় অনর্গল কথা বলে। বিরতিহীন অর্থহীন সেসব কথা— সবই মনের অনবদ্য রং দিয়ে তৈরি। তবু সেসবের ভেতর দিয়ে জীবনের অনেক অকথিত আকুতি আর

খুশি ওরা নিজেদের অগোচরে প্রকাশ করে। ওদের সেই শিশুজগতের ভাষার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো ভাষার মিল নেই। ওদের একজনের ভাষা আবার আরেকজন থেকে আলাদা। দিনরাত এমন বিরতিহীনভাবে ওই ভাষায় ওরা কথা বলে যে আশঙ্কা হয়— ওদের নিজেদের ভাষাটাই না আবার বদলে যায়।

মেয়েকে নিয়ে লুনা একটু বেশিরকম টেনশনে ভোগে। এমনিতেই তো সবসময় মেয়ের জন্যে এটা-ওটা করছেই, এর ওপর অবসরের সময়টুকুও মেয়ের কাছেই থাকতে চেষ্টা করে। এরই মাঝখানে হঠাৎ যখন ঘরে কেউ নেই, এমনকি মিত্রার মা-নানীও না, একা বিছানায় শুয়ে ও অবোধ উল্লাসে রাজ্যের কথা বলে চলেছে, তখন ঘরের ভেতর কেউ পা টিপে ঢুকলে অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাবে— জানালা দিয়ে উপচে-আসা উজ্জ্বল আলোর রাজ্যে গাছ-ফুল-আঁকা বিছানার চাদরের সবুজ অরণ্যের ভেতর একটা বড় সাদা ম্যাগনোলিয়ার মতো ও কেমন ফুটে আছে।

ওকে দেখে দেখে মন ভরে না। ওর সঙ্গে অনর্থক কিচিরমিচির সেরে যখন দায়িত্বের টানে পড়ার টেবিলের দিকে পা বাড়াই, তখন কে যেন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে : ফিরতে অবশ্য পার তোমার কাজের জগতে, কিন্তু যে স্বর্গ এই ফুরফুরে বিছানায় ফেলে রেখে যাচ্ছ, কোথায় পাবে সেখানে তুমি তা? ওকে না দেখা মানে তো জগতের অপরূপকে না দেখা।

অদ্ভুতভাবে আদর কাড়তে পারে ও। যখন একটানা অনেকক্ষণ ওর গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে ওর ভেতরকার প্রদীপ্ত শিশুটাকে নিজের মধ্যে টেনে নিতে চেষ্টা করি, তখন ও এমন অপরূপভাবে চুপ করে থাকে যেন গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে পুরো আদরটুকু পেয়ালাভরে পান করে নিচ্ছে।

১০

গোবিন্দ দাসের কবিতা পড়ে অবাক হলাম। ভেবে অদ্ভুত লাগল— এমন ব্যতিক্রমী, মৌলিক, জ্বলজ্বলে আর শক্তিমান কবি কী করে এই সাহিত্যে এতদিন উপেক্ষিত ছিলেন? বাংলাসাহিত্যের বৈভবময় সমালোচনার ধারা কি এতই অন্ধ?

সবরকম গতানুগতিকতা এড়িয়ে সরাসরি মানুষী-চোখে জীবনকে দেখার নির্ভুল চোখ ছিল তাঁর। এদিকে থেকে গোবিন্দ দাস (১৮৫৫-১৯১৮) তাঁর কালের সবচেয়ে আধুনিক মানুষ।

এই বিচারে রবীন্দ্রনাথের চাইতেও আধুনিক তিনি। কেবল রবীন্দ্রনাথ কেন, রজনীকান্ত, ডি.এল. রায়, দেবেন সেন, অক্ষয় বড়াল— কার থেকে নয়? চেতনার দিক থেকে তিনি মার্ক্স ও ফ্রয়েডোত্তর, বোধের দিক থেকে তিরিশের সগোত্র। ওই সময়ে জন্মালে তিনি হয়ত ওই ধারার অন্যতম প্রধান কবি হতেন।

১১

মননে উপলব্ধিতে ওদের চেয়ে কম ছিলাম না। অপরাধ হয়েছিল বাড়তি কিছু থাকায়। ওদের গুরুগম্ভীর আর বিরাট বিরাট কথাগুলোকে হালকা হাসিতে সহজ করে বলতে পারতাম, এই ছিল অপরাধ।

বুদ্ধিজীবীর শিরোপা থেকে তাই বঞ্চিতই থেকে যেতে হল সারাজীবন।

১২

তরুণ বয়সে যে সুদর্শন কার্তিক, বৃদ্ধ বয়সে তার নামই দেবাদিদেব শিব।

১৩

কাল ছিল আমার জন্মদিন। তেপ্পান্ন বছর শেষ করে চুয়ান্নতে পড়ার দিন।

জীবনের একটা পর্যায় পর্যন্ত মানুষ বয়স কমিয়ে বলতে ভালোবাসে, এরপর বাড়িয়ে বলতে। মাঝবয়সের আগ পর্যন্ত সবাই নিজের বয়স কমিয়ে বলতে চায়— জীবনকে ভালোবাসে বলে, একে ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় বলে, চলে যাচ্ছে দেখে ভীত হয় বলে। তবু জীবন তো প্রত্যাবর্তনহীন যাত্রায় চলে যায় যেখানে যাবার। তাই যেদিন নিশ্চিত টের পায় সমস্ত আলিঙ্গন ছিঁড়ে 'নিঠুর ময়না' চলে গেছে, সেদিন ভাঙাচোরা শরীরে, পড়ন্ত জীবনের অর্থহীনতাকে টর্চের মতো উঁচু করে তুলে ধরতে চায় সে, পরিণত বয়সের শ্বেতশুভ্র পতনকে জীবনের শস্যময়তার প্রতীক করে দেখাতে চায়। এটা তার বয়স বাড়িয়ে বলার সময়। একটা দুটো এমনকি পাঁচটা বছর বাড়িয়ে বলা তখন আর তার জীবন থেকে বিয়োগ নয়, যোগ।

এমন একটা বয়সে আমি এখন পৌঁছেছি, যখন বলতে পারব না— জীবন রুমাল উড়িয়ে বিদায় নিয়ে গেছে, অথচ আবার তা শেষ হতেও দেরি নেই। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান আর আশঙ্কা-ব্যথিত সময়পর্ব এটা— জীবন-শেষের এই দু'চারটা বছরের একমুষ্টি সময়। এরপর শুধুই শূন্যতা। এটা সেই সময়, যখন জীবন সবচেয়ে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠতে চায়— সবাইকে ডেকে আর্ত গলায় বলতে চায় : 'শেষবারের মতো আমাকে দেখে নাও তোমরা— এ প্রদীপ আর জ্বলবে না।'

এরই মধ্যে আমার কষ্টগুলো, দুঃখগুলো, ব্যক্তিগত যন্ত্রণাগুলো কমে আসতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই তারা এক বরফ-শাদা নিঃসীম অচেনা প্রান্তরের দিকে উড়ে পালাবে। এরপর যা থাকবে তা কাফনের মতো শাদা এক বার্ধক্যের দেশ— সান্তিয়াগোর সুন্দর বিশাল শক্তিমান সেই শ্বেতশুভ্র মৎস্য কঙ্কালের আকীর্ণ জগৎ। মীর তকী মীরের একটা ছোট্ট শের মাঝে মাঝেই মনে পড়ে :

'কাল রাতে যেখানে মীরের বাসনার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল, আজ সকালে সেখানে গিয়ে একমুঠো ছাই দেখতে পেলাম'।

হ্যাঁ, একমুঠো ছাই। একমুঠো ফ্যাকাসে বিমূঢ় ছাই হয়ে পড়ে থাকবে আজকের এই গনগনে জীবন। কী দুর্লভ আর মূল্যবান তার আগের এই ক'টা বছরের প্রতিটি মুহূর্ত! কী পরিপূর্ণ ব্যবহার্য, আকাঙ্ক্ষাব্যথিত, ফলন্ত আর সোনালি!

এই বিমর্ষ ক্ষিপ্র পলায়নপর সময়টার একেকটা বছর শেষ হয়ে যে দিনটা আমার দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছে, তাকে মৃত্যুদিন না বলে কী করে জন্মদিন বলি? কী করে শত্রুকে স্বাগত জানাই? ফাঁসির তারিখের ঘোষণা শুনেও সুস্থির থাকি?

জীবনকে যারা সুস্থিরভাবে মেনে নিতে পারে তাদের একজনের নাম যৌবন। সে এটা পারে তার ভাঁড়ার সম্রাটের মতো অনিঃশেষ বলে। তার এত আছে যে, একজোড়া বড় কালো চোখের জন্যে দশ-বিশটা বছর সে অনায়াসে উড়িয়ে দিতে পারে। বার্ধক্যও পারে এমনটা, এর উল্টো কারণে। কঠিন শীতে তার পদ্মের বন পুরোপুরি মরে গেছে বলে। কিন্তু আমাদের? যাদের হাতে আর বড়জোর দু'চার বছরের বিষণ্ন বরাদ্দ, তাদের পক্ষে একটা গোটা বছরকে হারিয়ে ফেলার শোক ভুলে যাওয়া কি অতই সোজা?

ভেবেছিলাম, নিঃশব্দে অজান্তে এবারের জন্মদিন পার হবে। একটা বছর হারিয়ে ফেলার ভয়কে চোখ বুজে ভুলে থাকা যাবে। তা আর হল না। জন্মদিনের ঘরোয়া অনুষ্ঠান আয়োজিত হল যথারীতি। অনেকে দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। একজন নামকরা গায়িকা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। যাবার আগে বললেন, এমনি হাজার বছর যেন আপনার জন্মদিন করে যেতে পারি।

মানুষ হাজার বছর বাঁচে না, তবু এসব কথা বলতে ভালোবাসে। হয়ত হৃদয়ের চাওয়াগুলোকে এভাবেই ভাষা দিতে চায়। কিন্তু কী করে তাঁকে বোঝাই— যখন তিনি কথাগুলো বলছিলেন তখন কী গভীরভাবে মৃত্যু আমার আপাদমস্তক জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল!

১৪

সাহিত্যের মতো মানুষও দুরকম : সাম্প্রতিক ও চিরায়ত।

১৫

টাকা আর ভালোবাসা একই জিনিস। বেঁচে থাকার জন্যে খুবই জরুরি, কিন্তু অমেয় জীবনের শত্রু। ওই জীবনকে পাবার জন্যে যা সবচেয়ে দরকারি তা হচ্ছে এদের অভাব।

রূপকথার সেই বুড়ি রাক্ষসীদের কথা ভেবে মন খুব ভারী হয়ে পড়ে। বয়সী, লোল আর কদর্য— কী করুণ আর অনভিপ্রেত জীব এরা। কথাও বলে যৌবনের অনধিগম্য ভাষায় : কাছে যাবার কথা বললে দূরের পথে পাড়ি জমায়, দূরে যাচ্ছি বললে কাছাকাছি থাকে। কথা বলার সময় শব্দের প্রথম অক্ষরে অকারণ চন্দ্রবিন্দু যোগ করে— 'হাউ মাউ খাউ' না বলে বলে, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ।' হয়ত ঝুলে-পড়া লোল-জিভে সঠিক উচ্চারণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলাতেই অমনটা করে। পাউ বলতে গিয়ে আড়ষ্ট জিভের জড়তায় অবোধের মতো বলে ওঠে 'পাঁউ'।

তো একদিন রাক্ষসী বলল, "আজ কাছে যাচ্ছি।" তার পাতানো নাতনি— রাজকন্যা— মুহূর্তে বুঝে নিল আজ তারা দূরে যাবে। বুঝল আজই ওদের সদলে নিপাত করার সুযোগ। পুকুরের তলে সযত্নে লুকোনো ভোমরার ভেতর তাদের জীবন— এটা তো সে অনেক আগেই বুড়ি রাক্ষসীকে সেবায় ভুলিয়ে, পায়ে তেল মালিশ করে, পাকা চুল বেছে দিয়ে জেনে নিয়েছে।

এক মুহূর্তও অপব্যয় না করে প্রাসাদের জনবিরল ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকা রাজপুত্রকে বার করে আনল সে। তারপর রাক্ষসীদের নিপাত করার কাজে নেমে গেল। কাজটা সমাধা করার পথ তখন প্রশস্ত। বার্ধক্যজনিত বিস্মৃতির কারণে বুড়ি রাক্ষসী-পুরীরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থা না করেই চলে গেছে দূরে। রাজকন্যার কাছে তাদের প্রাণভোমরার খবর সে যে মনের ভুলে ফাঁস করে বসে আছে, স্তিমিত স্মৃতির কারণে সে কথাও তার মনে নেই।

রাজপুত্র পুকুরের তলা থেকে এক ডুবে প্রাণভোমরাটাকে তুলে এনে হাতের মুঠোয় চেপে ধরতেই দলসুদ্ধ রাক্ষসীদের শরীর-মন আইঢাই করে উঠল। নিজেদের ভ্রান্তির অনুশোচনায় তখন কপাল চাপড়াচ্ছে তারা। ভয়াবহ পরিণাম আঁচ করে তারা হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে ছুটে আসতে লাগল প্রাসাদের দিকে। তাদের ছুটে আসা পথের চারপাশের পৃথিবী ধুলোয় অন্ধকার হয়ে উঠল। কিন্তু পথ তখন সর্পিল এবং শত্রু পরাক্রান্ত।

রাজপুত্র এক ঝটকায় ভোমরার ডানপাশের পাখাটা ছিঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ গর্জনে ছুটে-আসা সব রাক্ষসীর ডানহাতগুলো একসাথে ছিঁড়ে পড়ে গেল মাটিতে। রক্তে ভিজে উঠল তাদের শরীর। তবু তারা অপরাজিত। অবশিষ্ট এক হাত দোলাতে দোলাতেই রাজপুত্র-রাজকন্যার দিকে ধেয়ে আসতে লাগল তারা। কোনোমতে পুরীতে পৌঁছাতে পারলেই তারা বেঁচে যাবে। কোনোমতে শুধু পুরী পর্যন্ত!

রাজপুত্র তখন ছিঁড়ে ফেলল ভোমরার বাঁ দিকের পাখাটা। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসীদের বাঁ হাতগুলোও ছিঁড়ে পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু তখনো তারা ছুটছে।

হাতবিহীন, শুধু দুটো পায়ের ওপর ভর করে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে তারা। জীবন বাঁচাতে তারা বদ্ধপরিকর। আহা, ছোট্ট এতটুকু এই জীবন কী করে তারা হারায়!

রাজপুত্র তখন ছিঁড়ে ফেলল ভোমরার ডান পা ক'টা। অপ্রস্তুত ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তারা মাটিতে। তাদের সবার ডান পা ছিঁড়ে পড়ে আছে ধুলায়। শরীর গড়াগড়ি খাচ্ছে রক্তের জলায়।

তবু তারা দুর্জয়। আর কয়েক মুহূর্ত পেরোলেই গন্তব্য। তাহলেই তারা বেঁচে যাবে। এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে সেই অঙ্গহীন কদাকারের দল তখনও হাঁউ মাঁউ করে ধেয়ে চলছে শত্রুর দিকে। পুরীর একেবারে কাছাকাছি তারা তখন।

রাজপুত্র তখন ভোমরার অন্য পা-গুলোও ছিঁড়ে ফেলল। হাত-পা-হীন হয়ে দলসুদ্ধ রাক্ষসীরা আছড়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু তখনো তারা অপরাভূত। রক্তাপ্লুত শরীরগুলোকে জ্ঞানশূন্যের মতো গড়াতে গড়াতে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে। মুখের ভেতরের রক্তমাখা লম্বা চোখা দাঁতগুলো তখন তাদের আক্রমণের শেষ বর্শা।

রাজপুত্র তখন একটানে ছিঁড়ে ফেললেন ভোমরার মুণ্ডু। রাক্ষসীদের মাথাগুলো গগনবিদারী শব্দে রাজপুত্রের পায়ের সামনে একসঙ্গে এসে আছড়ে পড়ল। তাদের হাত-পা-মুণ্ডহীন ধড়গুলো পুরীর চারপাশে কদাকার হয়ে ছড়িয়ে রইল।

এমনিই তো আমাদের জীবন এ পৃথিবীতে! এভাবেই তো একে একে সবকিছু খুইয়ে একসময় শেষ হওয়া।

১৭

'পেছনে চলা' বলে কিছু নেই। মানুষের শরীরের দিকে তাকালে এর সমর্থন মেলে। মানুষের গোটা শরীর-গড়নটাই কি সামনে চলার জন্যে তৈরি নয়? চোখ কি সামনের দিকে তাকাবার বা পা কি সামনের দিকে এগোবার জন্যে নয়? নয় কি হাতও? নাক, মুখ এমনি যেসব প্রত্যঙ্গ চলার সহায়ক তারা সবই তো সামনের দিকে উদ্যত। নাকি গতির অভিমুখে প্রসারিত বলেই একে আমরা সামনের দিক বলি? পেছনেও মানুষ যেতে পারে কিন্তু সে কেবল ব্যতিক্রম হিসেবে, বাড়তি লাভ হিসেবে।

কেবল মানুষ কেন, সব পাখি, প্রাণীই কি তা নয়? কে পেছনে যায় পৃথিবীতে? যায় কি উদ্ভিদরা? গ্রহ নক্ষত্র বিশ্বপ্রকৃতি— সময়, মহাসময়? সবাই তো যাচ্ছে অজানিতের দিকে, সামনের দিকে। তাহলে কোথায় পশ্চাদগতি? যারা বলে অমুক ঘটনা আমাদের ত্রিশ বছর পিছিয়ে দিয়েছে, তারা কি ঠিক বলে? কিছুই আমাদের পিছিয়ে দেয় না। যেখানে সত্যিকার থাকার সেখানেই আমরা থাকি। মাঝখানে

সাফল্যের দম্ভে, অতি আশাবাদের মোহে বা বুদ্ধির আচ্ছন্নতায় আমরা বোকার মতো ভেবে বসি, আমরা বহু বছর এগিয়ে গিয়েছি। আসলে ওই ঘটনাটি আমাদের ত্রিশ বছর পিছিয়ে দেয়নি, আমাদের বুদ্ধিমত্তা আমাদের ঠিকমতো ফেরত এনে সঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মাত্র।

১৮

রাশফুকোর লেখায় পড়েছিলাম : ঈর্ষা প্রেমের সঙ্গে শুরু হয় কিন্তু প্রেমের সঙ্গে শেষ হয় না। সে ঈর্ষাও বোধহয় আজ শেষ।

১৯

মানুষ দু-রকম। এক, যারা এষণা করে; দুই, যারা গবেষণা করে।

২০

খাবার টেবিলে নানান স্বাদের যত বেশি রকম খাবার পরিবেশন করা হবে ততই তো আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রজ্বলন। শহরে চাইনিজ, ইটালিয়ান, মোগলাই, থাই, কন্টিনেন্টাল, দেশি— যত দেশের যত রকম খাবারের দোকান বসবে, আমাদের রসনাকে যত বেশি স্বাদ আর উষ্ণতায় প্রদীপ্ত করবে ততই তো জীবনের সমৃদ্ধি। বৈচিত্র্যই তো বৈভব। যত বিভিন্ন জাতের গাছ লাগিয়ে চারপাশকে রুচি সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যে ভরে দেওয়া যাবে ততই তো আনন্দের বিস্তার। বাগানকে যত বেশি রং-বেরংয়ের ফুল ফুটিয়ে ভরে ফেলতে পারব ততই তো অস্তিত্বের বিস্ময়।

কিন্তু মানুষের বেলায় আমরা কেন এত বিপরীত? কেন আমাদের থেকে পৃথক মানুষদের মতামত মেনে নিতে আমরা এত কৃপণ? যেন আমিই পৃথিবীর পরম ও শেষ আদর্শ। কেন পৃথিবীর সবাই শুধুমাত্র আমার মতো না হলে আমরা ক্ষুব্ধ? অন্যদের আলাদা মন, মানসিকতা, রুচি বা আচরণের ব্যাপারে আমরা কেন এমন অসহিষ্ণু? কেন সবাইকে স্টিম-রোলারের নিচে অবয়বহীন করে কেবল নিজের এক এবং অভিন্ন আস্তিনের মধ্যে না ঢোকানো পর্যন্ত আমরা স্বস্তিহীন? কেন মানুষের ভিন্নতায় আমরা এমন প্রতিবাদী, ক্ষুব্ধ?

২১

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসীই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেয়সী নয়।

২২

প্রকৃতিতেও রয়েছে মানুষের জগতেরই আচরণ।

প্রচণ্ড তাপে কোনো জায়গার উষ্ণ বাতাস যদি আত্মাহুতির ভঙ্গিতে ওপরের দিকে উঠে যায়, তবে দূরদূরান্ত থেকে সহানুভূতিশীল ব্যথিত হাওয়ারা দল বেঁধে মাতম করতে করতে সেই জায়গার চারধারে এসে জড়ো হয়। কেবল তাই নয়, আগের বাতাসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি আর গতি নিয়ে সেই রিক্ত অঙ্গনের চারধারে মত্ত দীর্ঘশ্বাসে পাক খেতে থাকে। তারপর একসময় প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন জাগিয়ে, বিস্তীর্ণ প্রকৃতিকে উত্তাল তাণ্ডবে চুরমার করে মাতালের মতো আবর্তিত হতে থাকে। যেন প্রথম হাওয়াদের সেই আত্মাহুতিকে অশ্রুসিক্ত প্রমত্ত দীর্ঘশ্বাসে স্মরণীয় না করে তাদের ক্ষান্তি নেই।

মানুষের জগৎও এমনি। পরিপার্শ্বের বেদনায় আর্ত হয়ে এই পৃথিবীর কোথাও কেউ যদি আচমকা আত্মোৎসর্গ করে বসে তবে তার শূন্য চত্বর ঘিরেও ঘটে একই ঘটনা। প্রথমে বেদনামথিত মানুষের দল চারপাশ থেকে ক্ষুব্ধ আহাজারিতে ছুটে এসে তার উৎসর্গবেদির চারধারে জড়ো হয়। তারপর মাতাল মাতমে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব জাগিয়ে সে বেদির চারধারে এমনি প্রমত্তভাবে আবর্তিত হতে শুরু করে। আত্মোৎসর্গিতের স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করেই কেবল সেই বেদনামথিত সংক্ষোভের সমাপ্তি।

আত্মোৎসর্গের ব্যর্থতা নেই— কি প্রকৃতিরাজ্যে কি মানুষের জগতে।

২৩

জীবনের চরিতার্থতার জন্যে তোমার দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম। তোমার পরিপক্ব দ্রাক্ষাকুঞ্জও ভাঁড়ারহীন ছিল না।

সম্পন্নতার হাতটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিলে কী এমন ক্ষতি ছিল?

২৪

যৌবনে মৃত্যুগ্রস্ততা থাকে সবচেয়ে বেশি। মৃত্যুর বেদনায় যৌবনের চোখের পাতা নিজে থেকেই ভিজে ওঠে :

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি জল।

রবীন্দ্রনাথ 'কেন যে কে জানে' লিখলেও, আমরা জানি, কী সেই অকথিত কষ্ট যার জন্যে 'সমস্ত প্রাণে' আঁখিজল ভরে আসে। এই শ্যামলা বিপুলা পৃথিবী আজকের মতোই এমনি উর্বর আর মঞ্জরিত হয়ে থাকবে অথচ সেই পরিপূর্ণতম প্রাপ্তির মুহূর্তে আমি থাকব না— ব্যাপারটা তাকে কষ্ট দেয়। এই অনুভূতি বিশেষভাবে যৌবনের। জীবনের সুন্দরতম মুহূর্তেই মানুষ গভীরতম বেদনাকে অনুভব করে।

জীবনকে এমন আদিম বাসনা ঢেলে ভালোবাসে বলেই যৌবন এত মৃত্যু-কাতর। মৃত্যুর মধ্যে এই রূপ-রস-উপভোগমধুর জীবনের অবসানের আশঙ্কা তাকে বিষাদাচ্ছন্ন করে রাখে। তাই অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য মৃত্যুকে সে প্রত্যাখ্যান করে। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' তাই যৌবনের সংগীত, বার্ধক্যের নয়।

আমার জীবন পুরো ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা জোর দিয়ে বলব না। তবু বিদায়ের আগে অচরিতার্থতার দুঃখও কম নয়। কিন্তু পৃথিবীর সার্থকতম মানুষও তো অসম্পূর্ণ। জীবনচক্রের প্রধান পর্ব আমি পার করেছি, এখন যা ঘটবে তা তো তারই উন্নততর বা নিম্নতর পুনরাবৃত্তি মাত্র। দুঃখের প্রক্রিয়াকে কী করে আমি এড়াব?

জীবন ছোট ও অলক্ষ সব ক্ষতির ভেতর দিয়ে আমাদের অজান্তে প্রতিদিন মৃত্যুর জন্যে আমাদের তৈরি করে তোলে। তাই মৃত্যুকে আমরা একসময় এত সহজে গ্রহণ করতে পারি।

সেই ক্ষতির পর ক্ষতি আমাকে একটু একটু করে নিঃস্ব করতে করতে আজ মৃত্যুর প্রতিবেশী করে ফেলেছে। আমাদের যা আনন্দেরও অধিক আনন্দ— সেই বেদনাগুলো কষ্টগুলো জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছে। মৃত্যুকে আমি এখন প্রতি মুহূর্তে দেখি। সকালবেলার প্রাতঃভ্রমণ দলের দৈনন্দিন সংগীদের মতো আজকাল আমার পাশাপাশি সে নিঃশব্দে হেঁটে চলে। কেন তবু ফাল্গুন দিনের মৌমাছির মতো আমি কাঁদছি? রক্তের কণায় কণায় কেন মৃত্যুকে এত প্রত্যাখ্যান! কেন আর অল্পকটা বছরের জন্যে এমন ভিখিরির মতো আকুলতা।

যৌবনের মতো আমিও অসম্পূর্ণ। সামাজিক কাজে আর দায়ে আমার লেখক হওয়ার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে। আমার রক্তে আজও কোটি কোটি শব্দের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বর্শা উঁচিয়ে সারে সারে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ বিজয়হীন উষ্ণীষহীন যুদ্ধহীন— সদলে তারা মুছে যাবে, নিজেদের শক্তিকে ব্যবহারের কোনো সুযোগই হয়ত পাবে না। মৃত্যুর দিকে কী করে আমি বন্ধুত্বের হাত বাড়াব? লেখা আমার রক্তের মৌল আকুতি। হাজার কোটি শব্দের সুন্দর বিশাল উন্মোচনের উত্তাল শীর্ষে তার সম্পূর্ণতা।

লেখালেখি শুরু করার পর অপরিচিত অনাবিষ্কৃত অবিশ্বাস্য যেসব জগতের রহস্যময় আভাস চেতনালোকের ভেতর লক্ষ করছি, তাকে ভাষায় তুলে ধরার সময় কোথায়?

২৫

রূপ আর প্রতিভা একই জিনিশ। দুটোই জন্মগত, দুটোই জ্বালিয়ে ছাই করে।

২৬

কাল একটা মজার কথা শোনা গেল। কথাটা এরকম :

পৃথিবীতে একটা সময় ছিল যখন মানবজাতিকে পথনির্দেশ করতে স্বয়ং ভগবান নেমে আসতেন মানুষের মধ্যে, অবতারের চেহারায়। এর পরবর্তী পর্যায়ে, মানুষের অবস্থান যখন আরো শক্ত-পোক্ত, ঈশ্বরের নিজের আসার দরকার তখন কিছুটা কমে এল, প্রেরিত পুরুষ দিয়েই তখন মোটামুটি কাজ চলে যায়। কয়েকশো বছরের ব্যবধানে বেশকিছু মহাপুরুষ এই সময় এসে গেলেন পৃথিবীতে। এটা এককথায় পয়গম্বরদের যুগ। পরের যুগে দেখা গেল প্রেরিত পুরুষদেরও আর দরকার নেই, জিনিয়াস বা প্রতিভানদের দিয়েই কাজ চলে যাচ্ছে। এটা মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রতিভাবানদের যুগ। এরপর দেখা গেল জিনিয়াসও দরকার নেই, কিছু মেধাবী লোক দিয়েই ওই কাজ চলে। তখন এল মেধাবীদের যুগ। এরপর বোঝা গেল মেধাবী নয়, মোটামুটি শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত ও উজ্জ্বল লোকদের দিয়েই চলে কাজটা। সারা পৃথিবীতে আজ ওই যুগই চলছে।

ব্যতিক্রম কেবল আমাদের দেশে। সব বিষয়ে পুরোপুরি অকর্ষিত হতে না পারলে এখানে কোনোকিছুই করা যায় না।

২৭

বুদ্ধিমানেরা তর্ক করে, প্রতিভাবানেরা পৌঁছে যায়।

২৮

কেন্দ্রের নন্দনচক্রের অনুষ্ঠানে সেদিন বেহালা বাজালেন রাজশাহীর রঘুনাথ দাস। রাজশাহী থেকে আমন্ত্রণ করে আমরাই তাঁকে এনেছিলাম।

রঘুনাথ বাবুর বয়স পঁয়ষট্টির ওপর, কিন্তু দেখলে মনে হয় আরো বেশি। তবে চেহারায় মিইয়ে আসার কোনো চিহ্ন নেই, বরং উল্টোটাই আছে। ছোটখাট ছিপছিপে পরিপাটি মানুষ তিনি। মাথার একপাশের সামান্য পাক-ধরা চুল পরিচ্ছন্ন করে আঁচড়ানো। সারা শরীরে একটা পারিপাট্যময় স্নিগ্ধতা। কিন্তু আসল বার্ধক্য আছে তাঁর শরীরের ভেতরে, বাইরের মার্জিত পরিশীলনের আড়ালে। সামান্য কষ্টেই অসহায়ভাবে এলিয়ে পড়েন। রাজশাহী থেকে বাসে চড়ে ঢাকায় আসার ধকল সামলাতে পারেন না। প্লেনে আসতে হয়।

কিন্তু বেহালা হাতে নেবার সাথে সাথে কী অলীকভাবেই না জ্বলে উঠলেন তিনি! জরা বৈকল্য অনায়াসে দু-হাতে উড়িয়ে জ্বলে উঠলেন। যে তারুণ্য পৃথিবীর জন্মদিনের সঙ্গে শুরু হয়ে আর কোনোদিন মরেনি, সেই তারুণ্যের মতোই জ্বললেন তিনি।

বেহালা শুরু হতেই শ্রোতাদের মন এক অলৌকিক খুশিতে যেন নেচে উঠল— সেই বিস্ময়কর আনন্দ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই স্নিগ্ধ উচ্ছল আনন্দের উৎস তাঁর হৃদয়ের চির যৌবনের রাজ্য— শরীরী জরা সেখানে এখনো পা ফেলতে সাহস করেনি।

সংগীত পরিবেশনের শেষ পর্যায়ে— ঝালার সেই ঝংকারমুখর ক্ষিপ্র অস্থির উচ্ছ্রিত সময়টুকুতে যেন পুরোপুরি বিস্ময়কর আর অচেনা হয়ে উঠলেন তিনি। মনে হল হাজার হাজার সোনালি পায়রা তার বেহালার তারের ওপর উজ্জ্বল নিক্কণে নেচে বেড়াচ্ছে। তাঁর বেহালা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল সুন্দরতম যৌবনও কি এমনি? সুকান্তের লাইনটা মনে পড়ে—

'আমাদের ভালো পুরোনো, চাই না বৃথা নবীন।'

অনুষ্ঠান শেষ হলে তাঁকে ফুল উপহার দেবার সময় একটা কথাই কেবল মনে হল : এমন বৃদ্ধ থাকলে যুবকের দরকার কী।

২৯

শিশুরা যতটুকু বড়, বড়রা ততখানি শিশু নয়। এখানেই শিশুরা বড়দের চেয়ে ওপরে।

৩০

ক

যৌবন একদিকে যেমন আমাদের ঈপ্সিত উপভোগগুলোকে সারা পৃথিবী থেকে ধরে এনে জীবনের দরজায় দাঁড় করায়, তেমনি আবার নিজের জন্যে অবাঞ্ছিত উপভোগগুলোকে ঘাড় ধরে দরজার বাইরে বের করে দেয়। প্রৌঢ়ত্বে, যৌবন ধরে আসতে শুরু করলে, এককালের অনেক সাধে ডেকে আনা যৌবনের ওই ভোগ্যগুলো যেমন বিদায় নিতে শুরু করে তেমনি সুযোগ পেয়ে দরজার বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া সেই অবাঞ্ছিত উপভোগগুলো দরজা দিয়ে চুপে চুপে ঢুকে পড়তে থাকে। ফলে তখন শুরু হয় অন্য এক আনন্দের ঋতু। এইজন্যে যৌবনের অবসান জীবনের অবসান নয়। বার্ধক্য জীবনপিপাসার ইতি ঘটাতে পারে কিন্তু নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না। জীবনভোগেরও না। জীবন যৌবনের চেয়ে বড় বলেই পারে না।

'পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি?
আস্তে একটু চল-না ঠাকুরঝি!
ওমা, এ যে ঝরা বকুল, নয়?'

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতার অন্ধ বধূ ফুলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হত স্পর্শ পেয়ে। আমি নিশ্চিত হতাম ঘ্রাণ নিয়ে, চোখ ছিল বলে। তবু এ ব্যাপারে আমার কিছুটা পার্থক্য ছিল অন্যদের সঙ্গে। আমার ঘ্রাণশক্তি ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ আর প্রখর।

বড় বেশি দূর থেকে টের পেয়ে যেতাম ফুলের গন্ধ। না দেখেও বলতে পারতাম কোথায় কতদূরে কোনখানে পড়ে আছে কোন ফুল। যেসব ফুলের শরীরে বড় বেশিরকম গন্ধ— সৌরভ-গরবিনী বলে যাদের একটু বেশি দেমাগ বাজারে, যেমন কেয়া, হাস্নাহেনা, নাগেশ্বর, জুঁই বা মহুয়া তাদের তো বটেই, এমনকি অতিসাধারণ— গন্ধ-আছে-কি-নেই ফুলদেরও— টের পেতাম দূর থেকেই। আশপাশের সুগন্ধিমাখা প্রতিটা মেয়েকে মনে হত একঝাড় চলন্ত হাস্নাহেনা। সৌগন্ধ্যকে টের পাবার এমনি অবিশ্বাস্য তীক্ষ্ণশক্তি ছিল তখন।

যে-কোনো অতিপ্রদত্ত ক্ষমতার শাস্তিও নির্মম। কড়া গন্ধের ফুল তো বটেই, এমনকি বেশি-ঘ্রাণ-নেই ফুলের ঘ্রাণও আমার কাছে অসহনীয় লাগত। বেলি-গন্ধরাজের মতো হালকা আর পেলব গন্ধের ফুলকেও আমার দূরে সরিয়ে রাখতে হত। নাসারন্ধ্রের কাছে ফুল আনলেই মনে হত গন্ধের হিংস্র ক্রূর ছোবলে আমার চেতনা ঘুলিয়ে উঠছে। প্রতিটা ফুলকে আমার মনে হত কুণ্ডলী পাকানো লিকলিকে তীব্র কালসাপের মতো। তাদের ঘ্রাণের অত্যাচারে বিবমিষায় আমার মাথা ঝিমঝিম করত। ফুলের সঙ্গ থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করতাম।

তীব্র ঘ্রাণশক্তির আশীর্বাদ দিয়ে যৌবন এভাবে ফুলের সৌগন্ধ্যময় পৃথিবী থেকে আমাকে নির্বাসিত করে রেখেছিল। প্রৌঢ়ত্বে এসে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সেই তীব্র সংবেদনশীলতা শমিত হওয়ার পর, ফুল আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে। কেবল ভালো লাগা নয়, অনির্বচনীয় মাধুর্যের জন্যে ফুল আমার কাছে প্রিয়দর্শিনীও হয়ে উঠেছে। ফুল আমাকে একটা গন্ধে-ভরা মৌ মৌ পৃথিবী উপহার দিচ্ছে। ফলে প্রৌঢ়ত্ব আমাকে এমন কিছু দিচ্ছে যা যৌবন দিতে পারেনি। ইন্দ্রিয়ের সব নাচঘরে আমি একটা ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বিভোর মাতাল উৎসব টের পাচ্ছি। যেখানে তা পাচ্ছি না, সেখানে তা আতিপাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

খ

সহজ আর কঠিন— এই দুয়ে মিলেই আমাদের জীবন। সহজকে দিয়ে আমরা রচনা করি আমাদের দৈনন্দিন জীবন, এর ওজন কম বলে, চাকাওয়ালা স্যুটকেসের মতো জীবনের উপর দিয়ে একে তরতরিয়ে টেনে নিতে পারি বলে। কিন্তু জীবনের যে অংশটুকু দুর্মর আর নির্দয় তাকে ঘরের ভেতরে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না বলেই দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় ঘরের বাইরে। বাড়ির বাইরে তাকে রেখে দিই একটা সুন্দর নাম দিয়ে। সে নামটা হল : 'স্বপ্ন'। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে কাম্য অথচ দুর্লভ, আমাদের ক্ষমতা বা বহনের অতীত তাই তো আমাদের স্বপ্ন।

সময়ের হাওয়ায় যৌবনের সহজ সম্পদগুলো একসময় চৈত্রের দুপুরের ধুলোর মতো ঝাঁঝালো হাওয়ায় নীরবে মিলিয়ে যায়। প্রৌঢ়ত্ব আসতে আসতে এরা মোটামুটি হারিয়েই যায় জীবন থেকে। কিন্তু জীবন তবু খালি হয় না। জীবনের যে পরাক্রান্ত জিনিসগুলোকে আমরা রূঢ় আর নির্দয় বলে স্বপ্ন নামে জীবনের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম তারাও ততদিনে দাঁতাল হিংস্রতা খুইয়ে ধীরে ধীরে নিরীহ আর নখরহীন হয়ে এসেছে। এককথায়, সহজ হয়ে এসেছে। তাই তারা জীবনের অরক্ষিত দরজা দিয়ে ঢুকে প্রাক্তন সহজের খালি হওয়া জায়গাগুলো অবলীলায় ভর্তি করে ফেলে।

কিন্তু যৌবনের সবচেয়ে বড় সম্পদটাকে আমরা আর কোনোদিনই ফিরে পাই না। এই সম্পদ হল স্বপ্ন। প্রৌঢ়ত্বের সবচেয়ে বড় নিঃস্বতা এটাই। ধার যন্ত্রণা খুইয়ে সেই স্বপ্ন তখন বাড়ির নিরীহ নিরপরাধ মেয়েটির মতো টেবিলে বসে পড়া তৈরি করছে। সে তখন দৈনন্দিনের জিনিশ হয়ে গেছে। দরজার ওধারে দাঁড়ানো তার এতদিনের জাগ্রত সুন্দর বর্শাগ্র তখন ভাঁড়ারঘরের পাশে নতজানু। যৌবন হারিয়ে আমি ফুল পেয়েছি। কিন্তু যে স্বপ্নের জন্যে মানুষ ফুল খোঁজে সে স্বপ্ন কোথায়! ফুল তো যৌবনের জন্যে তৈরি। যৌবনের সেই যন্ত্রণাময় দাঁতাল আর প্রিয়তম মুহূর্তগুলোর জন্যেই।

তবু এই যে ঘ্রাণের জগৎ, রূপের জগৎ, রঙিন অনুভূতির জগৎ— এরাই কি কিছু কম? দুটো একসঙ্গে হলে হয়ত আরো সুন্দর হত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিতা লেখা যেতে পারত তা দিয়ে। কিন্তু পাতা-ঝরার দেশে এই যে কবন্ধ সুন্দর— এ-ই বা খারাপ কী!

৩১

সাহসী তারা, যারা সামনের গর্তগুলোকে দেখতে পায় না। ভীরু আর সাহসীর মূল প্রভেদ তাই সাহসে নয়, দৃষ্টিক্ষমতায়।

৩২

মোহাম্মদ রফির জোছনান্বিত কণ্ঠের সেই বিমর্ষ গান শ্রাবণরাত্রের স্তিমিত ধারার সঙ্গে ফিরে আসে : 'কভি না কভি, কাঁহি না কাঁহি, কোয়ি না কোয়ি তো আয়েগা/ আপনা মুঝে বানায়েগা... ।'

আজ নয়, কিন্তু— কোনো এক দিন, কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ তো আসবেই, আপন করে আমাকে তো নেবেই...

জীবনে ওই মানুষটি কি কোনোদিন আসে?

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

ওই শূন্য মন্দির কেবলই বড় থেকে বড় হতে হতে একসময় গোটা পৃথিবীটাকে ঢেকে ফেলে।

৩৩

আমার একটা বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে একজন বক্তা সহৃদয় আক্ষেপের সঙ্গে জানালেন, টেলিভিশনে গিয়ে আমি আমার জীবনের মূল্যবান সময়ের অপব্যয় করেছি।

আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই।

রক্তের তাগিদে মানুষ যা করে তার কোনোকিছুই ব্যর্থ নয়।

কেন তা অপচয় হবে? শরীরনির্ভর শিল্প মরে যায়— এজন্যে? শিল্পমূল্যে ছোট— তাই?

কিন্তু আমি কী করতে পারি। আমার ভেতরে আছে যে ব্যাপারটা! সাহিত্যের বা সামাজিক বেদনার মতো একইরকম অত্যাচারীভাবেই যে আছে!

৩৪

আজ কয়েকটা দিন ধরে একটা হতচ্ছাড়া কোকিল আমাদের বাসার চারপাশের গাছগুলোয় ডেকে ডেকে ছাতি ফাটিয়ে ফেলছে। প্রতিবছর দেখছি ধারালো বাসনার মতো ফাল্গুনের হাওয়া বইতে শুরু করলেই রাজ্যের কোকিলগুলো কোথা থেকে এসে যেন এভাবে ডাকতে শুরু করে। কাকে ডাকে তারা? তাদের বসন্তবধির সঙ্গিনীদের? নাছোড়বান্দার মতো এমন ছাতি ফাটিয়ে কেন ডাকে? তাদেরও কি জানা আছে, মানুষের সঙ্গিনীদের মতো তাদের সঙ্গিনীরাও একইরকম অঙ্গীকারবিমুখ? একবার গেলে আর ফেরে না।

কাল...ফোন করেছিল। ওর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে ঠিক তখনই কোকিলটা বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কোকিলের সুর শুনিলে কয়েকটি বিশ্রী কথা মনে পড়িয়া যায়।' মনটা কেমন করে! না, মন নয়, শরীর। শরীরকে মনকে কাঁদিয়ে ডেকে উঠল কোকিলটা। মানব অস্তিত্বের সব শূন্যতা মনে পড়িয়ে দিয়ে ডুকরে উঠতে লাগল। রোদনভরা বসন্তের প্রতীক এই কোকিল।

...জিগ্যেস করল, কোকিল ডাকছে?

বললাম, 'হ্যাঁ!'

মনে পড়ল একদিন ওই কোকিলের মতো আমিও ওকে এইভাবেই ডেকেছি।

৩৫

আমি বুঝি না দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনের সর্বশেষ ছবিকে কেন তাঁদের চিরকালীন প্রতিকৃতি হিসেবে পরিচিত করা হয়।

এটুকু বুঝি : বিখ্যাত মানুষদের কোনো বিশেষ একটা ছবিকে সর্বজনীন করে তোলার দরকার আছে, জনসাধারণের কাছে তাঁদের চেহারার প্রতীক তৈরি করার জন্যে। যদি তাই হয় তবে জীবনের যে পর্বে তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে অজেয় ও যুধ্যমান, প্রতিভা ও অসাধারণত্বের শীর্ষে, সেই পর্বের কোনো একটি ছবিকে তাঁদের সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেই তো তা সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি হয়।

সুদূরের দিকে নিমগ্নভাবে তাকিয়ে-থাকা উদাস চেহারার যে শুভ্রকেশ বৃদ্ধকে আমাদের কাছে আইনস্টাইন বলে তুলে ধরা হচ্ছে, মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটি কি তিনি? তাঁর ভেতরকার অমিত প্রতিভাবান মানুষটি তো এর অনেক আগেই চৈতন্যের অগ্ন্যুদগীরণ শেষ করে নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন। তবে কেন তাঁর জীবনের শীর্ষমুহূর্তের একটি ছবিকে তাঁর সর্বজনীন প্রতিকৃতি হিসেবে পরিচিত করানো হয় না? আমরা ছবিতে তাঁর যে প্রশান্ত সৌম্য রূপটিকে দেখি সে তো সেই অবিস্মরণীয় প্রতিভাবানের সৌন্দর্যস্নিগ্ধ একটি নিরীহ শব মাত্র। জীবনের তুঙ্গ মুহূর্তের আহত ক্রুদ্ধ গর্জমান সিংহ তো সে নয়।

শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের যে মহিমান্বিত কান্তি আমাদের সামনে আজ তাঁর চিরন্তন প্রতিকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তা কি শক্তির উচ্চতম শীর্ষের অগ্ন্যুৎপাতমুখর রবীন্দ্রনাথের ছবি— যিনি গেয়েছিলেন 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'? এ তো সেই মানুষটি যিনি তাঁর নিজেরই ভাষায়, 'রিডাকশন সেলে' উঠেছেন। 'যে কবির ভাঙা গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না।'

বিদ্রোহী নজরুল কি শিশুর মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে-থাকা একজন দন্তহীন অশীতিপর বৃদ্ধ পাগল? যদি না হয়, তবে মৃত্যুর আগের সেই উদ্‌ভ্রান্ত লোল মানুষটিকে নজরুল বলে প্রতিষ্ঠার আয়োজন কেন?

কেন সবার জীবনের শেষ ছবিটিকে— অধঃপতিত মনুষ্যত্বের বেদনাদায়ক পরিণামটিকেই— তাঁদের প্রতীক করে তোলা হয়?

৩৬

আগের যুগে গ্রামের জীবন ছিল ছোট্ট এত্তটুকু জায়গার ভেতর। গ্রাম তখন নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি-জগতের ভেতর মাথা উঁচিয়ে থাকা একেকটা শান্ত নিস্তরঙ্গ আত্মমগ্ন দ্বীপের মতো, তার চারপাশে চাষাবাদ আর পশুপালনের মাঠ, আর ভেতরের খালে আর পুকুরে মাছের পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত। এছাড়া রয়েছে বাড়ির আঙিনায় নিজেদের হাঁস মুরগি আর গৃহপালিত প্রাণীর লালনপালন। গ্রামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে দূরের মেলায় বা উৎসবে যোগ দেবার আগ্রহ রক্তপ্রবাহের ভেতর চাঞ্চল্য জাগালেও সে নিতান্তই ক্ষণকালের আকুতি। জন্ম ও মৃত্যু, উৎসব এবং লোকান্তর সবই গ্রামের গণ্ডিতে। বিচার-আচার সভা সালিসের অবস্থাও তাই।

ছোট্ট গ্রামটায় সবাই সবার পরিচিত আর চেনা, সবাই সবার কাছের। গ্রামের এই আবহমান জগতে পরিচিত মানেই প্রতিবেশী, প্রতিবেশী মানেই আত্মীয়। একেকটা গ্রাম রক্ত-সূত্রে গ্রথিত মানুষদের একেকটা নিটোল পৃথিবী। সেখানে কাউকে নাম ধরে ডাক দিলে সহজেই প্রত্যুত্তর মেলে, যে মানুষ দূরের সেও নাগালের বাইরে নয়। বাড়ির ওপর নুয়ে পড়া গাছের ডাল, শিশিরের শব্দ, মানুষ, ঘরদোর, প্রাণী— সবই চেনা, সবই নিজের জগৎ।

এ যুগের মানুষের জীবন গ্রামের এই ছোট্ট পরিসর থেকে ছাড়া পেয়ে দূর-পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মাইলের সে ব্যবধান। এতে একদিকে সে যেমন বড় হয়েছে তেমনি হয়েছে একা। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ওপর তাই এখন দায়িত্ব পড়েছে সেই দূরকে কাছে, বিশালকে সীমায় এবং অচেনাকে পরিচিত জগতের ভেতর নিয়ে আসার। সাইকেল 'মোটর' 'ট্রেন' 'জাহাজ' 'এরোপ্লেন' 'টেলিগ্রাফ' 'ফ্যাক্স' 'সংবাদপত্র' 'বেতার' 'টেলিভিশন' এবং সবশেষে কম্পিউটার— এসবের অবারিত বিস্তৃতি পৃথিবীর বস্তু আর চেতনার বিপুল বিচিত্র জগৎকে আমাদের সামনে এনে হাজির করছে, সারাটা পৃথিবীকে আমাদের চারপাশের অনুভবগম্য দূরত্বে এনে দাঁড় করাচ্ছে।

আজ পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে দানবীয় বিকাশ তার স্বপ্ন হয়ত শেষ পর্যন্ত এটুকুই : যে ছোট্ট গ্রামটিকে একদিন আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাকে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। বিশাল পৃথিবীকে সেই গ্রামটির ছোট পরিসরে নিয়ে আসা।

৩৭

আমি নৈতিক নই, নান্দনিক। আমার কাছে যা অগ্রহণযোগ্য তা অনৈতিকতা নয়, অসৌন্দর্য।

৩৮

এ বয়সে মৃত্যুকে আর তেমন বেদনাদায়ক মনে হয় না। মৃত্যু তো এখন চেনাই আমাদের! জন্মমুহূর্ত থেকেই তো আমরা মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত।

যাকে আজ আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়, তার নাম জন্ম।

কেবলই মনে হয়, কী করে জন্মালাম এ পৃথিবীতে। কী অভাবিত আর বিস্ময়কর পুরো ব্যাপারটা! কারো সাথে কোনো কথা বা প্রতিশ্রুতি ছিল না, কোনো পূর্বপ্রস্তুতি নেই, কোনো আবেদনপত্র বা সাক্ষাৎকার না, কোনো চেষ্টা না, যোগ্যতা না, অথচ পেয়ে গেলাম! সম্পূর্ণ বিনা প্রার্থনায় বিনা এত্তেলায় স্বর্গ থেকে খসে পড়ল এই অভাবিত মানবজীবন। কী অপরিমেয় আনন্দ-মধুতে ভরা এর প্রতিটি ধূলিকণা! কী সৌভাগ্যবান আমরা!

ভেবে দেখুন, একটা মোটামুটি মাঝারি গোছের চাকরি পেতে হলেও কত অসম্ভব কষ্ট করতে হয় জীবনে। প্রথমে অন্তত বিশটা বছর পড়াশোনা করে করেই প্রায় ছোবড়া হবার জোগাড়। তাতেও হয় না। এরপর শুরু হয় অফিসে অফিসে এ্যাপ্লিকেশন পাঠানোর পর্ব। এর পর আরম্ভ হয় এর চেয়েও নিদারুণ এক অধ্যায়— উদয়াস্ত দুয়ারে দুয়ারে সাক্ষাৎকার দিয়ে প্রাণশক্তির সঙ্গে অন্তত আধা ডজন জুতোর সোল ক্ষইয়ে ফেলার মরশুম। তাতেও কি শিকে ছেড়ে? এরপর শুরু হয় তদ্বিরের পালা। প্রথমে মামা, চাচা, খালু, ফুপার পর্ব; তাতে না হলে মিনিস্টার, ব্যারিস্টার, যাকে যেখানে পাওয়া যায় তাকে দিয়ে ধরপাকড়। এভাবে দীর্ঘদিনের কুরুক্ষেত্র পেরিয়ে হয়ত কোনো সুন্দর সকালে একটা চলনসই চাকরির দেখা মেলে শেষ পর্যন্ত।

ভেবে দেখুন, এসবের তুলনায় কী অনায়াসে পড়ে পাওয়া আমাদের এই অবিশ্বাস্য মানবজন্ম।

রসগোল্লার একটা বড়ভাই আছে, নাম রাজভোগ। একেক সময় মনে হয়, যদি গারো পাহাড়ের মতো অমনি সুবিশাল একটা রাজভোগ থাকত পৃথিবীতে আর একটা ছোট্ট পিঁপড়েকে তার বিপুল রস আর মাধুর্যের ভেতর ছেড়ে দিয়ে বলা হত: খা, যত পারিস খা; এই আনন্দ এই মাধুর্যের সম্ভারকে প্রাণভরে চেটেপুটে স্বাদ মিটিয়ে উপভোগ কর, তবে তার কাছে তা যেমন অনন্ত আনন্দ আর উপভোগ-উপচানো বলে মনে হত, এ জীবনটাও তো আমাদের কাছে তেমনি।

বিনা মূল্যে বিনা দরখাস্তে পেয়ে যাওয়ায় উপেক্ষায় অনাদরে কী অসম্মানই না তাকে আমরা করি!

৩৯

প্রতিদিন যতগুলো কাজে আমরা হাত দিই, তাদের ক'টাই-বা শেষ অব্দি ভণ্ডুল হয়? অফিস, বাজার, রান্নাবান্না, বন্ধুদর্শন, খাওয়া-পরা, কেনাকাটা এমনি যেসব হাজারো দৈনন্দিন কাজ আমাদের করতে হয় তার ক'টাতেই-বা আমরা ব্যর্থ? সবগুলোই তো প্রায় সফল হয়। কদিনই-বা অফিসে যেতে চেষ্টা করে পেরে উঠি না? ক'বেলাই-বা খাওয়া বাদ পড়ে কিংবা উনুনে হাঁড়ি চড়ে না? কটা দিন? সারা বছরে সব মিলে কটি?

আমরা তো করণীয় সব কাজই শেষ অব্দি করে ফেলি। বড় ধরনের দুর্বিপাক না ঘটলে ব্যর্থতা কোথায়? ধরা যাক, দিনে মোট ২৪টি কাজ হাতে নিলাম। ব্যর্থতা আসবে ক'টায়? খুব জোর তিনটি কি চারটিতে। অর্থাৎ ধরতে পারি, ২৪টি কাজে হাত দিলে গোটা বিশেক কাজে আমরা প্রতিদিন সফল হব।

এবার দেখি 'কোনো কাজে সফল' কথাটার মানে কী? মানে একটাই : আনন্দ। যত সাফল্য তত আনন্দ। কাজেই যদি দিনে ২০টি কাজে আমরা সফল হই, তবে বলা যায় আমরা দিনে ২০টি আনন্দের অধিকারী হলাম। এভাবে যদি প্রতিদিন ২০টি আনন্দ জোটে তবে এক মাসে ৬০০ আনন্দের, এক বছরে ৭২০০ আনন্দের, এবং যদি বছর ষাটেক এমনি কাজের মত্ততার ভেতর বেঁচে থাকা য়ায় তবে অন্তত সাড়ে চার লক্ষ আনন্দের এক থৈ থৈ জীবনে ভেসে থাকতে পারি আমরা।

এমন বিপুল অপরিমেয় আনন্দের আস্বাদ যে মানুষ একটা জীবনে পাবে, মৃত্যুতে দুঃখিত হবার তার কি কোনো কারণ আছে?

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে ভরিয়ে রাখা তাই এত জরুরি!

৪০

হাস্যরস এক ধরনের ক্ষমা। অস্তিত্বের স্বার্থে জীবনের নিষ্ঠুর চাবকানিকে প্রাণখোলা হাসিতে ক্ষমা করে নিজেকে বাঁচানো।

৪১

আজ আমেরিকা জাপান এমনকি ইউরোপের কোনো দেশের একজন সাধারণ শ্রমিক যে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে, স্বয়ং সম্রাট শাহজাহানও কি তেমন বৈভবময় জীবন কল্পনা করতে পারতেন? সকালবেলার গড়পড়তা নাশতা হিসেবে

যে অনবদ্য মানের জ্যাম-জেলি-রুটি-মাখন-পনির সে টেবিলে পায়, রেস্তোরাঁ বা হোটেলে সন্ধ্যায়-দুপুরে যে রাজকীয় খাবার তার ভাগ্যে জোটে, যেসব চমৎকার পানপাত্রে অলৌকিক পানীয়ের স্বর্গীয় সুস্বাদ অনুভব করে, যে নরম সুখদ বিছানার রেশমি রাজ্যে ঘুমিয়ে তার অলীক রাত কাটে, টেলিভিশনের রঙিন পর্দায় জীবনের বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যকে সে যেভাবে উপভোগ করে, বিস্ময়কর গতিসম্পন্ন যে সুন্দর ছোট্ট টুকটুকে গাড়িটাতে চড়ে সে ঘুরে বেড়ায়, যে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে সে গাড়ি চলে— সত্যি ভারতের সম্রাট শাহজাহানের স্বপ্নেরও সম্পূর্ণ বাইরে ছিল এইসব অভাবনীয় সৌভাগ্য।

একেকবার ভাবি : কী ভাগ্য আমাদের, আমার যুগের প্রতিটা মানুষের। একে তো এই ছোট গ্রহটাতে জন্মেছিলাম মানুষ হিসেবে, বিশ্বচরাচরের আনন্দলোকের নিমন্ত্রণ পাওয়া শ্রেষ্ঠতম রসভোক্তার ভূমিকায়, তার ওপর জন্মেছিলাম এর সবচেয়ে সম্পন্ন একটা যুগে— মানবসভ্যতার সবচেয়ে বিকশিত, জীবন-উপভোগের সবচেয়ে গরিমাদীপ্ত একটা কালে।

নিজের কথা যখন ভাবি তখন আরো দুটো বাড়তি লাভের কথা মনে আসে। প্রথমটা হল : সোনার চামচ মুখে অপর্যাপ্ত বৈভবের ভেতরে আমি জন্মাইনি। প্রাপ্তি আর প্রাচুর্যের স্থূল আর শ্বাসরুদ্ধকর চাপে বিত্ত তাই আমার কাছে অপ্রিয় বা অর্থহীন হয়ে যায়নি। ঐশ্বর্যকে আমি দেখেছিলাম অক্ষতিকর দূরত্ব থেকে। বৈভব তাই আমার চোখে দেখা দিয়েছিল জ্যোতির্ময় দেবদূতের মহিমায়। বিত্তসম্পদ ছিল না বলে বৈভব আমাকে ছুঁয়ে গেছে, কিন্তু ধরা দেয়নি। বৈভবকে আমি ভালোবেসেছি দূর থেকে, তরুণ প্রেমিকের মতো যন্ত্রণায় আর উৎকণ্ঠায়, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর সোনার হরিণকে খুঁজেছিলেন।

দ্বিতীয় : আজ পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর একজন মানুষ জন্ম নেয় একটি মাত্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নিয়ে— সে সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। ওই উন্নত দেশগুলোর বাইরের প্রতিটি দেশের মানুষেরা, আমার ধারণা, পাশ্চাত্যের মানুষদের তুলনায় এক ডিগ্রি বেশি ভাগ্যবান— তারা জন্মায় দুটো সংস্কৃতির ভেতর। একটা তাদের নিজেদের, অন্যটা পাশ্চাত্যের। যেমন, একালের একজন ভারতীয় হিন্দু বা একজন জাপানি নাগরিক জন্মেছে নিজ-সংস্কৃতির পাশাপাশি আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্যের ভেতর।

কিন্তু আমার মতো এই উপমহাদেশের সেই মুসলমানদের, যাদের জন্ম এবং আশৈশব লালন হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতে, কী অসম্ভব ভাগ্যবান তারা। আমরা জন্মেছি একসঙ্গে তিনটি সংস্কৃতির ভেতর : মুসলমান ছিলাম বলে ইসলামি সংস্কৃতির, ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতির এবং একালের মানুষ হিসেবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির।

৪২

বাড়ি-মাথায়-করা লুনার তিরিক্ষি মেজাজের মুখঝামটা আজো কানে বাজে :

"সব বাড়িতে ছেলেমেয়েরা করে সমস্যা, বাপ-মা তাদের নিয়ে করে টেনশন। আমরা কেমন বাড়িতে জন্মালাম— যেখানে বাপ নিজেই পাকায় সমস্যা আর তাই নিয়ে টেনশন করে মরতে হয় বাকিদের।"

৪৩

সেদিন আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল— পৃথিবীতে একজন মানুষ ভালোবেসে এতগুলো বছর মমতায় আদরে এই মুখটাকে দেখেছে, হয়ত আর বেশিদিন দেখবে না।

৪৪

আমরা সবাই আমাদের স্বপ্নের চেয়ে ছোট।

৪৫

অক্ষম বা শক্তিহীন লেখকেরা, ব্যর্থ বা বিত্তহীন লেখকেরা লিখুক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ বা জর্নাল, চম্পু বা লিমেরিক, গজল বা কাসিদা। হাজার হাজার লিখে ব্যর্থ হোক। ব্যাপারটা অত দুঃখের নয়। কম শ্রমের ছোট লেখা— ব্যর্থ হলেই-বা কী! চেষ্টা করলে আবার লেখা যাবে। আরো ভালো লেখা যাবে। কিন্তু অপারগ বা শক্তিহীন লেখকরা যেন উপন্যাস না লেখে। কঠিন পরিশ্রমে, বিপুল পরিকল্পনায় হাজার হাজার শব্দের দুঃসাধ্য বিশাল ও অভ্রভেদী প্রাসাদ গড়ে তোলার পর তাঁকে যেন শুনতে না হয়— তাঁর সব শ্রম এ পৃথিবীতে বিক্রি হয়েছিল শুধু জলের দামে।

৪৬

মানুষ বৃদ্ধ হলে এসে দাঁড়ায় তার বাবার যৌবনের বিশ্বাসে।

৪৭

ভীরু তারাই, যারা জীবনকে মূল্যবান মনে করে। সাহসী হচ্ছে এর উল্টোরা।

৪৮

সেদিন ঠিকঠাক জরিপ চালাতেই ধরা পড়ল আমাদের খ্যাতিমান লেখকদের ভেতর 'সম্পন্ন' পাঠক আজ কত কম। তাদের মধ্যে যে অল্প কজন ভালো পাঠক

আছেন, তাঁদের মধ্যেও হাতে-গোনা মাত্র দুয়েকজনকেই হয়ত পাওয়া যাবে যাঁরা আমাদের সময়ে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো গুরুত্ব দিয়ে পড়েন। সবার ভাবভঙ্গি প্রায় এরকম : 'আমি লিখব, তোরা পড়বি।' তোমার লেখাও আমি পড়ব— এটা ভাবতেও যেন অনেকের মর্যাদায় বাধে। এই অবস্থা চলতে থাকলে এই সাহিত্য বাঁচবে কী করে? উপেক্ষা আর উদাসীনতার শীতে এর মধ্যেই তো সব মরে এসেছে!

৪৯

আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মানুষই আজ মাস্তান, যে যার জায়গায়।

৫০

বাঙালির অস্তিত্বগত সংকটের কারণে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ এখন ঈশ্বরের আসনে। সবখানেই বন্দনা, সবখানেই আবাহন। রাবীন্দ্রিকতার দাম বড় চড়া এখন। নাম উচ্চারণের আগেই বাজার বসে যায়, মেলা জমে ওঠে। এই তো সময় হে উৎসব পূজারিরা! মরম না জেনে ধরম বাখানোর এই তো সুবর্ণ মওকা! সুশোভন পাঞ্জাবি পরে সুসজ্জিতাদের সাথে মনোরম রাবীন্দ্রিক সন্ধ্যা উদযাপনে তোমাদের বেরিয়ে পড়ার মাহেন্দ্রক্ষণ!

৫১

আজও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংগঠনের নাম 'ব্যক্তি'।

৫২

গল্পে, উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠুররকমে বাস্তববাদী। জীবন ঠিক যেমন, হুবহু তেমনিভাবে জীবনকে তিনি এঁকেছেন; স্বপ্নের আবির মাখাতে গিয়ে তাকে কোথাও এদিক-ওদিক করেননি। এজন্যেই গল্পে তিনি এত বড়। ওই নির্মোহ নিষ্ঠুরতাটুকুর জন্যেই বড়। তাঁর উপন্যাসগুলোর শ্রেষ্ঠত্বও একই কারণে। এগুলোতেও আমরা জীবনের সৎ ও রক্তাক্ত মুখাবয়ব দেখতে পাই। আদর্শ বা স্বপ্নের মোহে সত্যকে তিনি অপমান করেননি। তাঁর লেখায় প্রেম, লোভ, নীচতা, দাম্পত্য, প্রকৃতি কিংবা মানুষ আসলে হুবহু প্রেম, লোভ, নীচতা, দাম্পত্য, প্রকৃতি বা মানুষেরই মতো। *শেষের কবিতা*-র অপার্থিব প্রেম কলকাতা শহরের কুৎসিত বাস্তব পরিবেশে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, তাই শিলং পাহাড়ের শিখরছোঁয়া অভ্রভেদী প্রকৃতির জগতে, স্বর্গের কিনারায় তিনি সেই

অবিশ্বাস্য প্রেমের বাসর রচনা করেছিলেন। কিন্তু *গোরা* উপন্যাসে, খুব হিসেব করেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত শহর কলকাতার এক অস্বস্ত কালপর্বকে।

শেষের কবিতা-র কথাই ধরা যাক। কেন লিখেছিলেন তিনি বইটি? আমার ধারণা, মোটাদাগে বলতে গেলে, এটি লিখেছেন তিনি বহুচারিতার সমর্থনে। কী বক্তব্য বইটার? বক্তব্য : মানুষ বহুচারী। পুরুষ নারী উভয়েই। বিবাহ আরোপিত প্রথা। এর সীমানা সংকীর্ণ বলে তা মানুষের মৌল স্বভাবকে নিগ্রহ করে। মানুষের ভেতরকার অবারিত চাওয়াকে তা তৃপ্ত করতে পারে না। এজন্যে দাম্পত্যজীবনের স্বামী বা স্ত্রীর বাইরে বিবাহ-বহির্ভূত সঙ্গী বা সঙ্গিনী তার জীবনে অপরিহার্য, বাস্তব জীবনে না হলেও মনোজগতে। ঘরের ভেতরের 'ঘড়ায় তোলা জলে'র মতো দূরের দিঘির অবারিত সাঁতার— এ দুইয়ের কোনোটা না হলেই সে বাঁচে না। এ কেবল পুরুষের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়, নারীর ব্যাপারেও। এ কথা ঠিক যে, প্রকৃতিরাজ্যে নারী জীবজাগতিক ধারাকে বহন করে বলে তার ভেতর কেন্দ্রানুগ শক্তির সক্রিয়তা বেশি, কিন্তু তার মধ্যেও বহুচারিতার স্বপ্ন পুরুষের মতো প্রায় একইভাবে সজীব। এমনকি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাজার হাজার বছরের স্টিম-রোলারও তার এই স্বপ্নকে খুব একটা মেরে ফেলতে পারেনি। এজন্যে *শেষের কবিতায়* রবীন্দ্রনাথ কেবল অমিত রায়কেই ঘড়ার জল আর দূরের দিঘির অবাধ সাঁতারের ব্যবস্থা দেননি, দিয়েছেন লাবণ্যকেও। অমিতকে ঘড়ার জল হিসেবে দিয়েছেন কেটিকে আর দূরের দিঘি হিসেবে লাবণ্যকে; অমিতের মতো লাবণ্যকেও ঘড়ার জল হিসেবে দিয়েছেন শোভনলালকে আর দূরের দিঘি হিসেবে অমিতকে।

৫৩

সারাজীবন প্রার্থনা ছিল : জীবন যেন সুখের হয়। আজ সেই প্রার্থনা মৃত্যুর জন্যে।

৫৪

মৃত্যুর সামনে এসে মানুষ জীবনের প্রাপ্তিগুলোকে ভুলে যায়।

৫৫

চিন্তাক্ষেত্রে আমি যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি না কেন, সময়ের স্রোত আমাকে পেছনের দিকে ভাসিয়ে নিচ্ছেই। যৌবনে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যদি

আজও ঠিক সেখানেই থাকতাম তবে বার্ধক্য আসার আগেই ওই স্রোত পেছনে ঠেলে আমাকে প্রতিক্রিয়াশীলতার কাছে নিয়ে যেত। ওই স্রোত যে গতিতে আমাকে পেছনে ঠেলছে, যদি তার সমান গতিতে আমি সামনের দিকে এগোতে পারি তবেই কেবল আমি আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি বুড়ো বয়সেও সেখানে থাকতে পারব। কালের স্রোত যে গতিতে আমাকে পেছনে ঠেলছে, তার চেয়ে যে পরিমাণ বেশি গতিতে আমার চিন্তাজগৎ সামনের দিকে এগোবে বার্ধক্য বা যৌবনের তুলনায় আমি সেই অনুপাতে থাকব প্রগতিশীল।

এককালের অনেক প্রগতিশীল মানুষকে দেখেছি, যৌবনে চিন্তাভাবনার যে অগ্রসর জায়গায় তাঁরা ছিলেন, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কঠোর সততার সাথে সেই অবস্থানকে আঁকড়ে রেখেছেন। এতে তাঁদের অবিচল বিশ্বাস প্রমাণিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এককালের সেই অভিনন্দিত প্রগতিশীল মানুষটি কখন যে সভ্যতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলতার উচ্ছিষ্ট প্রেতাত্মায় পরিণত হয়েছেন তা তিনি নিজেও হয়ত বুঝতে পারেননি।

৫৬

অবৈষয়িক মানুষই প্রকৃত ধার্মিক মানুষ। জীবনের মতো ধর্মের কাছেও এদের আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তি নয়, প্রেম।

৫৭

'মেধাবী' পার্বতীরাই কেবল 'বৃদ্ধ' শিবের গলায় মালা দিতে পারে।

৫৮

আমার ছেলেবেলায় এদেশ ভরা ছিল গরিব মানুষে। আজ ভিখিরিতে।

৫৯

বৈষয়িকতা আর ধার্মিকতা দুটোই ইন্দ্রিয়জাগতিক জিনিশ। একটা ইহকালের, একটা পরকালের।

৬০

ওরা আমার তুলনায় 'জনপ্রিয়' বেশি, আমি 'প্রিয়' বেশি।

অনেকদিন আগে কোনো এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে একজন বিদেশি গায়ক— সম্ভবত পূর্ব ইউরোপীয় কোনো দেশের— আমাদের গোটাকয় রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছিলেন। ভদ্রলোক যেমন বলিষ্ঠ তেমনি প্রাণবন্ত। হাতের গিটারের সাংগীতিক প্রজ্বলনের সঙ্গে নেচে, আনন্দ আর শক্তিমত্তায় বিচ্ছুরিত হয়ে আত্মবিস্মৃতের মতো গান করছিলেন তিনি। তাঁর গানগুলোর ভেতর সংগীতের সর্বোচ্চ ও অনুপম রূপটি যেন মূর্ত হয়ে উঠছিল। উদ্দাম আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছিল তাঁর ছন্দোময় অবয়ব। শরীরকে নানান ক্লিষ্ট-মধুর ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে, কখনো মাটির সাথে নুইয়ে দিয়ে, কখনো পেছন দিকে ধনুকের মতো টানটান করে বাঁকিয়ে, কখনো গিটারের সাথে চিবুক এবং বেদনাকে একাত্ম করে, সংগীতের প্রতিটা সূক্ষ্ম মধুর অস্ফুট অভিঘাতকে হৃদয়ে অনুভব করে করে তিনি গান করছিলেন। সংগীতের অগ্নিময় প্রজ্বলনের সেই ঐশ্বরিক দৃশ্য আজও ভুলতে পারি না। মনে হচ্ছিল তাঁর গাওয়া প্রতিটা গানের অনির্বচনীয় সাংগীতিক প্রাণনা যেন তাঁর শরীর-মনের পরতে পরতে আগুন লাগিয়ে রক্তিম বেদনা ঠিকরে দিচ্ছে।

ছেলেবেলা থেকে বহু গায়কের গলায় রবীন্দ্রসংগীত শুনতে আমরা অভ্যস্ত। অধিকাংশই নিষ্প্রাণ, নীরক্ত। জীবনের শক্তিতে বলীয়ান এই ভদ্রলোকের গানগুলো ছিল সেসবের একেবারে উল্টো। তাঁর রবীন্দ্রসংগীতের ভেতর সংগীতৈশ্বর্যের লেলিহান বহ্নিকে যেন চোখের সামনে তালে তালে নেচে উঠতে দেখছিলাম। রবীন্দ্রনাথের রক্তধারায় যে জীবনাগ্রহ বহ্নিমান ছিল তাঁর সংগীতের পরতে পরতেও তা যেন জীবন্ত হয়ে উঠছিল। সেই শক্তিকে ধারণ করার মতো যোগ্য মানুষ এসে দাঁড়ালেই সেই আগুন আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের নির্জীব প্রাণহীনতার ভেতর তাঁর সেই ঐশ্বর্য আমাদের চেতনায় ধরা দেয় না।

আমার মনে হয়, আমাদের চারপাশে রবীন্দ্রসংগীতের প্রায় কোনো গায়কই ওই সংগীতের অদম্য প্রাণশক্তিকে ধারণ করতে পারেন না। আমাদের অক্ষমতা আর অযোগ্যতা দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রাণহীন আর নির্জীব করে তাঁকে প্রতিনিয়ত যেন খুন করছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বিমর্ষ নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে রবীন্দ্রসংগীত গায় তখন ছেলেগুলোকে অধিকাংশ সময় মনে হয় মেয়ে, মেয়েগুলোকে বিধবা। তাদের অক্ষম জীবন্মৃত রক্তকণিকায় রবীন্দ্রবহ্নি কোনো ঐশ্বরিক অগ্নিকাণ্ড ঘটায় না।

রবীন্দ্রনাথকে কী করে আমরা বাঁচাব? রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর সমৃদ্ধ জীবনশক্তিকে আহরণের পক্ষে অযোগ্য একটা জাতির ভেতর তিনি জন্মেছিলেন। এত উদ্দাম উচ্ছ্রিত প্রাণশক্তি নিয়েও এই জাতির কাছে তাই তিনি প্রায় অপরিচিতই

রয়ে গেলেন। তাঁর জ্বলন্ত জীবনকে ধারণের পক্ষে অক্ষম জাতি তাঁকে দেবতার সম্মানে অভিষিক্ত করে, জীবন থেকে দূরে সরিয়ে, তাঁর শক্তিমান উত্তরাধিকারের অপ্রীতিকর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণের পথ বের করে নিয়েছে।

৬২

আজ থেকে পঁচিশ বছর পর ঢাকায় সারাদেশের রাষ্ট্রীয় দস্যুদের এক মহাসম্মেলন হবে। নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ওই লুণ্ঠনকারীরা সেই সম্মেলনে এক মহতী প্রস্তাব পাশ করবে। তারা সিদ্ধান্ত নেবে: 'আজ থেকে দেশে সবরকমের দস্যুতা (ব্যক্তিগত, দলীয় বা রাষ্ট্রীয়) সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।' কেবল নিষিদ্ধ নয়, ওই নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ অলঙ্ঘনীয়। এটা তারা করবে এজন্যে যে, আজকের এই বল্গাহীন দস্যুতাকে এভাবে চলতে দেওয়া হলে সেদিন যা সর্বপ্রথম আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হবে তা হল অবাধ দস্যুতার পথে গড়ে তোলা তাদেরই এতকালের বিত্ত ও সম্পদের অবৈধ পর্বত। তাই নিজেদের লুণ্ঠনের মাধ্যমে গড়ে তোলা ধন-সম্পদ বাঁচানোর জন্যে বর্তমান লুণ্ঠনের ইতি টানার ব্যবস্থা করবে তারা।

অর্থাৎ জাতীয় দস্যুদের স্বার্থরক্ষার জন্যে তাদের অজান্তেই হয়ত আমাদের সমাজে সূচনা ঘটবে ন্যায়ের শাসনের।

আজ জাতির ভাগ্যবিধাতারাই যেখানে বিবেকবর্জিত দস্যু, সেখানে এই মুহূর্তে ন্যায়ের শাসন কী করে সম্ভব?

৬৩

কিছুদিন থেকেই টের পাচ্ছি, ধীরে ধীরে 'ম' আর 'সা' দুজন একটু একটু করে দুজনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। 'কেন্দ্রে' কোথাও একজনকে দেখতে পেলাম কি মুহূর্তে অন্যজন এসে হাজির।

কী করে জ্যৈষ্ঠের মৌমাছির মতন একে অন্যের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়!

অন্যদের ব্যঙ্গ, সমালোচনা, ভ্রুকুটি, চাউনি অনায়াসে উপেক্ষা করে এক অপার্থিব খুশির জগতে দেবশিশুর মতো ওরা সারাক্ষণ বেঁচে থাকে...।

আজ রাত্রে গাড়িতে আমার সঙ্গে বাসায় ফিরল 'সা'। কিছুক্ষণ আগেও আমতলায় বসে ওরা বিভোরভাবে কথা বলছিল। সেই খুশির আলো তখনো ওর মুখের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, কোনো এক অপরিমেয় স্বপ্নের দিকে যেন তাকিয়ে আছে ও।

অপার খুশির ভেতর ডুবে গিয়ে গুনগুন করছিল 'সা'। একসময় আনমনে গাড়ির বৃষ্টিভেজা কাচের ওপর অকারণে আঙুল বোলাতে লাগল, যেন স্বপ্নের রুমালে ফুলের ছবি আঁকছে। হঠাৎ বাইরের দিকে ইশারা করে পেছনের সিটে-বসা 'ল'কে বলল : দেখেছ কী আলো ওদিকটায়! মনে হচ্ছে যেন ভোর হচ্ছে।

'ল' মনে করিয়ে দিল, ওটা ভোর নয়, গলফ মাঠের আলো। রোজ সন্ধ্যায় জায়গাটাকে এমনটাই দেখায়।

সবার মধ্যে এমনি সব ছোট ছোট কথা চলছিল থেকে থেকে।

এমন সময় হঠাৎ অনেক দূরের আলোকিত এয়ারপোর্টটার দিকে তাকিয়ে ঠিক আগের মতোই 'সা' বলল : কী আলো ওদিকটায় না! মনে হয় যেন ভোর হয়ে গেছে।

'সা' আজকাল রাতের বেলাতেও কেবলই ভোর দেখতে পাচ্ছে।

মনে পড়ল, একদিন আমিও এমনি দেখতাম। এখন রাত মানে কেবলই রাত। ঘুটঘুটে, পাথরের মতো আর নিকষ কালো।

৬৪

আজ একটা অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি। চিঠিটার বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায়, পত্রলেখক আমার একজন একনিষ্ঠ টিভিভক্ত। আমার 'বিস্রস্ত জর্নাল' উপন্যাসটা (?) হাতে পেয়ে গভীর আগ্রহে পড়তে বসেছিল সে। কিন্তু প্রতিটি জর্নালকে একটা অধ্যায় হিসেবে ধরে নেওয়ায় উপন্যাসের মূল কাহিনীটি প্রাণপণে খুঁজেও বের করতে পারেনি। আমার কাছে তাই তার সনির্বন্ধ অনুরোধ যেন উপন্যাসের কাহিনীটা সংক্ষেপে তাকে লিখে জানাই, যাতে বাকি শক্তি ব্যয় করে সে এই অসাধারণ(?) উপন্যাসের পুরো মর্ম বুঝে নিতে পারে। চিঠির শেষে মৃদু অনুযোগের সুরে আমাকে উপদেশ দিয়ে লিখেছে : এই মূর্খ দেশে এমন 'উপন্যাস' লেখাই-বা কেন, যা এত 'খটকা করে' বুঝতে হয়?

চিঠিটা একজন শুভানুধ্যায়ীকে পড়ে শুনিয়ে বললাম 'জর্নাল'কে উপন্যাস ধরে নেওয়ায় কী বিপদেই না পড়েছে বেচারা! শুভানুধ্যায়ী বললেন, কেন, উপন্যাস হতে যাবে কেন ওটা? চোখে দেখলেই তো বোঝা যায় ওগুলো গল্প। প্রত্যেকটার ওপরে নিচে নম্বর তারিখ সবই তো দেওয়া আছে!

৬৫

শুনেছি ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁকে একবার প্রধান অতিথি করে শিশুদের উচ্চাঙ্গসংগীতের এক জবরজং প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে

শিশুদের দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কালোয়াতি করতে দেখে ওস্তাদজির মনে নাকি খুব চোট লেগেছিল। প্রধান অতিথির ভাষণে ধরা-গলায় বলেছিলেন : দেখিয়ে, বাচ্চে লোগ বড়ি পেয়ারি চিজ হ্যায়। শিশুরা বড় আদরের জিনিস। বুলবুলির মতন ইচ্ছায় আনন্দে গান গেয়ে ওরা আমাদের মন জুড়িয়ে দেবে। কিন্তু বড় মানুষদের মতো হারজিতের দৌড়ে ওদের কেন এভাবে ঠেলে দিলেন যাতে এমন সুন্দর শিশুদেরও কুৎসিত দেখাচ্ছে।

আমাদের টেলিভিশনেও প্রতিবছর জাতীয় ভিত্তিতে শিশুদের এমনি একটা আলিশান প্রতিযোগিতা হয়। নাম 'নতুন কুঁড়ি'। এর কাজ হল দেশজুড়ে নানান ধরনের গান, নাচ, নাটক, গল্পবলা, কবিতা আবৃত্তি এসবের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে দেশের শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পীদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করা। কিন্তু প্রশ্ন হল : শিশু তো শিশুই। শিশুর আবার শ্রেষ্ঠত্ব কী? 'সফল শিশু' বলে পৃথিবীতে তো কিছু নেই। জয়-পরাজয়, সাফল্য-শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, মহত্ত্ব, পূর্ণতা— এসব তো বড়দের জগতের ব্যাপার। শিশুদের জীবনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্যই হল : তারা অসম্পূর্ণ। চারপাশের কোনোকিছুকেই তারা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না, স্পষ্ট করে দেখে না। এই আধো-দেখা, আধো না-দেখার অসহায়তা দিয়েই ওরা আমাদের জয় করে নেয়। ওদের এই অসহায়তাটুকুর জন্যেই বুকের ভেতর জড়িয়ে রেখে ওদের আমরা বাঁচাতে চাই। বড় আর সমর্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জন্যে আমাদের এই বাৎসল্য-আবেগের পতন ঘটে।

শিশুর দেখার-জগৎ বোঝার-জগৎ দুই-ই অসম্পূর্ণ। পুরো সে কিছুই দেখে না বা বোঝে না। কোনো জিনিসের যে-জায়গাটি তার কাছে সবচেয়ে অভূতপূর্ব, রঙচঙে বা বিস্ময়কর লাগে তার ভেতরেই সে তার মনোযোগের ছোট্ট পুঁজিটুকু পুরোপুরি বিনিয়োগ করে বসে। এটা সে এতটাই করে যে, জিনিসটির বাকি আর সবকিছু তার চেতনা থেকে হারিয়ে যায়। 'পথের পাঁচালী'তে বনের ভেতর জীবনে প্রথমবার খরগোশ দেখার মুহূর্তে অপু খরগোশের শরীরের তুলনায় অসঙ্গতরকমে বড় কানদুটো দেখে হতবাক হয়েছিল। বাকহীন বিস্ময়ে বাবাকে বার বার জিগ্যেস করেছিল : 'কী গেল বাবা, ওই যে বড় বড় কান।'— কানদুটোই তার কাছে পুরো খরগোশ হয়ে উঠেছিল।

খণ্ডিত ব্যাপারকে শিশুরা পুরো জিনিস বলে ভুল করে। একটা উদাহরণ দিই। ধরা যাক, একজন শিশু দেখতে পেল একজন কার্ডিগান-পরা ভদ্রমহিলা এগিয়ে আসছেন, তাঁর কার্ডিগানের লালরঙের বড় বড় বোতামগুলো তাদের তীব্র রক্তিমতা নিয়ে চোখের সামনে ধকধক করছে। তখন ওই লাল বোতামগুলো শিশুটির কল্পনাকে এতটাই উদ্দীপ্ত করে ফেলবে যে এরপর ওই শিশুটিকে যদি কেউ সেই ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে জিগ্যেস করে তবে সে হয়ত প্রথমেই বলে উঠবে : 'কে, ওই যে

লাল লাল বোতাম!' যদি তাকে কখনো ওই মহিলার একটি ছবি আঁকতে বলা হয় তবে সে কী করবে? হয়ত সরু সরু হাত-পাওয়ালা একজন মহিলাকেই সে আঁকবে— যার সঙ্গে ওই বর্ষীয়সী স্থূলাঙ্গী মহিলার কোনো বাস্তব মিলই থাকবে না। যাই-তাই করে কার্ডিগানের মতন কিছু একটা তার গায়ে চাপাবার চেষ্টাও হয়ত করবে সে। কিন্তু বোতাম আঁকার সময় সে করবে তার স্বপ্নকল্পনার সবচেয়ে সমৃদ্ধ কাজটি। রক্তের মতো তাজা লাল রং দিয়ে ছবিটার মাঝবরাবর চারটা ইয়া বড় লাল বোতাম এঁকে দেবে— সেগুলোর লাল ছোপ এতটাই জ্বলজ্বলে যে, সেসবের আড়ালে গোটা মহিলাটিই হয়ত ঢাকা পড়ে যাবে। তার ছবিতে লাল বোতামগুলোই ওই মহিলা হয়ে উঠবে। সবকিছু অবিকল রেখে বাস্তব পৃথিবীর যথাযথ ছবি শিশুরা আঁকতে পারে না। তাই নিখুঁত কোনো কিছু আঁকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ওটা পারে বড়রা। সবকিছু পুরোপুরি দেখতে পায় বলে পারে।

এই জন্যেই শিশুর পৃথিবী কেবল অসম্পূর্ণ নয়, খুবই গোলমেলে। রঙের ব্যবহারে, পরিপ্রেক্ষিতের ধারণায়, বস্তু বা দৃশ্যের বিন্যাসে অবাস্তব আর উদ্ভট। ছোট সেখানে বড়কে ডিঙিয়ে যায়, বড় কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে তার খবর পাওয়া যায় না।

যে শিশু এমন অবিকশিত, কাঁচা আর ভুলে-ভরা— অসম্পূর্ণ বলেই অনবদ্য, অসহায় বলেই আদরণীয়, সে কী করে শিল্পের সম্পূর্ণ ভুবনকে উপহার দেবে?

তবু শিশুদের কেউ কেউ যে তা করছে না তা নয়, না হলে ফি-বছর আমরা এত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া 'শ্রেষ্ঠ' শিশুশিল্পী পাচ্ছি কী করে। এখন প্রশ্ন : এই সফল শিশুরা আসলে কারা?

এক ধরনের শিশু আছে যারা গড়পড়তা শিশুদের চেয়ে মানসিকভাবে এগোনো। বয়সের দিক থেকে বা দেখতে শুনতে এরা শিশু হলেও মস্তিষ্কগতভাবে পরিণত মানুষ। দশবছর বয়সে এদের মানসিক বয়স হয়ে পড়ে পঁচিশ বা তিরিশ বছরের মতো। আর হয় বলেই একজন স্বাভাবিক শিশুর অপরিণতি, ভুল, অসহায়তা উতরে পরিণত মানুষের সুসম্পূর্ণ পৃথিবী এরা তৈরি করতে পারে। আমাদের নতুন কুঁড়ির ব্যবস্থাপকেরা, এদের এইসব শিশুত্ববিরোধী ব্যাপারটাকে শিশুর সর্বোচ্চ সাফল্য ধরে ভুল করে তাদেরকেই জাতীয় পুরস্কার দেন। এজন্যে পরবর্তী জীবনে এককালের এই 'শ্রেষ্ঠ' শিশুশিল্পীরা কখনোই প্রায় উচ্চতর সাফল্য দেখাতে পারে না। কীভাবে দেখাবে? শিশুবয়সে অস্বাভাবিক এগিয়ে থাকা এই শিশুরা নিজেদের এই অগ্রসরতার খেসারত দেয় বেশ বেদনাদায়কভাবে। যখন তাদের বয়স আট তখন তাদের মানসিক বয়স যদি তিরিশ হয়ে থাকে, তবে যখন তাদের বয়স চল্লিশ হবে তখন বুদ্ধি আর অনুভূতিগতভাবে তারা তো হবে একশো উনষাট বছরের বৃদ্ধ। এই নির্বীজ বার্ধক্য দিয়ে কী করে শিল্পের রক্তিম ভুবন উপহার দেবে তারা?

সফল শিশুর ছদ্মাবরণে কিছু অকালবৃদ্ধকে প্রতিবছর শিশু হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে এদেশে। এটা চালু না-রাখলেই কি নয়! দেশের প্রকৃত শিশুত্ব প্রতিবছর এদের উপেক্ষার নিচে অবহেলায় অসম্মানে মরে যাচ্ছে যে!

৬৬

যার দানের কথা অন্যে জানে, সে দেয় না, নেয়।

৬৭

সিদ্ধান্ত 'নিরঙ্কুশ ভালো'র পক্ষে নেওয়া হয় না, নেওয়া হয় 'তুলনামূলক ভালো'র পক্ষে।

৬৮

অসম্পূর্ণ মানুষ অমানুষ নয়, বানর।

৬৯

পাওয়া দু-রকম— পাওয়া ও না-পাওয়া।

৭০

মৃত্যু দরজার ওধারে ঘোরাফেরা করছে। কতটা মর্যাদার সঙ্গে একে মোকাবেলা করা যাবে, এটাই এখন দেখার বিষয়।

৭১

জনপ্রিয় হতে গেলে প্রতিভা লাগে। প্রিয় হতে গেলে প্রেম।

তৃতীয় পর্ব

[২০০২-২০০৪]

১

দুর্দিনে টিকে থাকা সুদিনে বিপ্লব করার সমান।

২

কবিতা হল সংকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে সুচতুর নৃত্যপটীয়সীর অলৌকিক নূপুর-নিক্কণ, গদ্য পেশিবহুল দৌড়বীরের দীর্ঘমেয়াদি ম্যারাথন।

৩

একেবারে পাপ না-থাকা পুণ্য না-থাকারই শামিল।

৪

প্রকৃত 'গুরু' তিনিই, যাকে মানার দরকার হয় না।

৫

নাস্তিক হল নিজের প্রচারিত ধর্মের স্বঘোষিত নবী এবং তার নিজ নবীত্বের একমাত্র উম্মত।

৬

ধ্যান শান্তি নয়, জাগরণ।

৭

"দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি, আগের মতো গোলাপ ফুল
কথায় সুরে ফুল ফোটাতাম, হয় না এখন আর সে ভুল।"

নজরুলের এই গানটা মনে হলে মনটা আজকাল ধরে আসে। আগের সে-ভুলগুলো আর নেই। একদিন যার ওপর চোখের দৃষ্টি ফেলেছি সে গোলাপ

হয়ে ফুটে উঠেছে। যার জন্যে চোখের পানি ঝরেছে সে রাজকন্যা। এখন সবই ধূ ধূ বালিয়াড়ি। মনের কথাগুলো একদিন নীল আকাশ-জুড়ে শরৎ-মেঘের মতো আনাগোনা করেছে, শব্দের আঁকশিতে তাদের পেড়ে রাখা হয়নি। আর কি তারা ফিরবে? সেই পিপাসা আর নেই। সেই দুঃখ-বেদনাগুলোও না। পাপও আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। যার পাপ গেছে তার আছেটা কী?

৮

সেদিন সার্ক-দেশগুলোর লেখকরা এসেছিলেন কেন্দ্রে। আসরটি আয়োজন করেছিল সাজ্জাদ শরীফ। এতগুলো দেশ আর ভাষার লেখকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল হৃদয়ের বন্ধুদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। কত আলাদা ভাষার, আলাদা চেহারার মানুষ, তবু কত কাছাকাছি। ভাবনায় অনুভূতিতে যেন কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিদিন যেসব মানুষের প্রিয় বা অপ্রিয় সঙ্গ সহ্য করে বেঁচে থাকতে হয় তাদের চেয়ে আত্মিকভাবে আমাদের কত কাছের এই অপরিচিত মানুষগুলো। বেশকিছু চাঁদে-পাওয়া জন্মান্ধ মানুষ ছিল দলের মধ্যে। এদের কেউ নামকরা কবি, কেউ গল্পকার, কেউ বিদগ্ধ পাঠক, কেউ সমালোচক। প্রতিভাপ্রাণিত মশালের মতো কেউ কেউ। তাঁদের প্রাণের উত্তাপে আর প্রতিভার আলোয় আমাদের ছোট মিলনায়তনটা যেন জ্বলে উঠল। আমাদের এই ঘরটার এমন উজ্জ্বল চেহারা আর কোনোদিন দেখিনি।

এই প্রাণময় পরিবেশটি যাঁর ভেতর সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অনুপমভাবে প্রদীপিত হচ্ছিল তিনি অজিত কাউর— এক বর্ষীয়সী পাঞ্জাবি গৃহবধূ— এই মিলনমেলার মূল উদ্যোক্তা। যেন পুরো মাতৃমূর্তি, মমতার লক্ষ হাতে দলটাকে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। আমাদের কয়েকজন তরুণ কবি নিজ নিজ কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনাচ্ছিল তাঁদের। কারো অনুবাদে কোথাও এতটুকু দীপ্তি দেখলে সবাই প্রশংসায় এমনভাবে মুখর হয়ে উঠেছিলেন যে মনে হচ্ছিল সবাই মিলে একটা বড় আকারের বীণার মতো বেজে উঠছেন। আমরা কেন এমন উদার হতে পারি না?

নানা দেশের প্রতিভান্বিত মানুষদের এমন সৌহার্দ্য মাঝে মাঝে খুবই দরকার— দূরের সুহৃদদের চেনার জন্যে, অবিশ্বাস আর অপরিচয় দূর করার জন্যে। কেন্দ্রে কি আমরা এসব আয়োজন করতে পারি না?

৯

যে মেয়ের যত বদনাম, তার তত ভালো বিয়ে।

১০

আমাদের চৈতন্যের ঠিক সমমানের উঁচু বা নিচু জীবন পৃথিবীতে আমরা যাপন করি।

১১

জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রদ্ধার বোঝা বইতে হয় বেশি।

১২

কে আমাদের একশ দিন রসগোল্লা খাইয়েছিল তাকে আমরা ভুলে যাই। কিন্তু কে কবে একবার কান মুচড়ে দিয়েছিল তাকে আজীবন মনে রাখি।

১৩

মৃত্যু, জন্মের মতোই, জীবনেরই একটি ঘটনা।

১৪

অপ্রত্যাশিত মানুষই কি আসলে অপরিচিত মানুষ?

১৫

যখন ফুলের ঝরে যাওয়া শেষ হল তখনই তো মালা গাঁথার সময়।

১৬

দৈহিক উপভোগ কি শারীরিক সৌন্দর্যের প্রশংসা?

১৭

দলীয় কর্মীদের পুণ্যের ওপর আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর তবু কিছু নিয়ন্ত্রণ আছে, তাদের পাপের ওপর একেবারেই না।

১৮

নাতি-নাতনিদের নির্দয় উপদ্রবই আজ এই বয়সের একমাত্র আনন্দ।

১৯

আমি নিজে গাড়ি চালাই। চালাবার সময় একটা কথা খুব করে মনে রাখি : এই রাস্তায় পথচারী আছে, রিকশা আছে, ভ্যান আছে— ঠেলাগাড়ি, সাইকেল, মোটর সাইকেল, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, ডবল-ডেকার আছে— এদের সবার চলে যাবার পর যদি রাস্তার কোথাও কোনো জায়গা থাকে সেটুকুই কেবল আমার। আমি যদি এই বলে গোল বাধাই : আমার গাড়ির গতি বেশি, কেন আমি আগে যেতে পারব না, এ আমার মৌলিক অধিকার— তাহলে অযথাই আমি ক্ষিপ্ত হতে থাকব। উচ্চ রক্তচাপে ছিঁড়ে যাব। আমার গাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আজকের বাংলাদেশে শান্তিতে বা সুস্থমতে দীর্ঘ আয়ু নিয়ে বাঁচার উপায় একটাই : ঋষিত্ব অর্জন। এ না হলে মানসিকভাবে অসুস্থ হতে হবে। এদেশে আজ সুখ আর পরিতৃপ্ত জীবন নিয়ে বাঁচতে হলে কামহীন, ক্ষুধাহীন 'অজর অক্ষর' হতে হবে। হতে হবে 'জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ'। হতে হবে অশীতিপরের মতো নিষ্কাম, বাহাত্তুরের মতো বিমূঢ়। জীবনের কোনো উত্তাপ থাকলে ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই।

২০

যুবকদেরও যদি ভালোবাসা দেবার কেউ না থাকত তবে তাদের নামও হত বৃদ্ধ।

২১

সাহসীরা জীবনের মর্যাদাকে মূল্য দেয়; ভীরুরা এর পরিসরকে।

২২

মানুষের শ্রেষ্ঠ সাফল্য কোনোকিছু 'সম্পূর্ণভাবে' করায় নয়, 'সাধ্যমতো' করায়।

২৩

একদিন কাজ করেছি যে-আমি বেঁচে আছি তার জন্যে, এখন কাজ করছি যে-আমি থাকব না, তার জন্যে।

২৪

একটা অদ্ভুত গল্প শুনলাম সেদিন। গল্পটা এরকম : পথে অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল এক যুবকের। মেয়েটিকে দেখেই যুবক তাকে

ভালোবেসে ফেলল। তাকে পাবার জন্যে সে পুরো উতলা। মেয়েটিরও ছেলেটিকে অপছন্দ নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে বিয়েতে কিছু অসুবিধা আছে। মেয়েটি তার বাবার সঙ্গে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছে। সে দেশ এখান থেকে সাত সমুদ্রের ওপারে। যাবার সময় মেয়েটি ছেলেটিকে কথা দিয়ে গেল, যদি সে সাত সমুদ্র পার হয়ে তাদের দেশে আসতে পারে তবে তাকে সে বিয়ে করবে।

ছেলেটি প্রেমিকার দেশে যাবার প্রস্তুতি নিল। প্রথমে সে হাজির হল প্রথম সমুদ্রের ধারে। সেখানে দেখা পেল এক খেয়ামাঝির। সে-ই পারবে তাকে নৌকায় করে সমুদ্রের অন্য পারে পৌঁছে দিতে।

খেয়ামাঝিকে সে মিনতি করল তাকে সমুদ্র পার করে দিতে। মাঝি উত্তরে জানাল, অনায়াসেই তা সে পারবে। তবে তা শুধু এক শর্তে। এই দুরূহ পথের পারানির কড়ি হিশেবে তার হৃৎপিণ্ডের সাতভাগের একভাগ তাকে দিয়ে দিতে হবে।

যুবক ভাবল, এ এমন আর কী! সাতভাগের একভাগই তো। এমন প্রেমিকাকে পাবার জন্যে এ তো সে অনায়াসেই দিতে পারে। সে রাজি হয়ে গেল। সমুদ্র পেরোবার পর মাঝিকে হৃৎপিণ্ডের সাত ভাগের একভাগ দিয়ে সে এগিয়ে গেল দ্বিতীয় সমুদ্রের দিকে। দ্বিতীয় মাঝির চাহিদাও একই— পারানির কড়ি হিশেবে তার হৃৎপিণ্ডের সাতভাগের একভাগ। সাতভাগের একভাগই তো। এমন এ আর কী? এবারেও সে রাজি হয়ে গেল। এভাবে সাত সমুদ্রের সাত মাঝিকে হৃৎপিণ্ডের একভাগ করে দিয়ে দিয়ে সে যখন তার প্রেমিকার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন দেবার মতো হৃদয় বলে তার কিছুই আর নেই।

নেহাতই একটা রূপক গল্প। হয়ত অতীতের কোনো সম্পন্ন উপকথা। কিন্তু কী গভীরভাবেই না একালের নিঃস্বতার ছবি আঁকা এতে! হাজারো লোভ আর বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়ার ঘাটে হৃদয়কে কেটে কেটে বিলিয়ে আমাদের নিঃস্ব হওয়ার কাহিনী।

২৫

একজন ছাত্রের সঙ্গে কথোপকথন :

আমাদের দুটো হাত আমাদের এক হাতের কয়গুণ?

দ্বিগুণ।

হল না। হাজার কোটি গুণ। এক হাত নিয়ে আমরা অপ্রস্তুত মূঢ় জন্তু, দুই হাত দিয়ে বিশ্বজয়ী অলৌকিকের স্রষ্টা।

২৬

ছোট গুরুর মুরিদ হয়ো না। পা টিপতে টিপতে জীবন যাবে।

২৭

সবাই শুধু মৃত্যুর জন্যে দুঃখ করে, কিন্তু এমন বিস্ময়কর একটা জীবন যে পেয়েছিল, তা নিয়ে কিছু বলে না।

২৮

বিশ্বজগতের সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ছোট দুই-ই সমান অসীম।

২৯

সকালে 'স' ফোনে জানাল, অমুক লেখক তার বইয়ে আমার নিন্দা করেছে। জায়গাটা আমাকে সে পড়ে শোনাতে চাইল। বললাম: দরকার নেই। মানুষটি যে দয়া করে আমার নিন্দা করেছে সেজন্যেই তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শত্রুতার জন্যে তাকে অভিনন্দন। ভালোবাসার মানুষের সংখ্যা বড় বেশি হয়ে গেছে আমার। আজ আমার শত্রু দরকার।

শত্রুর সংখ্যাই তো মানুষের শক্তিকে প্রমাণ করে। যিশুখ্রিস্ট, সক্রেটিস, লেনিন, মাওসেতুং, মার্টিন লুথার, লিঙ্কন— সবারই শক্তি বেশি বলে শত্রুও বেশি ছিল। চারপাশের জড়ত্ব আর অন্ধত্বকে তাঁরা সমর্থ বর্শায় দুর্বার আঘাত করেছিলেন। তাই সবাই একজোট হয়ে তাদের ধ্বংস করতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আমার এত কম শত্রু প্রতিমুহূর্তে আমার ক্লীবত্বকে ব্যঙ্গ করে। বলতে চায় তুমি দুর্বল, অক্ষম! যুগের পাপ আর মিথ্যাচারকে নির্দয় আক্রমণে তুমি অপারগ ছিলে।

বললাম: শত্রু পেয়ে খুবই আশ্বস্ত হয়েছি। সামান্য হলেও নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করছি। প্রার্থনা কোরো, যেন এই শত্রুর সংখ্যা একজন দুজন থেকে লাখে কোটিতে ওঠে। ভালোবাসার লক্ষ হাতের চাপে আজকাল আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

৩০

কোনো কিছুকে ভালোভাবে দেখতে চাইলে কিছুটা দূর থেকে দেখতে হয়।

হাতের তালুর দিকে আধহাত দূর থেকে তাকাও, প্রতিটি রেখা স্পষ্ট দেখতে পাবে। হাত চোখের একেবারে কাছে আন— সবই ঝাপসা।

৩১

সবাই শক্তিমান মানুষ দেখলে পালিয়ে যায় আর দুর্বলকে দখল করে নেয়।

৩২

দুঃসহ যানজটের ভেতর গাড়ি-নেই-মানুষই ভাগ্যবান।

৩৩

বল্গাহীন উৎপাদন আর পণ্যের এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী মানুষটিও আজ ভিখিরি।

৩৪

প্রত্যেক দিন আমরা ছোট বড় যত কাজ করি, আমাদের শরীর জুড়ে দিনে যত অযুত-নিযুত কোটি ঘটনার উদ্ভব আর বিলয় হয়, প্রতিটা প্রাণকোষে উদ্‌যাপিত হয় জীবজগতের যত অনন্ত কোটি ক্রিয়া আর বিস্ময়; প্রত্যেকদিন যত কিছু আমরা ভাবি, চিন্তা করি, স্বপ্ন দেখি, অনুভব করি; আমাদের চেতনে-অবচেতনে তাদের যত বিচিত্র রহস্যময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জোনাকির মতো জ্বলে নেভে— আরও যত অচিন্তনীয় অন্তহীন ব্যাপার স্যাপার— সব যদি একখানে করা যেত, তবে বলতেই হত, আমাদের জীবনের একেকটা দিন কোনো দিক থেকেই কোনো নক্ষত্রের চেয়ে ছোট নয়। আর এই জীবনটাও গোটা মহাবিশ্বের চেয়ে কম নয়।

৩৫

সারাজীবন মন খুলে গান গেয়েছি, তাই আজ মরে যেতে হচ্ছে। তোমাদেরও মরে যেতে হবে, তাই যত পার গান গেয়ে নাও।

৩৬

সেদিন একটা গান শুনলাম :

'সাতটা শঙ্খ একসাথে বাজাব।'

বুকের ভেতরটা ঝনঝন করে উঠল। যে দেশের মানুষ একটা শঙ্খ উঁচু করতেই বেঁকে যায়, সেখানে কে এই বাঙালি— যে সাতটা শঙ্খ একসাথে বাজাতে চায়! তুলকালাম ওঙ্কারে চারদিক দাঁপিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে চায়— কে সে?

৩৭

ক্যালিফোর্নিয়ার রেড উড ফরেস্টে গিয়েছিলাম দিনকয় আগে। সিলিকন ভ্যালি থেকে নিয়ে গিয়েছিল জাকারিয়া স্বপন, সঙ্গে ওর স্ত্রী। এই অরণ্যে রয়েছে পৃথিবীর

বৃহত্তম গাছদের আবাস। গাছগুলো উচ্চতায় প্রায় তিনশ ফুটের মতো। গোড়ার দিকের ব্যাস এতটাই যে তাতে বড় সড় গর্ত করলে গাড়ি চালিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া যায়। প্রায় শ-তিনেক এমনি গাছ রয়েছে এলাকাটায়। সবাই খুবই প্রাচীন। কারো বয়স হাজার বছর, কারো দু'হাজার, কারো আড়াই হাজার, কারো তিন হাজার। চারপাশের এই অতিকায় গাছগুলোর ছায়ায় দাঁড়িয়ে মনে হল যুগযুগান্তরের আদিম জীবিত প্রপিতামহদের মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছি। একটা অদ্ভুত ভয় আর বুনো অনুভূতি হৃদয়টাকে ছেয়ে ফেলল। সেই মূক আর থমথমে ভাবটা এখনো বুকের মধ্যে রয়ে গেছে।

৩৮

কাল একজনের কাছে শুনলাম— কেন্দ্রের কে একজন তাকে বলেছে, স্যারের বেশি কাছে ঘেঁষো না। দূর থেকে তাঁকে দেখতে যেমন লাগে, কাছে গেলে সেরকম না।

ও ঠিকই বলেছে। গোলাপের কাঁটা গোলাপের চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক। আগুন আলোর চেয়ে।

৩৯

গুলি-খাওয়া বাঘ যেভাবে টলতে টলতে এগিয়ে একসময় মাটির ওপর ঢলে পড়ে, জীবনের ওপর আমার হাঁটাও আজ তেমনি।

৪০

আজকাল শুদ্ধসংগীত চর্চার উৎসাহ বেড়েছে। বোঝা যায়, চারপাশের সংগীতের 'অলীক কুনাট্যরঙ্গের' এ প্রতিরোধ। আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দ দাশের ওপরে লেখা বই-এর নাম দিয়েছিল 'শুদ্ধতম কবি'। কিন্তু বড় শিল্প বা মহৎ শিল্প কী করে শুদ্ধ হবে? শুদ্ধ তো হওয়া সম্ভব ছোট শিল্পের, তুচ্ছ জিনিশের— গ্লাসভরা ফোটানো পানি বা বাজার থেকে কেনা বোতলের পানির। কিন্তু বর্জ্য, ক্লেদ, বিষ্ঠা, বা লাশ ভেসে যাওয়া নদীর পানি কী করে 'শুদ্ধ' হবে? আসলে নদী বা সমুদ্রের পানি শুদ্ধ নয়, 'পবিত্র'। নদী তার তীব্র স্রোতধারার জন্যে, সমুদ্র অন্তহীনতার জন্যে।

৪১

ছেলেরা পাওয়ার ভেতর দিয়ে মেয়েদের দেয়, মেয়েরা দেওয়ার ভেতর দিয়ে ছেলেদের পায়।

৪২

কবিতা লিখতে হলে হৃদয়কে বুদ্ধিমান হতে হয়, যেমন গদ্য লিখতে হলে মস্তিষ্ককে।

৪৩

আজ ২০০৪ সালের বাংলাদেশে চিন্তা-চেতনা মন-মানসিকতার দিক থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের মানুষ যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে এক হাজার বছর, পাঁচশ, দু'শ, একশ বছর আগের মানুষও। কিছু মানুষ হয়ত পাওয়া যাবে চিন্তা চেতনায় যারা একেবারে আজকের বাংলাদেশের সমসাময়িক। একইভাবে এমন কিছু কিছু মানুষও হয়ত আবার মিলবে মন-মানসিকতায় যারা একশ, দু'শ, পাঁচশ বা পাঁচ হাজার বছর পরের।

আজকের বাংলাদেশে পৃথিবীর সব কালের সব যুগের বাংলাদেশ রয়েছে। প্রতিটা মুহূর্তের ভেতর পৃথিবীর সমস্ত সময়।

৪৪

মৌলবাদ মোকাবেলার আসল সংগ্রাম রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক।

৪৫

শুধু টাকা দিয়ে যে 'বড়লোক' হতে চায় সে নিতান্তই গরিব।

৪৬

সরল মানুষের চেয়ে চালাক মানুষ ভুল করে বেশি।

৪৭

একেক কারকে একেক বিভক্তি। কর্মকারকে 'কে' তো করণ কারকে 'দ্বারা, দিয়া'; সম্প্রদানে 'কে' তো অপাদানে 'হইতে, থেকে' বা অধিকরণে 'এ, য়, তে' ... এমনি...।

প্রতিটি মানুষের সঙ্গেও নিয়তির মতো জড়িয়ে থাকে এমনি কোনো-না-কোনো বিভক্তি। একেকজনের বিভক্তি একেক রকম। কারো হাতে ক্যালকুলেটার; পাঁচটা টমেটোর দাম জানতে চাইলেও তাতে হিসাব শুরু করে। কারো হাতে মোবাইল ফোন, কানের ওপর ধরে আছে তো আছেই। কারো সামনে কম্পিউটার, সারা দুনিয়ার সবকিছু তার মধ্যে ঢুকিয়ে বুঁদ হয়ে আছে। কেউ হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে তো আছেই। কেন্দ্রের ছেলেমেয়েদেরও একেকজনের এমনি একেক ধাঁচ। মাঝে মাঝেই তাদের বলি : হতে পারে

তোমাদের একেকজনের একেক বিভক্তি। কিন্তু ভুলো না, কর্তায় কিন্তু 'শূন্য বিভক্তি'। কর্তা হতে চাইলে এসব উটকো বিভক্তি হটাও। চোখ মন খোলা রাখা চাউনি দূরে মেলে দাও। দূর আকাশের চূড়া দেখতে পাবে।

৪৮

বড়লোকদের টাকাপয়সার উৎকট লালসা দেখে আগে মনে হত— কী অভব্য মানুষরে বাবা! এত টাকা, তবু টাকার সাধ মেটে না। খেয়ে পরে বাঁচতে কত টাকা লাগে? কেন টাকার পেছনে এরা এমন বেহুঁশের মতো ছোটে? কী করবে এত দিয়ে? কবরে নিয়ে যাবে?

এখন বুঝি, এত থাকার পরও কেন এরা টাকা টাকা করে। খাওয়া-পরার জন্যে নয়; টাকা কম বলেও নয়; খাই বেশি বলেও নয়। তারা দৌড়ায়, কারণ তারা জানতে চায়— আসলে তারা কতখানি বড়।

কেবল টাকাওয়ালারাই না, সব ক্ষমতাবান মানুষই এ করে। এজন্যেই এত গান লেখার পরও নজরুল গান লেখেন, এত চরিত্র আঁকার পরও ডিকেন্স নতুন চরিত্রের স্বপ্ন দেখেন; রবীন্দ্রনাথের, বালজাকের, টলস্টয়ের লেখা কোনোদিন শেষ হয় না। এত চিন্তার পরেও এ্যারিস্টটলের চিন্তা চলতে থাকে, নিউটন বা টমাস আলভা এডিসন এত আবিষ্কারের পরও আবিষ্কার চালিয়ে যান। খালি বড় মানুষরা নন, সামান্য মানুষেরাও এ করে। নিজের চেয়ে ছোট হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে মানুষের বড় কষ্ট।

৪৯

আমি গুরু নই। পথনির্দেশ আমার কাজ নয়। আমি একালের মানুষ। আমি শুধু প্রস্তাব করি। Preach করি না, Place করি।

৫০

বেশি সৎ মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

চতুর্থ পর্ব

[২০০৭-২০১১]

১

বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার কী যে স্নিগ্ধ সম্পর্ক! একজন এলে আরেকজন কী অপরূপভাবেই না বেজে ওঠে।

২

সফল সে, যে পৃথিবীর কাছ থেকে নেয় অনেক; সার্থক সে, যে দেয় অনেক।

৩

সারা পৃথিবীতে মানুষ আসলে একজনই। শুধু সে অভিনয় করে কোটি কোটি মানুষের চরিত্রে।

৪

এসো বোঝাই, সিদ্ধান্ত কাকে বলে। ধরা যাক তুমি কোনো একটা কাজ করতে চাও। ভেবে দেখলে কাজটা করলে ভালো হবার সম্ভাবনা ৫১ ভাগ, খারাপ হবার ৪৯ ভাগ। দুটো খুবই কাছাকাছি। এ সময় যদি একবার এটার একবার ওটার দিকে তাকাতে থাক তবে খুবই বিপদে পড়বে। একটাকে বেছে নিলে মন পড়ে থাকবে অন্যটার ওপর।

এ সময় করণীয় কী? আমার মতে : দুটোর মধ্যে যেটা একটু ভালো অর্থাৎ ৫১— তাকে এক ঝটকায় মনের মধ্যে ১০০ বানিয়ে ফেল। ওটাই এখন জ্বলজ্বল করতে থাকুক চোখের ওপর। মনে কর একমাত্র ওটাই শুধু আছে পৃথিবীতে, আর কিছু নেই। একই সঙ্গে ৪৯-কে বানিয়ে ফেল শূন্য— যেন ওটুকু পৃথিবীতে ছিল না কোথাও কোনোদিন। এবার তলোয়ারের মতো কেটে এগিয়ে যাও ওই ৫১ অর্থাৎ একশ'কে নিয়ে।

এভাবে কম গুরুত্বের দিকটিকে নিশ্চিহ্ন করে বেশি গুরুত্বের দিক নিয়ে অন্ধের মতো আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে যাওয়াই হল 'সিদ্ধান্ত'।

৫

বিশাল হয়ে ওঠা আর দুর্বল হয়ে পড়া প্রায় একই কথা।

৬

ধরা যাক সুন্দর রঙিন সাজগোজ-করা একদল মেয়ে ঝরনার মতো উচ্ছল আনন্দে তোমাকে পেরিয়ে চলে গেল। ধরা যাক, মেয়েগুলোর কেউই আলাদাভাবে তেমন সুন্দরী নয়। তবু ঝাঁক-বাঁধা একদল মেয়ে মুখর ঝংকারে পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলে তাদের সৌন্দর্যছটায় মন কেন এভাবে উপচে ওঠে? মনে হয়, একরাশ সৌন্দর্য-হিল্লোল যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের ওপর।

কেন এমনটা হয়? প্রতিটি মেয়ের সৌন্দর্য আর দেহভঙ্গিমার অনিন্দ্য অংশগুলো একসঙ্গে হয়ে মনকে বিচিত্র আর পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে রাঙিয়ে তোলে বলে?

তাই কি একটি মেয়ের জায়গায় একঝাঁক মেয়ে হেসে উঠলে জীবন সোনালি স্বপ্নে চমকে ওঠে। তাই কি একটি পর্বতের চেয়ে 'পর্বতমালা' সুন্দর, একটি হরিণের চেয়ে ঝাঁক-বাধা একদল হরিণ?

এজন্যেই কি আলাদা অপরূপ এত ফুল থাকার পরও রং-বেরংয়ের হাজারো ফুল জড়ো করে মানুষ তোড়া বানায়? মালা গাঁথে? বাসরশয্যা রচে?

তাই কি একটি গাছের চেয়ে অরণ্য সুন্দর, একটি নক্ষত্রের চেয়ে জ্বলজ্বলে তারা-ভরা রাত, একটি প্রদীপের চেয়ে সবেবরাত রাতের সার সার হীরার প্রদীপ?

একটি জিনিশের চেয়ে তার বৈচিত্র্যময় নন্দিত পুনরাবৃত্তি কি সুন্দরতর?

৭

কাউকে কথা বলতে না-দেওয়া আর সবাইকে কথা বলতে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য শুধু আওয়াজের পরিমাণে।

৮

অমিত আর লাবণ্যের বিয়ে হলে লাবণ্য হয়ে যেত কেটি মিত্তির, অমিত শোভনলাল।

৯

ছেলেবেলায় পড়া জীবনানন্দ দাশের 'ঘোড়া' কবিতাটা সেদিন আবার পড়লাম।

শুরুর লাইনগুলো মন-বিমর্ষ করা :

"আমরা যাইনি মরে আজও— তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়।
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন— এখনো ঘাসের লোভে চরে

পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।"

হঠাৎ ভেতরটা কেমন যেন করল। মনে হল যেন আমারই গল্প— আমাদের মতো বুড়ো জিরজিরে মানুষদের— প্রস্তরযুগের ঐ বিলীয়মান প্রজাতির নির্জন বিষণ্ণ বংশধরদের।

আমরাই যেন সেইসব প্রস্তরযুগের ঘোড়া, দীর্ঘদিন টিকে থাকা, অস্থিসার, জ্যামিতিক, অটুট— জোছনালোকিত অবাস্তব মাঠের ওপর ঘাসের লোভে এখনো চড়ে বেড়াই।

১০

মেয়েরা কি নিজেদেরকে নিজেদের চেয়ে বেশি বয়সী ভাবে? না হলে বয়স এত কমিয়ে বলে কেন?

১১

বিশ্বচরাচরের তুলনায় মানুষ একটা পিঁপড়ের অনন্ত কোটি ভাগের একভাগও নয়। কিন্তু বিপদ হল ওই পিঁপড়ের টুকরোগুলো সবাই নিজেদেরকে বিশ্বচরাচরের চেয়েও বড় মনে করে।

১২

কত বড় বড় কবি শিল্পী গায়ক ভাস্কর পৃথিবীতে, সে তুলনায় সমালোচক কত কম। শিল্পী হতে লাগে কল্পনা, আবেগ, বুদ্ধি— অনেকের মধ্যেই এসব থাকে। কিন্তু সমালোচক হতে লাগে দুর্লভতম একটা জিনিশ : মনন। সৌন্দর্যকে পরতে পরতে বিশ্লেষণ করে, তাকে চিরে চিরে আনন্দ উপভোগের হৃদয়। হাতে গোনা মানুষই এ নিয়ে জন্মায়। তাই এত শিল্পী মেলে জগতে, কিন্তু মেলে না বোদ্ধা, সহৃদয় হৃদয়সংবেদী রসবেত্তা, সমদর্শী সমালোচক।

১৩

সবাই সমান হলে সেই ধাক্কাধাক্কিতে মহাপৃথিবীর সবকিছু চুরমার হয়ে যেত নাকি।

১৪

টাকা দিয়ে যা কেনা যায় তার নাম 'বস্তু'— সে যদি মানুষও হয়, তা-ও।

১৫

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে।"

আগে মনে হত, ভাবনাটা নেহাতই একটা অলীক কবি-কল্পনা। যেখানে প্রতিটা মানুষ নির্জীব আর জবুথবু হয়ে বসে আছে, সেখানে কোনো একজন একক মানুষ একলা এগিয়ে করবেটা কী? একজনের এগোনো সকলের অচলায়তনকে কতটুকুই বা ধসাতে পারবে? পরে মনে হয়েছে কথাটার একটা কণাও হয়ত অবাস্তব নয়। বরং গোটা ব্যাপারটাই বাস্তব। হয়ত বাস্তবের চেয়েও বাস্তব। মনে হয়েছে সবার যাত্রা বলে পৃথিবীতে আসলে কিছু নেই। জগতে যাত্রা আছে শুধুমাত্র একজনের। তার যাত্রাই গোটা মানবজাতির যাত্রা।

একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। ধরা যাক কোনো আক্রান্ত দেশের একটি বিমানবন্দরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে সাতটি সেকেলে যুদ্ধবিমান। এরা প্রত্যেকেই সজীব, সচেতন, উত্তেজিত। বিমান হামলায় যেতে উন্মুখ, মরিয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরা কেউ উড়তে পারছে না। এর অবশ্য একটা বাস্তব কারণ আছে। ধরা যাক, আকাশে ওড়ার আগে এ জাতের প্লেনগুলোকে রানওয়ের ওপর দিয়ে অন্তত ১৬৫ মাইল বেগে দৌড়ে যেতে হবে। কিন্তু এদের কারোই সে গতি নেই। এদের মধ্যে যে সবচেয়ে জোরে ছুটতে পারে সে ছোটে ঘণ্টায় ১৬০ মাইল বেগে। তার পরের জন ১৫৫ মাইল। তার পরের জন ১৫০ মাইল, আর শেষ চারজন ১৪৫ মাইল।

কিন্তু দরকারি গতিতে ছুটতে না পারলেও ওড়ার উত্তেজনা এদের মধ্যে একসময় এমনই উদগ্র আর আগ্নেয় হয়ে উঠল যে দেখা গেল তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ছোটার ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। মরিয়া অবস্থার চূড়ান্ত এক পর্যায়ে দেখা গেল ১৬০ মাইল গতির প্লেনটি রানওয়ে বরাবর দৌড় শুরু করে নিজের ক্ষমতা ছাড়িয়ে ১৬৫ মাইলে উঠে যেতেই এক সময় আকাশে উড়ে গেল। এর পরের প্লেনটা গতির জ্বলন্ত আবেগে এমনিতেই ১৫৫ মাইল থেকে ১৬০ মাইলে উঠে গিয়েছিল। সামনের প্লেনটাকে উড়ে যেতে দেখে প্রচণ্ড প্রেরণায় দৌড়ে সে-ও উঠে গেল আকাশে। সে উড়ে গেলে একইভাবে উড়ে গেল তৃতীয় প্লেনটা এবং সব শেষের প্লেন চারটাও। তাহলে দেখছি প্রেরণায় একইরকম জ্বলে উঠেছিল সবগুলো প্লেনই, কিন্তু ক্ষমতার তারতম্যের জন্যে সবাই একসঙ্গে উড়তে পারেনি। উড়ল তখনই যখন এদের অন্তত একজন আকাশে উঠে গেল। তার যাওয়াই আহ্বান হয়ে ডেকে গেল বাকি সবাইকে। কাজেই একজনের যাত্রা

মানেই পুরো দলের যাত্রা। শুধু পরিবার নয়, সমাজ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এমনকি সভ্যতার মতো প্রতিটি সম্মিলিত উদ্যোগের বেলাতেই কথাটা সত্য।

এক বালতি পানি নিন। পানি নিশ্চল স্থবির গতিহীন। এবার ওর ভেতর একটা চামচ ডুবিয়ে সেটাকে ঘোরাতে শুরু করুন। প্রথমে দেখবেন পানি অস্পষ্টভাবে নড়ছে কিন্তু তখনও যেন স্থির। রণে ভঙ্গ না দিয়ে একইভাবে ওটাকে ঘুরিয়ে চলুন। একসময় দেখবেন পুরো বালতির পানি চামচের সঙ্গে ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করছে। একসময় ঘোরার গাড়ি হয়ত হয়ে উঠবে সত্যি সত্যি দুর্দম। একসময় দেখতে পাবেন চামচই হয়ত ঘুরছে না, কিন্তু পানি ঘুরে চলেছে। এভাবেই একজনের যাত্রা এক সময় পরিণত হয় সবার যাত্রায়। তাই প্রতিষ্ঠান শুরু হয় ব্যক্তি দিয়ে, শেষ হয় সমষ্টিতে। তাই কবির কথাটাকে অবান্তর বা কবি-কল্পনা মনে করার কিছু নেই। যারা বলে, আসুন, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে দেশোদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ি তাদের কথার মানে একটাই : কারো কিছু করার দরকার নেই ভাইসব, সবাই যে যার ঘরে ফিরে গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ভালোমতো একপ্রস্থ ঘুম দিন।

১৬

মেয়েদের মতো ছেলেরাও প্রশংসায় খুশি হয়। কিন্তু মেয়েদের সমস্যা এখানে যে তারা সেগুলোকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে বসে।

১৭

হঠাৎ মেঘ চিরে এক ঝলক সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়ল শহরের মুখের ওপর।
কনে-দেখা ফুটফুটে আলো জানালায়, কার্নিশে, চরাচরে।

বাদল দিনের বিমর্ষ অবরুদ্ধ শহরে
মরে যাওয়া একটা দিন
হঠাৎ যেন বেঁচে গেল।

১৮

বীজ থেকে হয় অঙ্কুর— অঙ্কুর থেকে গাছ— সে গাছও একদিন শেষ হয়। মানুষ বিজ্ঞানের নিয়মগুলো আবিষ্কার করে ফেলেছে, দর্শনের যুগ শেষ— ধর্ম দর্শন শিল্প সাহিত্য শীর্ষে পৌঁছেছে— প্রযুক্তি পুঁজিবাদের দাস— গোলাপের আকার আর রঙ এখন কোটি কোটি, পৃথিবী ভাদ্রের নদীর মতো থৈ থৈ করছে। এখন কি তবে হে মানুষ, তোমার বিদায়ের মুহূর্ত!

১৯

যে জ্বলছে সে-ই তো সুন্দর, তার শরীরই তো আলো-জ্বলা, রূপ-ঠিকরানো।

২০

একবার লিখেছিলাম : যৌবন অত্যাচার করে হৃদয়ের ওপর, বার্ধক্য শরীরের ওপর। আজ জর্জরিত দুই অত্যাচারেই।

২১

আজ ফোন করেছিল কেন্দ্রের এক প্রাক্তন ছাত্রী। কথায় কথায় আমার বার্ধক্যের কথা উঠতেই বলল, 'আপনার আবার বার্ধক্য কিসের স্যার? আপনি তো চির তরুণ।'

বললাম, 'কীভাবে?'

'আপনি আর বুড়ো হতে পারবেন না তাই!'

'কেন?'

'মানুষের বুড়ো হবার একটা বয়স থাকে। আপনি যে সেটা পেরিয়ে গেছেন।' বলে প্রাণখুলে হেসে নিল।

বললাম, 'এখন কী উপায়?'

কিশোর তো আছেনই। দেখুন শিশু-টিশু হতে পারেন কিনা?

ভাবলাম, ওটাও তো ঘুরে ফিরে আবার সেই বৃদ্ধ হওয়াই। বৃদ্ধদের বার্ধক্যই তো মানুষের শৈশব?

২২

বিজ্ঞানকে সন্দেহ করার নামই বিজ্ঞান, যেমন বিশ্বাসকে সন্দেহ না করার নাম ধর্ম।

২৩

প্রতি সন্ধ্যায় যে রাস্তায় হাঁটি তার আশে পাশেগাছপালার ভেতর একটা গাছে শেফালি ফুল এসেছে। অন্ধকারে হাঁটার সময় থেকে থেকে তার মিষ্টি গন্ধ টের পাই। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গাছটাকে অন্ধকারে অনেক খুঁজি, কিন্তু কোথাও দেখতে পাই না। বুঝি না ঠিক কোথা থেকে আসছে এমন অস্ফুট ফুলের পথ-হারানো তীক্ষ্ণ চকিত গন্ধ। রহস্যময়ী নারীর মতো গাছপালার আড়ালে সে শুধু

লুকিয়ে থাকে আর হৃদয়টাকে সোনালি জোছনায় ভরে দিয়ে যায়। গাছটাকে যেন পরিচিত কারো মতো লাগে— যাকে দেখা যায় কি যায় না, চিনি বা চিনি না, অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে যে শুধু মনের ওপর মিষ্টি ঘ্রাণ ছাড়িয়ে যায়।

২৪

ভাগ্য যে কাছের জিনিশকে বড় দেখার মতো দূরের জিনিশকে ছোট দেখার ক্ষমতা রয়েছে মানুষের। তাই স্মৃতির পৃথিবীতে আমাদের এত খোলা জায়গা— এত পার্ক, লেক, শাদা মেঘ আর নীলাকাশ।

২৫

একেকবার ভাবি, আমাদের স্মৃতিক্ষমতা যদি এত কম না হত! দূরের কাছের সব ঘটনাকে আমরা যদি সমান স্পষ্টভাবে দেখতে পারতাম! যদি দশ মিনিট আগের ঘটনার মতো দশ বছর এমনকি ষাট বছর আগের ঘটনাও আমাদের চারপাশে একইরকম জ্বলজ্বলে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, তবে আমরা হয়ত বাস করতাম কোটি কোটি জ্যান্ত দৃশ্যের এক দমবন্ধ জেলখানার ভেতর— অতীতের অসংখ্য কোটি ঘটনা উঁচু বিশাল দেয়ালের মতো চারদিক থেকে ঘিরে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলত। তখন হয়ত মনে হত স্মৃতির মতো এমন দানবীয় কারাগার পৃথিবীতে আর নেই।

২৬

সবাইকে এক সময় শিখতে হয় কী করে দূরে গিয়েও কাছে থাকতে হয়, আর কাছে থেকেও দূরে যাওয়া যায়।

২৭

ফোনে কথা-হওয়া জিনিশটা মানুষে মানুষে একটা আলাদারকম দেখা হওয়া। দুটো মানুষের দুটো আলাদা হৃদয় দুটো একান্ত কণ্ঠস্বর হয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে থাকে।

২৮

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ প্রথমে শিকার হয় বন্যার, তারপর দুর্ভিক্ষের। সবকিছু বিপর্যস্ত, খোলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল। দেশের ধনাঢ্য মানুষেরা তাতে মুক্ত হাতে দান করছেন।

আমার এক তরুণ বন্ধু, উঠতি বড়লোক, গিয়েছিল সেই তহবিলে চাঁদা দিতে। পাঁচ লাখ টাকার চেক প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে দিতে বলেছিল, অনেক কষ্টের টাকা বঙ্গবন্ধু। দেখবেন ঠিক মানুষের হাতে যেন পৌঁছায়।

বাংলাদেশের টাকা তখন অনেক দামি। পাঁচ লাখ টাকা আজকের পাঁচ কোটি।

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'কার হাতে টাকা দেব রে'। বাঙালির দাম যে পাঁচ টাকা।'

গত ৪০ বছরে দেশে টাকার অনেক অবমূল্যায়ন হয়েছে। কিন্তু বাঙালির সেই দাম কি আর বেড়েছে?

২৯

যে কর্মকর্তা অফিসের অধস্তনদের গাল পাড়ে, সে আসলে নিজের ব্যর্থতাকেই গাল পাড়ে।

৩০

স্বাভাবিকতার একটা সীমা আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমিতার নেই।

৩১

আমাদের ছেলেবেলায় দেশটা ছিল গরিব, দেশের ঈদও ছিল গরিব। ঈদের পোশাকও তাই। সে পোশাকও আবার নেহায়েত কালেভদ্রেই জুটত।

আমার বয়স তখন পাঁচ-ছয়। আব্বা সেবার ঈদে আমাকে একটা জমকালো শেরওয়ানি বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা পরে আমি রাজপুত্রের মতো ভাব করে ঘুরে বেড়াতাম।

এদিকে বছরের পর বছর যায়, ঈদের পর ঈদ আসে। কিন্তু নতুন শেরওয়ানি তো আর আসে না।

এদিকে আমার শেরওয়ানির হাতা ফি-বছর ওপরে উঠতে উঠতে এক সময় কনুইয়ের কাছে এসে গেল। তবু নতুন শেরওয়ানির দেখা নেই।

এ যুগে হলে আশেপাশের বন্ধুরা এ নিয়ে হাসাহাসি করত। কিন্তু তাও তখন কেউ করল না। করবে কী করে? হাসাহাসি যে করবে তার শেরওয়ানির হাতা যে কাঁধ পর্যন্ত উঠে গেছে!

৩২

সাম্প্রতিক জিনিশই সবসময় শ্রেষ্ঠ জিনিশ নয়।

৩৩

যখন কেউ নিঃশব্দে একলা কোথাও নিমগ্নভাবে বই পড়তে বসে তখন তার জায়গায় একটা কোমল মৃদু মোমবাতি জ্বলে ওঠে ।

৩৪

ঈদের দিন বেড়াতে গিয়েছিলাম সিঙ্গাইরের রাস্তায়। ধল্লা ব্রিজ পেরিয়ে বাঁয়ে নেমে নদীর ধার-ঘেঁষা মাটির রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। আমার হাতের ডান-ধারে পরিচিত গ্রামবাংলা আর ঘন-সবুজ পাটক্ষেতের তাগড়া বুনো জগৎ। হঠাৎ দেখি ঘাস আর ঝোপে-ঢাকা একটা সরু অস্ফুট মেঠো পথ চলে গেছে দূর গ্রামের দিকে। কিছুটা এগিয়ে গেলাম পথটা ধরে। মিটার পঁচিশেকও যাইনি, হঠাৎ চারপাশে তাকিয়ে পুরো অবাক বনে যাই। ঘাসে-ঢাকা উঁচু-নিচু জমির অপরূপ একটা ঢেউ খেলানো সবুজ ভূদৃশ্য— সেখানে মাঝে-মধ্যে বিক্ষিপ্ত কিছু ছোট ঝোপ আর তার ভেতর এখানে ওখানে কাশফুল ফুটে গোটা পরিবেশটাকে একটা রূপকথার রাজ্য বানিয়ে রেখেছে। ফিল্মে স্বপ্নের দৃশ্যে সবকিছুকে যেমন মোহনীয় আর রহস্যময় লাগে তেমনি।

কে জানত রাস্তা থেকে এত সামান্য দূরে এমন একটা অপার্থিব জায়গা পৃথিবীর চোখ এড়িয়ে এভাবে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হয়ত আমাদের থেকে এমনি কয়েক পা দূরে আমাদের ঈপ্সিত মানুষটিও এভাবেই অপেক্ষা করে— রাস্তা ছেড়ে নামা হয় না বলেই দেখা হয় না।

৩৫

দুই চোখের দুই কালো ভ্রমর কাকে দিতে যাচ্ছ তুমি, মেয়ে?

৩৬

যৌবনে লেখা হয়নি বেশিরকম ব্যস্ত থাকায়। এই নিষ্পত্র বার্ধক্যেই বা কোথায় সময়? তাছাড়া কোথায় সেইসব স্বপ্ন-ভরা অনুভূতি— যারা চন্দ্রমল্লিকার মতো থরে থরে ফুটে এক সময় আবার হারিয়ে গিয়েছে। কোথায় সেই 'ঠোঁট-ভাঙা দাঁড়কাক যাকে ভালো করে দেখা হয় নাই'। কোথায় সেই শরৎ আকাশে শাদা মেঘের অলস সপ্তডিঙা আর সেই সব প্রিয়মুখ যাদের ঘিরে হাজারো কথা চাঁপা ফুল হয়ে একদিন ফুটেছিল!

কোথায় সেই স্বপ্নছেঁড়া রাতগুলো, দিনগুলো, গাছ-মাঠ-বসন্ত-শরৎ? ঝাউবন, অবন্তীর চুল, পাল-রঙা শৈশব, আততায়ী চাঁদ?

"জাল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে মাছ নদীর ভিতরে,
শব্দ ফিরে গেছে অভিধানে, ফিরেছে সুন্দর চিরতরে
মিশে গেছে রমণীর চাঁপাফুলে, অরণ্যে তারার।"

৩৭

মানুষ মরলে যেমন প্রেতাত্মা হয়, জ্ঞান মরলে তেমনই হয় পাঠ্যবই।

৩৮

যাকে কোনোদিন পাওয়া হয় না, তাকে পাওয়াও কোনোদিন শেষ হয় না।

৩৯

কাল যাচ্ছিলাম তাহেরের সোনারগাঁয়ের বাসার দিকে, মাঝ-পথ পেরোতেই বৃষ্টি নামল। না, আষাঢ়-শ্রাবণের মতো পৃথিবী-ভাঙা বৃষ্টি নয়, শেষ শরতের হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি। মনে হল শাদা চপল বৃষ্টি-পরীরা যেন চটুল পায়ে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ওপর দিয়ে, সামনের বর্ষার শুরুতে আবার তারা ফিরবে।

গাড়ির ভেতর রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছিল। বৃষ্টির শুরুতেই ড্রাইভার সজীব চাপিয়ে দিয়েছিল ওটা। বলল, 'বৃষ্টির ভেতর রবীন্দ্রসংগীত খুব ভালো লাগে স্যার।' চমকে উঠলাম। রবীন্দ্রসংগীতের বৃষ্টিবিধুর হৃদয়ের খবর এই সুদূর লোকটিও জানে তাহলে?

বললাম, 'বৃষ্টির ভেতর মুড়িভাজা আর খিচুড়িও কিন্তু বেশ লাগে।' দুজনই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

সোনারগাঁ'র বাসায় যখন পৌঁছলাম তখনও বৃষ্টি চলছে। বৃষ্টিতে জোর নেই, তবু বর্ষা দিনের একটা ভেজা আবহাওয়া কীভাবে যেন দাঁড়িয়ে গেছে চারদিকে।

যদি প্রথম বর্ষার বৃষ্টি দেখতে চাও, এই বাড়িটায় এসো।

আমি থাকি বাড়িটার তেতলায়। বাড়ির সামনে দেড়মাইলের বিশাল ধানক্ষেত। তার ওপারে একটা অস্ফুট গ্রামের গভীর কালো রেখা। না, কেবল এ বাড়িতে নয়, তোমাকে আসতে হবে আমার এই তেতলার ঘরটাতেই। এর বারান্দায় দাঁড়ালে সামনের দক্ষিণ আর পুব দিকের বিশ কিলোমিটার-জোড়া এক বিশাল বৃষ্টিমুখর জগৎ তুমি দেখতে পাবে।

এখানে বর্ষা আসে কালো-মেঘে-ঢাকা সামনের বিশাল আকাশটা ঝেঁপে। বৃষ্টির ঠিক আগে দেখবে হঠাৎ করেই বাতাস কিছুক্ষণের জন্যে পুরো বন্ধ হয়ে গেছে। একটা অশুভ আশঙ্কায় ইতিউতি করছে প্রকৃতি। আমরা তখন বুঝি সে

আসছে। তারপর হাজার লক্ষ ডাকাতের মতো কালো মেঘ ছুটে আসবে সামনের গোটা আকাশের সবগুলো দিক থেকে। প্রায় ছবির মতো দেখব দৃশ্যটা। প্রথমে দেখব কালো মেঘকুণ্ডলীর নিচে দাঁড়িয়ে থাকা দূরের গ্রামগুলো ঝাপসা-শাদায় রহস্যময় হয়ে উঠল। তারপর ধানক্ষেতের নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে-থাকা গাছগুলোকে একে একে বিয়ের শাদা টোপর পরিয়ে, সামনের ছোট্ট পুকুর-ধারের ঘন জঙ্গলটাকে অস্ফুট-শাদায় ঢেকে দিয়ে জোরালো আবেগে ছুটে আসবে আমাদের দিকে। ততক্ষণে সামনের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত অঝোর বৃষ্টিতে অপরিচিত হয়ে গেছে। এরপর বাসার সামনের পুকুরটাতে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝরিয়ে, আমাদের বাড়ি পার হয়ে, ঘন গাছপালা-ঢাকা গ্রামটার ওপর দিয়ে ছুটে যাবে আরও উত্তরের গ্রাম-জনপদের দিকে।

তখন আমাদের এই ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে এক অঝোর বৃষ্টির দেশ।

৪০

রোজ যে পরিমাণ ওষুধ খাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে এখন আমাদের আসল নাম পাল্টে ওষুধের নামেই আমাদের নামকরণ করা উচিত। (আজও যে পৃথিবীতে বেঁচে আছি সে তো ওগুলোর জন্যেই)। যেমন আমার চুলগুলোর নাম আজ আলবৎ হওয়া উচিত 'সেলসান'— যেহেতু এত খুশকির পর আজও যে আমার মাথাভর্তি চুল রয়ে গেছে তা ঐ ওষুধ-জাতীয় শ্যাম্পুটির জন্যেই। কিংবা ধরুন আমার নাম কি হওয়া উচিত নয় 'অ্যামডোক্যাল ফাইভ' যেহেতু ওটা খাওয়া বন্ধ করলে উচ্চ রক্তচাপে কিছুদিনের মধ্যেই আমি পটল তুলব? একইভাবে আমার কিডনির নাম রাখ উচিত 'ট্রাইটেস', প্রস্টেটের নাম 'ইওরোম্যাক্স', ফুসফুসের নাম 'মনটেয়ার', ঘুমের নাম 'জিওনিল' আর আজকের পৃথিবীর প্রবীণ বা বয়স্ক সবার নাম 'পেনিসিলিন'?

একেক সময় মনে হয় আমাদের জীবনে আজ যেন কেবল ওষুধই আছে, শুধু আমরাই নেই।

৪১

ধর, পাশাপাশি দুটো ট্রেন একই দিকে যাচ্ছে চারশ কিলোমিটার বেগে। ভাবো তো কত অনন্তকাল দুজন দুজনার হাত ধরে একসঙ্গে চলবে। অথচ ট্রেন দুটো যদি বিপরীতমুখী হয়— কত ছোট্ট একটা পলকের জন্যেই না তাদের দেখাদেখি। তোমরা ছুটছ জীবনের দিকে। আমি উল্টোপথে। এর মধ্যে ঝড়ের মতো এক মুহূর্তের ঝটিতে-দেখার এই চকিত বিদ্যুৎচমক। এর মধ্যে কোথায় চেনা, কোথায় হারিয়ে যাওয়া, কোথায় শুরু, কোথায় শেষ— সবই একাকার!

৪২

ঘর ছেড়ে বাইরে এসো। তাকিয়ে দেখো আকাশের দিকে। দেখো কী বিষণ্ন বিরাট আর ভীতিকর একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে— যেন নিজের বিশাল ওজনে যে কোনো মহূর্তে ধসে পড়বে মাটির ওপর। চাঁদটা এতই রক্তাভ যে মনে হচ্ছে ওর গা থেকেও রক্ত ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়। ঠিক আমারই মতো— এমনি নিঃসঙ্গ, বিষণ্ন আর রক্তাপ্লুত।

৪৩

যে প্রশংসাকে প্রশংসা বলে বোঝা যায় তা প্রশংসা নয়, চাটুবাক্য।

৪৪

আজ মেঘনা দিয়ে যাচ্ছিলাম। কালো পানির সেই ঢেউবহুল বিশাল নদীতে আমার চোখের আকাশ ঢাকা। ওপরে শরতের মেঘ আর নীল আকাশ। অনেক দূরে নদীর শুরুতে আকাশ জুড়ে বিপুল শাদা-মেঘের একটা সুউচ্চ মিনার— তার মাথায় সূর্যের তীব্র কিরণছটায় 'হাজার মানিক' জ্বলছে। উতল হাওয়া আর জলকণার ছাঁট আমাদের চোখে-মুখে।

এই মুহূর্তের এমন অপরূপ নদীটাকে তুমি যদি দেখতে!

৪৫

সেই পুরুষই সুন্দর যার বেশিটুকুই পুরুষ, অনেকটুকু মেয়ে।

৪৬

কতকাল ধরে মানুষ কত তুচ্ছ গাছ, পাথর, নদী, অরণ্য, পাহাড় বা পর্বতের মতো নিরেট বস্তুকেও ঈশ্বর বলেছে, কিন্তু কখনো কোনো মানুষকে ঈশ্বর বলার নির্বুদ্ধিতা দেখায়নি।

৪৭

ধরো তুমি বললে, গতকালটা খুব খারাপ ছিল, আজকের দিনটা যাবে তারও চেয়ে খারাপ, আগামীকাল এত খারাপ যাবে যে পৃথিবীই হয়ত শেষ হয়ে যাবে। একথা শুনতে যেমনই লাগুক আসলে কিন্তু কথাটা সত্য নয়। সত্য কখনো এমন পুরোপুরি খারাপ হয় না। গতকালটা যদি খারাপ হয়েও থাকে তবু তার মধ্যে ভালো কিছুও

নিশ্চয়ই ছিল, যেমন আজও আছে বা আগামী দিনও থাকবে। তেমনি আবার যদি বল গতকাল খুব ভালো গেছে, আজকের দিনটা আরও ভালো যাবে, আগামী দিন হবে সবচেয়ে ভালো— এ কথাটাও, একই কারণে, সত্য হবে না, কেননা সত্য কখনো এত নিখাদরকমে ভালো হয় না। কাল যদি খুব ভালো হয়েও থাকে তবু খারাপও তার মধ্যে কিছু না কিছু ছিল, যেমন আজও আছে, আগামী দিনেও থাকবে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন এ নিয়ে নয়। আমার প্রশ্ন, এই দুটোর মধ্যে— এক কথায়, এই দুই মিথ্যার মধ্যে— কোনটাকে আমি নেব? কোনটায় লাভ বেশি? আমি মনে করি দ্বিতীয়টায়। কেননা মিথ্যা হলেও ওটাই তো আমাকে শক্তি জোগাবে, উজ্জীবিত করবে, রক্তের কোষে কোষে হিল্লোল তুলবে, সংগ্রামে জয়ী করবে। তবে নয় কেন এটা? মিথ্যা হলেও কেন নয়?

৪৮

রবীন্দ্রনাথের গানের একটা বড় সাফল্য হল, এর ভেতর দিয়ে বাঙালিকে তিনি কবিতা ভালোবাসতে শিখিয়েছেন।

৪৯

যদি পৃথিবীতে না জন্মাতাম তবে এমন কিছুই হত না। (যে মানুষটি পৃথিবীতে জন্মালই না, সে তো থেকে গেল চির অপরিচয়ের ঘরে)। কিন্তু মানুষ হিসেবে যেহেতু একবার জন্মে ফেলেছি কাজেই বলতেই হবে আমি পা রেখেছি পুরোপুরি ইতিবাচকতার একটা রাজ্যে। এখন আমার একমাত্র কাজ এগিয়ে যাওয়া, উন্মিলিত হওয়া, বিচ্ছুরিত হওয়া, দরকারে বিস্ফোরিত হওয়া। এক কথায় আমার এই ইতিবাচক জন্মটাকে পুনর্জন্ম দেওয়া। কোনোকিছুকে না বলার অধিকারই আজ আমার নেই। আজ আমার একমাত্র কাজ একটি মাত্র অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত রাখা : সে শিখা 'হাঁ'-য়ের।

৫০

জুলজুলে চোখে তাকিয়ে লাভ নেই। বুড়ো মানুষদের উৎকট কাশির জন্যে তরুণীরা জন্মায় না।

৫১

সকালে হাঁটতে বেরিয়ে দেখলাম, শুধু 'ক' আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, 'শুধু তুমি কেন? অন্যেরা কোথায়?' ও বলল, 'ওরা বলছিল, আজ যেমন বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব, স্যার বোধহয় হাঁটতে চাইবেন না। বলে চলে গেছে।'

বললাম, দাখো জীব দুধরনের। ঠাণ্ডা রক্তের আর গরম রক্তের। ঠাণ্ডা রক্তের মানে যাদের রক্তের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে ওঠানামা করে। গরম কালে তাদের রক্তের তাপমাত্রা থাকে স্বাভাবিক, শীতকালে তারা যায় শীতনিদ্রায়। সাপ ব্যাঙ এ জাতের। কিন্তু মানুষ, হরিণ, হায়না, জাগুয়ার— এরা উষ্ণ রক্তের। পরিবেশ বা বাইরের তাপমাত্রার ওঠানামার সঙ্গে এদের যোগ নেই। ওদের বলে দিও, ওরা হাঁটতে এলেও হতাশ হত না। স্যারের গায়ের রক্ত সবসময় উষ্ণ। বিরুদ্ধ পরিস্থিতি দেখে থেমে যাওয়া আজও তাঁর অজানা।'

৫২

বেশিরকম উদারতা স্বার্থপরতারই শামিল।

৫৩

কিছু না দিয়েও মেয়েরা ছেলেদের অনেক কিছু দেয়। কিন্তু মেয়েদের কিছু দিতে চাইলে ছেলেদের 'সমরখন্দ বুখারা' দিয়ে দিতে হয়।

৫৪

অনেকে প্রায়ই জিগ্যেস করে, কী আমাদের ভবিষ্যৎ? কী হবে এই দেশের! সবসময় আমি একটা কথাই তাদের বলি : দেশের জন্যে শরীর থেকে যে কয় ফোঁটা রক্ত দেবে দেশের ঠিক তাই হবে। এক ফোঁটা বেশিও না, কমও না।

৫৫

মানুষের উপকার করতে যাওয়ার চেয়ে বিপজ্জনক কিছু নেই।

৫৬

কতদিন সোনার গাঁ-র বাসায় যাওয়া হয়নি। জানি না এর মধ্যে কতগুলো পূর্ণিমা রাত পুরো আকাশকে সোনালি করে আবার হারিয়ে গেছে।

৫৭

মৃত্যুকে একটু বেশি ভয় পেতেন শামসুর রাহমান। পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার বেদনা তাঁকে ছেঁড়াখোঁড়া করত। কী করে মৃত্যুকে মোকাবেলা করবেন, তাই ছিল তাঁর দুর্ভাবনা। কিন্তু মৃত্যুর দিন-কয়েক আগেই একটু একটু করে চেতনা হারালেন তিনি। নাকে নল, হাতে ডিপ, মুখে অক্সিজেনের মুখোশ পড়ে শুয়ে রইলেন

হাসপাতালের বিছানায়। একসময় প্রিয়জনদেরও আর চিনতে পারলেন না। জানলেনও না মৃত্যু কখন নিঃশব্দে তাঁকে নিজের ভেতর নিয়ে নিয়েছে।

'বিলুপ্তি আর বিলুপ্তিকে দেখা' একসঙ্গে কী সম্ভব?

৫৮

আমার ধারণা নিজেদের ব্যাপারে পুরুষদের মধ্যে একটা স্থূলতার অনুভূতি কাজ করে। তার ক্ষতিপূরণ করতেই কি তারা শিল্পের চন্দ্রমল্লিকা ফোটায়?

৫৯

ভীরুরা চায় সুখী হতে, সাহসীরা জয়ী হতে।

৬০

মৃত্যুর ভয় মৃত্যুর চাইতে ভয়াবহ।

বহুদিন আগে একটা গল্প শুনেছিলাম। খুবই মজার গল্প। একটি মেয়ে তার বাবার ব্যবহারে খুবই মর্মাহত হয়েছে। এমনই মর্মাহত যে সে ঠিক করেছে এর পর বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। সে আত্মহত্যা করবে। দৌড়ে গিয়ে বিষের একটা শিশি নিয়ে এল সে। ব্যাপার বুঝতে পেরে দিশাহারার মতো এগিয়ে এল তার প্রেমিক। হাঁটু গেড়ে করুণভাবে বারবার তার কাছে অনুনয় করল, যেন বিষটা সে না খায়। তার অনুনয়ের ভাষাও মর্মস্পর্শী : 'তুমি চলে গেলে আমার কী...! আমার দিকে তাকিয়েও অন্তত ... ইত্যাদি, ইত্যাদি।' কিন্তু মেয়েটি সিদ্ধান্তে অটল। বাবার এমন অমানুষিক ব্যবহারের পর সে আর বাঁচতে পারে না।

প্রেমিক যখন দেখল, মেয়েটি সত্যি সত্যি শিশির বিষটা মুখে ঢেলে দিচ্ছে তখন মরিয়া হয়ে সে হঠাৎ এক দুর্ধর্ষ কাজ করে বসল। পকেট থেকে পিস্তল বের করে হঠাৎ মেয়েটির মাথায় চেপে গর্জে উঠল, 'ফেল।' 'ফেল' কথাটা এমন বজ্রপাতের মতো উচ্চারণ করল যেন সত্যি গুলি করে দিয়েছে। আচমকা ভয়ে প্রেমিকা এমনভাবে চমকে উঠল যে তার হাত থেকে শিশিটা মাটিতে পড়ে গেল। গল্প এখানেই শেষ। এবার ঘটনাটাকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক। গল্পটার মধ্যে মেয়েটি যা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা সাক্ষাৎ মৃত্যু। কিন্তু পিস্তল উঁচোনো প্রেমিকের ধমক বা হুংকার মৃত্যু নয়, মৃত্যুর ভয়। কেননা প্রেমিকাকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতেই তার এই অসহায় চেষ্টা। প্রেমিক আর যাই করুক প্রিয়তমাকে গুলি করে তো আর মারতে পারে না।

অথচ দেখুন, গুলির ভয়ে সেই মৃত্যু কিভাবে মৃত্যুর ভয়ের কাছে হেরে গেল।

আমাদের সবার জীবনে এমনটাই হয়ত সবসময় হয়। ভয়ের সামনে জীবন বা মৃত্যু তো বটেই জীবনের সম্ভাবনাও হেরে যায়।

৬১

পৃথিবীর প্রতিটি কাঁটাই আসলে এক ধরনের ছদ্মবেশী ফুল, যেমন প্রতিটি পিছিয়ে পড়াই একেকটি এগিয়ে যাওয়া।

৬২

কী বিশাল একটা স্মৃতির জগৎ পেছনে পড়ে আছে। জীবনের কোনো কিছুই যেন অদেখা নেই।

৬৩

দুপাশ থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে দুটো সমুদ্র। এর একটার নাম অতীত একটার নাম ভবিষ্যৎ। আমরা কখনোই প্রায় আমাদের বর্তমানে থাকি না; থাকি ওই দুটোর মধ্যে। স্বাদে-গন্ধে-ভরা পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি আর অপরূপ আমটি খাওয়ার সময়ও আমাদের চোখে ভেসে ওঠে এক ধড়িবাজ প্রতারকের মুখ। দাঁত কড়মড় করে মনে মনে বলি :

"ধার নিয়ে পাওনা টাকা ফেরত দিসনিরে চশমখোর! যেদিন হাতে পাব সেদিন বুঝবি কত ধানে কত চাল।"

মনের এই অবস্থায় আমটা যে সত্যি কতটা অনবদ্য আর অপরূপ ছিল— কী করে বুঝব? সে সময় আমি তো আমটার মধ্যে ছিলাম না। ছিলাম ধাপ্পাবাজটাকে শায়েস্তা করার মধ্যে। এক কথায় অতীত আর ভবিষ্যতে।

সেটুকুই আমাদের স্মৃতি যেটুকু আমরা অতীত ভবিষ্যতে নয়— বর্তমানে বাঁচি। বর্তমানে বাঁচা মানে চৈতন্যের মধ্যে বাঁচা। এটা পারি না বলেই আমাদের স্মৃতির জগৎ ছোট হয়ে যায়। তাই বিশ বছর আগের ব্যাপারকে মনে হয় কালকের ঘটনা। যেন মাঝখানের এতগুলো দিনের বাকি সব কোটি কোটি স্মৃতি কিছুই না। ওই দিনগুলোর প্রায় প্রতিটি বর্তমান মুহূর্তকে অতীত আর ভবিষ্যৎ মিলে একযোগে গিলে ফেলেছিল বলেই এভাবে সব ভুলে যাই।

৬৪

বুড়ো হচ্ছি বলে দুঃখ নেই, দুঃখ কুৎসিত হচ্ছি বলে।

৬৫

কাউকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করা আর তাকে কর্তৃত্ব দিয়ে দেওয়া একই কথা।

৬৬

সুখী হবই বা হতেই হবে এমন কথার কোনো মানে নেই। আমরা যেন না ভুলি সুখ জীবনের একমাত্র কাম্য নয়। ভীরুরাই এভাবে ভাবে। হয়ত দুঃখী হতে ভয় পায় বলেই ভাবে। এরকম মানুষ একসময় তার নিজের ভয়ের প্রেমে পড়ে। ভয়কে ঈশ্বর বানিয়ে তার পায়ে ক্রীতদাস হয়। সুখ ছাড়াও জীবনের অনেক বড় বড় কাম্য জিনিশ আছে, যেমন মর্যাদা, জয়, কর্মোদ্যম, এসব। এগুলো পেতে সাহসী হতে হয়। বসুন্ধরা তো বীরভোগ্যা!

৬৭

টিকে থাকার জন্যে দুর্বল মানুষ কারো না কারো ঠ্যাং ধরে বাঁচতে চায়। তা সে কোনো মানুষেরই হোক, ঈশ্বরেরই হোক বা কোনো মত বা আদর্শেরই হোক।

৬৮

দূর থেকে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাকেও বিপজ্জনক লাগে।

৬৯

মাটি, গাছ-পালা, জোছনা, 'আকাশভরা সূর্য তারা', বিশ্ব, মহাবিশ্ব— সবাই প্রতি পলে আমাদের মনে সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে। হয়ত এর কারণ ওরা আর আমরা আসলে একই জিনিশ— জন্মেছি একই জিনিশ দিয়ে। তাই আমাদের আত্মীয় মন ওদের দেখলেই খুশি হয়। বিস্ময়ে সৌন্দর্যে শিউরে ওঠে। না হলে পৃথিবীর প্রতিটি জিনিশকে আমরা এভাবে ভালোবাসি কেন? এদের এমন অসহ্য সুন্দর লাগে কেন? কেবলই মনে হয়, এদের ডাকে আমরা যতটুকু সাড়া না দিই ততটুকই আমরা মৃত।

৭০

অবকাশ জিনিশটা যদি এত গুরুত্বপূর্ণ না হত তবে এত ছোট্ট একটা পৃথিবীর ওপর এত বড় একটা আকাশ কিছুতেই থাকত না।

৭১

চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর আগের গল্প। আমার তরুণ বন্ধু শাহজাহান মোল্লার বিয়ের আসর। আমি বসেছি ওর পাশেই। বিয়ের মৌখিক অনুষ্ঠানিকতা শেষে

কাজী ওকে চুক্তিনামায় সই করতে বললেন। সই করার সময় হঠাৎ দেখলাম শাহজাহান মোল্লার হাতটা অসুস্থভাবে কাঁপছে। তাতে ওর স্বাক্ষরটা এমন তেড়াবেঁকা হয়ে গেল যে স্বাক্ষরটা যে ওর বোঝাই মুশকিল। (ও কি মনের ভেতর চাচ্ছিল ওর স্বাক্ষর অন্য কারো স্বাক্ষরের মতো দেখাক!) মোল্লার কানের কাছে মুখ নিয়ে জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার? হাত এভাবে কাঁপছে কেন? ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোল্লা বলল, "সই করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, 'ঠইকা' গেলাম।"

মোল্লার দুঃখ আমি বুঝলাম। কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত বিশ্বসুন্দরী থেকে ইংল্যান্ডের রাজকন্যা— কেউ যার সম্ভাবনার বাইরে ছিল না, এখন একটা শাঁকচুন্নি পাওয়াও তার পক্ষে দুরাশা। একটা ছোট্ট স্বাক্ষর সবকিছুকে মুহূর্তে তছনছ করে দিয়ে গেছে। এমন ব্যাপার দুর্ঘটনা 'ঠকা' ছাড়া কী? কাল থেকে পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী রাস্তার দুপাশের জানালা ধরে ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে আর তাদের চোখের ওপর দিয়ে একটা চামড়া-ছোলা মুরগির মতো শাহজাহান মোল্লা গলা দোলাতে দোলাতে রাস্তা ধরে ছুটে যাবে, আর ওর ওই অবস্থায় মজা পেয়ে দুপাশের সারবাঁধা সুন্দরীরা করতালি দিয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করবে— এমন হাস্যকর পরিণতি ঠকে যাওয়া ছাড়া কী?

বিয়ের আসরে সবাই কি ওই শাহজাহান মোল্লা!

৭২

দুর্নাম উচ্চতর খ্যাতিরই অন্য নাম।

৭৩

ভালো ছাত্রেরা বড় লোকদের চাকর হয়। খারাপ ছাত্রেরা বড় লোক হয়।

৭৪

যৌবনে লোভ যেমন থাকে বেশি, তেমনি বেশি থাকে লোভ দমনের ক্ষমতা। বার্ধক্যে লোভের সাথে লোভ দমনের ক্ষমতাও কমে যায়।

৭৫

ভবিষ্যৎ আদৌ আসবে কি না কে জানে? বর্তমান আসার আগেই চলে গেছে। অতীত কবে মরে ক্ষরে ছাই। জীবনটা কোথায় তাহলে?

৭৬

জীবনের বাতিগুলো এক এক করে নিভে যাচ্ছে। প্রতিটা সকালকেও যেন ভয় করতে শুরু করছি।

৭৭

কাউকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে তার কাছে নিজেরও প্রশ্রয় চাওয়া।

৭৮

দুষ্টুমিতে রাইসু'র সমান কেউ নয়। ও তখন দৈনিক 'প্রথম আলো'য় কাজ করে। ওর সম্পাদক বা বিভাগীয় সম্পাদক ওকে লেলিয়ে দিয়েছেন আমার কাছ থেকে একটা লেখা আদায় করতে। কাজের চাপে আমার মরার সময় নেই। কখন লিখি? তাই ও ফোন করলে প্রতিবারই ওর সঙ্গে নানারকম তানানানা করে কাটিয়ে দিই। ফোন করতে করতে ও একসময় একেবারেই কাহিল হয়ে পড়ল। তবু আশা ছাড়ার উপায় নেই। সম্পাদকের চোখরাঙানি। আবার ওর ফোন পেলাম। এবার গলার স্বর একেবারেই মিয়োনো।

আমিও কাঁচমাচু হয়ে বললাম, কে? রাইসু?
রাইসু করুণভাবে বলল, স্যার, লেখা হইসু?

৭৯

রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি যত বেশি ভুলছে ঠিক সেই পরিমাণে তাঁকে দেবতার আসনে বসাচ্ছে।

৮০

কলেজে পড়ার সময় গোটাকয় উপন্যাস পড়েছিলাম। একটা উপন্যাসে নায়ক নায়িকার একটা অদ্ভুত সংলাপের কথা মনে পড়ে। সংলাপটা সাধুভাষার। কথাবার্তা কিছুই মনে নেই। তবে ধরনটা এরকম :

(প্রথমে) নায়ক কহিল, "... ... ..." ইত্যাদি ইত্যাদি।
(এরপর) নায়িকা কহিল : "... ... ..." ইত্যাদি ইত্যাদি।
(আবার) নায়ক কহিল, "... ... ..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবে ছ'সাত বার যাবার পর একবার যেই নায়ক নায়িকাকে কিছু একটা প্রশ্ন করেছে তখন লেখক লিখছেন, "নায়িকা তাহার কথার কোনো উত্তর দিল না। এক

দৃষ্টে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।"

লাইনটা পড়ে খুব চটে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কথা বলছে না কেন মেয়েটা? নায়ক কিছু একটা জানতে চাচ্ছে, উত্তর তো অন্তত দিবি! "জানালা দিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।" ... এ আবার কী?

তখন বয়স অল্প, শব্দের শক্তিকেই তখন কেবল বুঝি। নৈঃশব্দের শক্তি যে এর চেয়ে কত শক্তিশালী, তা একেবারেই অজানা।

৮১

দুঃখের মতো আনন্দের সময়কেও বেশি দীর্ঘ হতে দেওয়া উচিত নয়।

৮২

বিয়ের আগে প্রেম অপার্থিব, বিয়ের পর বন্ধুত্ব। বিবাহিত জীবনে যে প্রেম খোঁজে তার চেয়ে দুর্ভাগা বেশি নেই।

৮৩

ছেলেবেলায় কারো কাছ থেকে একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্পটা এরকম : বর্ধমানের মহারাজা গিয়েছেন কোচবিহারের মহারাজার বাড়িতে, তাঁর মেয়ের বিয়েতে। রাজ-ময়রার নিজের হাতে বানানো সন্দেশ খেয়ে তিনি তো অভিভূত। সন্দেশের স্বাদ এমন অলৌকিক হতে পারে? ময়রাকে ডেকে তিনি বললেন, দেখো, তোমার সন্দেশ খেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আসছে শীতে আমার মেয়ের বিয়ে। বড়লাট ছোটলাট তো আসবেনই, দেশ বিদেশের অনেক রাজা মহারাজাও আসবেন। সেখানে তোমাকে হুবহু এই সন্দেশ বানিয়ে খাওয়াতে হবে। সন্দেশ খাইয়ে আজ আমাকে যে আনন্দ দিলে তখনও সবাই যেন তা পায়।

বর্ধমানে গিয়ে ময়রা জীবনপণ করে সন্দেশ বানাল। ময়রা-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সন্দেশ তৈরির যত কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিল সব দিয়েই বানাল সে। তার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটা। তার ময়রা-জীবনের এই চরম অগ্নিপরীক্ষায় এতটুকু অবহেলার সুযোগ নেই।

সন্দেশ পরিবেশনের আগে মহারাজ স্বয়ং এসে সবার আগে তার স্বাদ নিলেন। আজ সবরকম খাবারের মধ্যে এই সন্দেশই তাঁর মান বাঁচাবে। সবার মুখে মুখে ঘুরবে এর অলৌকিক স্বাদ আর সুঘ্রাণের অকুণ্ঠ জয়গান। কিন্তু সন্দেশ মুখে দিয়েই মহারাজা কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লেন। ভ্রু কুঁচকে উঠল তাঁর। না কুচবিহারের সেই সন্দেশের স্বাদ তো তিনি পাচ্ছেন না। পরদিন মহারাজের

দরবারে ডাক পড়ল ময়রার। মহারাজ বললেন, কুচবিহারের সন্দেশের সেই স্বাদ তো পেলাম না ময়রা। এ যেন গড়পড়তা সব সন্দেশের মতোই। শুনে ময়রা বলল, আমিও তা বুঝতে পেরেছি মহারাজ! কুচবিহার থেকে সবই ঠিকঠাক এনেছিলাম। চেষ্টারও ত্রুটি করিনি। শুধু একটা জিনিশ আনতে না পরায় শেষ পর্যন্ত সব ভেস্তে গেছে।

মহারাজ প্রশ্ন করলেন, কী সেটা?

আবহাওয়া মহারাজ। শুধু কুচবিহারের আবহাওয়াটা সঙ্গে করে আনতে পারিনি। ও না হলে হুবহু ওরকমটা যে হয় না মহারাজ।

কেবল সন্দেশ না, সব কিছুই যথাযথ হওয়ার জন্যেই হয়ত এই আবহাওয়াটা লাগে। মানবজগতের বিপ্লব বা যুগান্তরের কথাই বলি বা প্রতিভার বিস্ময়কর উত্থানের কথাই ধরি— সবকিছুতেই ওই আবহাওয়াটা জরুরি। ওই কালের বাস্তব দুঃখ আর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে না পারলে ওইসব সংগ্রাম কি সম্ভব, না জন্ম নেওয়া সম্ভব ওইসব মানুষের?

ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়ায় না জন্মে রবীন্দ্রনাথ যদি সুমাত্রার কোনো গহিন জঙ্গলে জন্মাতেন তবে কি তিনি রবীন্দ্রনাথ হতেন?

'সব খাঁটি জিনিশ' হতেই আবহাওয়া লাগে। তা সে কোচবিহারের সন্দেশই হোক আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই হোক।

৮৪

পৃথিবীতে যতজন মুসলমান আছে ততগুলো ইসলাম ধর্ম আছে।

৮৫

অন্যদের কথা ভাব, নিজেকে নিয়ে বেশি ভাবার সময় পাবে না।

৮৬

তখন আমার বয়স বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। এক পার্টিতে হঠাৎ করেই অলৌকিক এক সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় হল। বয়স তার তখন বাইশ-তেইশ। সে সময়কার সেরা সুন্দরী না হলেও তার চেয়ে রূপসী মেয়ে তখন এই শহরে খুব বেশি ছিল না।

তখন আমি টেলিভিশনের স্টার। পরিচয় থাক না থাক, আমাকে কারো না চেনার কথা নয়, দেখা হলে তো কথাই নেই।

আর সে-ও যেমন সুন্দরী, তাকে একবার দেখা মানে প্রায় চিরদিনের জন্যেই দেখা।

বছর চার-পাঁচ পর আর এক পার্টিতে তার সঙ্গে আবার দেখা। মেয়েটি আমাকে দেখে খুশিতে ঝমঝম করতে করতে ছুটে এসে বলল, চিনতে পারছেন? হঠাৎ দেখলাম, স্মৃতি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে। মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক কখন কোথায় দেখেছি মনে পড়ছে না।

বললাম, মানে ঠিক ...

মেয়েটি খুবই অভিমানী হয়ে পড়ল। এসব রূপসী মেয়েদের এমন ঘটনায় হয়ত আহত হওয়ারই কথা। বলল, 'আমাকে চিনতে পারলেন না!' হঠাৎ করেই চোখের ঝাপসা ভাবটা কেটে গেল। তাকে চিনতে পারলাম। লজ্জা পেয়ে বললাম, চিন্তা করে দেখো, কী বয়সই না হয়েছে যে সুন্দরীদের চেহারা পর্যন্ত মনে রাখতে পারছি না।

সেই ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বছর বয়সে নিজেকে সেদিন কত বয়সীই না মনে হয়েছিল। আজ এই চুয়াত্তর বছরের তুলনায় সে বয়স কৈশোর ছাড়া কী?

৮৭

আমি হতাশায় নিষ্ক্রিয় হলাম মানেই একজন দুর্নীতিবাজ বিজয়ী হল।

৮৮

বহুদিন আগে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র শুরু হওয়ার বছর দশেক পরে, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হেদায়েতুল ইসলাম একবার কেন্দ্রে এসেছিলেন বক্তৃতা করতে। বক্তৃতার শেষ পর্বে মুক্ত আলোচনার সময় হঠাৎ একজন প্রশ্ন করল, বলুন তো স্যার, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তৈরি করতে গেলেন? এক মুহূর্তে দেরি না করে অধ্যাপক ইসলাম বললেন, বন্ধু জন্ম দেওয়ার জন্যে।

প্রশ্নকারী বলল, আরেকটু বুঝিয়ে বলবেন?

অধ্যাপক বললেন, খুব সম্ভব কোনো এক সময় উনি খুবই নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন হয়ে পড়েছিলেন। দেখছিলেন চারপাশে নিজের চিন্তাভাবনাগুলো বলার মতো মানুষ খুঁজে পাচ্ছেন না। কেউ তাঁকে বুঝছে না। তাই চেষ্টা করছিলেন : এমন একটা পড়াশোনা আর সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করতে যে আবহাওয়ায় তাঁরই কাছাকাছি মানুষেরা বেড়ে উঠবে, যারা তাঁকে বুঝবে, তাঁর বন্ধু হবে, যাদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ সময় কাটিয়ে সেই শ্বাসরুদ্ধকর নিঃসঙ্গতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন।

প্রতিটি মানুষই কি নিজের বাঁচার উপযোগী একটা কাম্য সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্যেই আজীবন পাহাড়-পর্বত ভেঙে কাজ করে? কে বলবে?

৮৯

অপরাধ করে ক্ষমা পাওয়ার চেয়ে তার জন্যে শাস্তি পাওয়া অনেক সম্মানের।

৯০

...ওর ছোট্ট ছেলেটাকে কোনোদিন রাস্তায় একা বেরোতে দেয়নি। ছেলেটা এখন ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পড়ছে। এখনো সেই নিষেধাজ্ঞা— মমতার সেই নিষ্ঠুর কঠিন শৃঙ্খল। বাস্তব জীবনটার কিছুই শিখল না ছেলেটা। প্রায় বিকলাঙ্গই হয়ে থাকল। একদিন ওকে বললাম, কেন ছেলেটাকে ভীরুর মতো এভাবে আগলে রাখছ? নিজের আতঙ্ক দিয়ে অসুস্থের মতো ওকে পঙ্গু করছ? কীভাবে বৈরী পরিবেশ বা বাস্তব বিপদ-আপদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে বাঁচতে হয়, কেন ওকে শিখতে দিলে না? এখন হয়ত শৈশবে রাস্তা পেরোতে না দিয়ে ওকে রাস্তার বিপদ-বিপর্যয় থেকে বাঁচালে কিন্তু ঠিক জেনো, ও রিক্সাচাপা পড়বে পঞ্চাশ বছর বয়সে গিয়ে, যখন ওকে বাঁচানোর জন্যে তুমি ওর পাশে থাকবে না।

কথাটা বলতে বলতেই একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ল। বাংলা মোটরের কাছে কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউর রোড-ডিভাইডারটার একটা ছবি। ডিভাইডারটা যেমন নিচু তেমনি সরু। চওড়ায় কিছুতেই হাত দেড়েকের বেশি হবে না। একদিন দেখি একটা টোকাই— 'পথকলি'— বয়স বছর দশেকের বেশি নয়— বিকেল তিনটা-চারটার দিকে ওই ডিভাইডারটার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে— ওর দুপাশ দিয়ে হাজার হাজার গাড়ির উন্মাদ মৃত্যুস্রোত সংক্ষুব্ধ গর্জনে হুহুংকার করে ছুটে চলেছে। পলকের জন্যে ঘুমের মধ্যে কোনো দিকে একটু কাত হলেই চিরদিনের মতো শেষ।

ছেলেটি কি ওই রাস্তার ওপর কোনোদিন মরবে? কখনও না। ও তো শিখে গেছে ওই মৃত্যুসন্ত্রাসময় রাস্তার ওপর কী করে বাঁচতে হয়।

৯১

রাজা মাটিতে বসলেও তার নামই সিংহাসন। বানর সিংহাসনে বসলেও রাজা হয় না।

৯২

কী ঝলমলে জীবন মেয়েটার মধ্যে। যেন শিশু গাছের কোটি কোটি পাতার রাজ্যে উচ্ছল হওয়ার সারাক্ষণ কুচি কুচি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া।

৯৩

ধরা যাক একটা ট্রেন— সোজা একটানা একটা লাইনের ওপর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে অনন্তের দিকে ছুটে চলেছে আর তার ধার ঘেঁষে একইরকম সোজা একটা রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলছি আমরা। ট্রেনটার সঙ্গে চলছে আমাদের প্রতিযোগিতা। আমরা যখন জোরে ছুটে ট্রেনটাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি তখন আমরা জীবনের ওপর জয়ী। যেমন জয়ী হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, অ্যারিস্টটল, বালজাক, গ্যেটে, নেপোলিয়ন।

চটপটে গতিতে ট্রেনটার সঙ্গে তাল ফেলে যারা চলছে তারা সপ্রতিভ মেধাবী মানুষ। সংখ্যায় এরা অনেক। এদের বিপুল অবদানেই ধরিত্রী শস্যভারনম্র। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের গতিই ট্রেনটার চেয়ে কম। অনেকের একেবারেই কম। ট্রেন উধাও গতিতে হারিয়ে যায়, গাছের গুঁড়ির মতো এরা রাস্তার পাশে বসে ট্রেনের পেছনের কামরার লাল আলোটাকে জুলজুলে চোখে তাকিয়ে দেখে। এরাও ট্রেনটাকে হারিয়ে দেবার জন্যেই জন্মেছিল, কেবল নিজেকে না-চেনার ফলে পেছনে থেকে গেল।

৯৪

কী ছন্দোময়তা সেই হাঁটায়। সামনে দিয়ে যেন কোনো ময়ূরাক্ষী চলে যাচ্ছে।

৯৫

বোঝার ওপর শাকের 'আঁটি' প্রবাদটা শুনলে সবসময় মনে হত যে-মানুষটা এত বিরাট একটা বোঝা টানতে পারছে তার ওপর ছোট এত্তটুকুন একটা শাকের আঁটি চাপালে তা আবার কষ্টের হবে কেন? জীবনভর অনেক বোঝা টেনে এখন বুঝি শাকের আঁটির ওজন এমনিতে কিছু নয়, কিন্তু ঘাড়ের ওপর যার ইতিমধ্যেই একটা ভারী আর বড়সড় বোঝা রয়েছে তার ঘাড়ে ওই ছোট্ট আঁটিটা ঠিক একই আকারের আর একটা বড়সড় বোঝা।

৯৬

কাউকে কিছু দিতে চাওয়াও তো এক ধরনের চাওয়াই।

৯৭

কেন্দ্রের পরিচালক হুমায়ুন কবীর খুবই রসিক আর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ।

সেদিন ও সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের উল্টোদিকে বেসরকারি সংস্থা 'আশা'র বিশাল ভবনের নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওখান থেকে ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেব। আমি পৌঁছোলে ও গাড়িতে উঠেই বলল, স্যার ওই বিরাট দালানটার নিচে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, আপনার এসব চেষ্টা-আন্দোলন দিয়ে শেষপর্যন্ত কিছুই হবে না।

'কেন?'

ও বলল, 'আপনি যে বলেছেন, 'আলো চাই'। এজন্যে।'

'কী করলে কিছু হত?'

'আলো চাই' না বলে যদি শুধু বলতেন 'আলু চাই', তাহলে দেখতেন টাকায় কেন্দ্র সয়লাব হয়ে গেছে। আপনার তাবৎ স্বপ্ন এক ধাক্কায় পূরণ। আর ওই যে আপনার 'আলোকিত মানুষ চাই'— ওটা না বলে শুধু যদি বলতেন 'আলু'কিত মানুষ চাই', দেখতেন কীভাবে কেল্লা ফতে হয়।

৯৮

আমার ছোট মেয়ে জয়া তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। এমনিতেও ও ছাত্রী ভালো। দুটো পেপার ভালোও হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় দিন পরীক্ষার পর বাসায় ফিরে চুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওর চেহারা ফ্যাকাশে। কথা বলে বুঝলাম আজকের পেপারটার প্রস্তুতি ছিল ওর সবচেয়ে ভালো। সেই পেপারেই সবচেয়ে খারাপ।

আমি ওকে বললাম, আজ সবচেয়ে ভালো প্রস্তুতির তুলনায় যেমন তুমি সবচেয়ে খারাপ করলে, আরেকদিন দেখবে, সবচেয়ে খারাপ প্রস্তুতি নিয়ে তুমি সবচেয়ে ভালো করে ফেলেছ। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কোনো একটামাত্র পেপারের ভালো বা খারাপ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল নয়। সবগুলো পেপারের ভালো বা খারাতের গড়টাই হল ফল।

হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয় বলে ছোট আঙুলগুলো নিয়ে কি আমরা হতাশায় ভেঙে পড়ি? আমরা জানি ছোটবড় আঙুলগুলোর প্রতিটারই দরকার সমান। সবাই সবার পরিপূরক। তাই ওদের বড়-ছোট হওয়াই কাম্য। আর ওরা সেরকম বলেই সবাই মিলেঝুলে কাজ করেই তো মানবজাতিকে এমন অবিশ্বাস্য আর অলৌকিকের স্রষ্টা করতে পেরেছে।

৯৯

মানুষের আয়ু লক্ষ বছর হলেও জীবনকে মানুষ ছোটই বলত।

১০০

আমাদের গ্রামে ছিল এক বুড়ি। তার ছিল একটা তালগাছ। ভাদ্রমাসে ওই গাছটায় তাল পাকত। পাকা তালের বোঁটাগুলো এমন নরম হয়ে যেত যে গাছে সামান্য হাওয়া উঠলেই একেকটা তাল বিকট শব্দে মাটির ওপর আছড়ে পড়ত। বুড়ি ছুটে গিয়ে গাছের তলা থেকে তালগুলো কুড়িয়ে আনত।

একদিন ওরকম বাতাস উঠতেই ধুপ করে মাটিতে পড়েছে একটা তাল। বুড়ি গেছে তালটা কুড়োতে। সেখানে গিয়ে যেই না তাল তুলতে বাঁকা হয়েছে অমনি শব্দ তুলে ধুপ করে আর একটা বিশাল তাল পড়েছে তার পিঠের ঠিক বাঁকা জায়গাটার ওপরেই। আর এমন নিপুণভাবেই পড়েছে যে বুড়ির কোমরটাকে স্থায়ীভাবে বাঁকা করে দিয়েছে। কুঁজো বুড়ি ওই বাঁকা কোমর নিয়ে বাজারে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াত। আর ভাদ্রমাসের বাতাসে তার গাছ থেকে তাল পড়তে শুরু করলে গাছটাকে সে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে অভিশাপ দিতে থাকত।

আজ রাজনৈতিক দলগুলোর নব্বইভাগ মানুষের মধ্যে ওই মাজাবাঁকা বুড়িটাকে দেখি। মনে হয় যেন কোনো অদৃশ্য তালের ঘায়ে তাদের বিশ্বাস আর চিন্তাভাবনাগুলো এমনভাবে শক্ত আর শানবাঁধানো হয়ে গেছে যে কিছুতেই সেখান থেকে নড়ানো যায় না।

১০১

সবদেশে রাজনীতিবিদরা টাকা চায় ক্ষমতার জন্যে, আমাদের রাজনীতিবিদরা ক্ষমতা চায় টাকার জন্যে।

১০২

ঘুম সম্বন্ধে সচেতনতার নামই নিদ্রাহীনতা।

১০৩

আমার বড় মেয়ে লুনা তখন ক্লাস টেন-এ পড়ে। আমরা থাকি বেইলি স্কোয়ার অফিসার্স কলোনিতে। ঠিক সেই সময় আমাদের পেছনের দালানের নিচের তলায় এক ভদ্রলোক এসে উঠলেন। তিনি সিভিল সার্ভিসের অফিসার, বছর তিনেক দুবাইয়ের বাংলাদেশ দূতাবাসে কাজ করে ঢাকায় ফিরেছেন। তাঁরও একটা মেয়ে আছে লুনার বয়সী, তাকে নিয়ে তিনি প্রায়ই বিকেলে হাঁটতে বেরোন। তাঁদের হাঁটতে দেখে লুনার খুব ইচ্ছা বিকেলে আমার সঙ্গেও ওভাবে মাঝে মধ্যে হাঁটে।

কথাটা সংকোচে ও আমাকে সরাসরি জানাতে পারেনি। জানিয়েছে ওর মা-কে। কিন্তু বিকেল-সন্ধ্যায় তো কেন্দ্রের অফিস। কী করে ওকে নিয়ে হাঁটব। শেষে একদিন কোনোমতে সময় করে বেরোলাম। বাসা থেকে পঁচিশ গজও যাইনি, হঠাৎ একটা লোক প্রায় মাটি ফুঁড়ে সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

"টিভি-তে এমন অসাধারণ অনুষ্ঠান করছিলেন, এরকম অনুষ্ঠান কেউ থামিয়ে দেয় নাকি, এ্যাঁ?" এর পরে আরম্ভ হল নসিহত। "ওসব চলবে না। আপনার ওই অনুষ্ঠানগুলো প্রতি সপ্তাহে চাই। সপ্তাহে কেন, সম্ভব হলে প্রতিদিন, বুঝলেন?"

তাঁর কথার ফাঁকে কখন যে আরও ছ-সাতজন লোক ছায়ার মতো আমাকে ঘিরে ফেলেছে, টের পাইনি। তখন আমার জীবনে টেলিভিশনের জমজমাট যুগ। তাঁদেরও মোটামুটি প্রশ্ন টেলিভিশন নিয়েই। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে না দিতেই হাজির হলেন একদল কলোনিবাসী প্রবীণ। মসজিদে নামাজ সেরে দল বেঁধে বাসায় ফিরছিলেন। আমাকে পেয়ে তাঁরা যেন দিলদরাজ হয়ে উঠলেন।

"দম্পতি চেনার ব্যাপারটা সেদিন যা দেখালেন না! বিশেষ করে বয়স্ক দম্পতি চেনার ব্যাপারটা! অসাধারণ! দম্পতির অভিনয়ে ছিলেন কারা? আসল দম্পতি নাকি আবার? না হলে— " খ্যা খ্যা করে হেসে উঠলেন মসজিদ ফেরত লোকগুলো।

এতরকম প্রশ্নও করতে পারে মানুষ? "এরপর কী নিয়ে টিভিতে আসছেন? বিনোদনমূলক না অন্য কিছু।" এসব করতে করতেই প্রায় আধঘণ্টা চলে গেছে। এর মধ্যে ভিড় জমিয়ে ফেলেছেন অফিসফেরত আরও কিছু লোক— কলোনির শিক্ষকদের বাসায় কোচিং শেষ-করা ছাত্র, উদ্দেশ্যহীন পথচারী, আরও অনেকে। নানাজনের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হিমশিম। আমাকে ঘিরে তখন প্রায় একটা ছোটখাটো জনতা।

হৈ হট্টগোলে লুনার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়তেই ওকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলাম। একবার ভাবলাম হয়ত অভিমান করে চলে গেছে। খোঁজাখুঁজির পর ওকে পাওয়া গেল, দূরে, ভিড়ের অনেক পেছনে, মাথা নিচু করে একা দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হল, বলি, লুনা, এই তোমার আব্বু! তোমার হাত ধরে হেঁটে বেড়ানোর দুদণ্ডের আনন্দ কোনোদিনই তার কপালে নেই।

১০৪

গণতন্ত্রে যে পরিমাণ সন্ত্রাস থাকবে তা ঠিক সেই পরিমাণেই গণতন্ত্রহীন।

১০৫

যে কোনোদিন ভুল করেনি সে নিশ্চয়ই কোনো কাজও করেনি।

১০৬

নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করতে পারার মতো সুবিধা আর কিছুতেই নেই।

১০৭

একজন পুরুষ জীবনে যতজন মেয়েকে দেখে হয়ত ততবারই সে প্রেমে পড়ে।

১০৮

মেয়েরা যদি জীবন-প্রাণ বাজি রেখে নয়ন-লোভন সাজগোজ করে সোনা-গয়নায় এমন নিরুপমা বা উর্বশী হতে চেষ্টা না করত তবে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই দেখতে সুন্দর লাগত না কি?

১০৯

বছর দশেক আগে কেন্দ্রের প্রথম দিকের ছাত্র আবদুন নূর তুষারের উপস্থাপিত টিভির একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে ছোট্ট একটা পর্ব করেছিলাম। পর্বটিতে তুষার আমাকে জিগ্যেস করেছিল, শহরের বাড়িঘরের ছাদের তারে যেসব কাপড় শুকোতে দেখা যায়, সেগুলো দেখে বাড়িগুলোর ভেতরের ইতিহাস অল্পস্বল্প আঁচ করা যায় কিনা?

বলেছিলাম, যায়।

কীভাবে?

আমি উত্তরে বলেছিলাম, যদি দেখ কোনো মধ্যবিত্ত বাড়ির ছাদে তারের ওপর শুধু এমনি একটা ট্রাউজার ঝুলছে— (এরপর পর্দায় আমি বা তুষার আর নেই, আছে শুধু সেই মধ্যবিত্ত বাড়ির ছাদ আর কিছুদিন পরপরই ছাদের ওপর শুকোতে দেওয়া কাপড়ের বদলে-যাওয়ার দৃশ্য)— তাহলে বুঝবে এই বাড়িতে একজন অবিবাহিত যুবক থাকে।

যদি দেখ বাড়িটির পাশের বাড়ির ছাদের ওপর প্রায় একইভাবে ঝুলছে একটা মার্জিত রঙের ছিমছাম পরিশীলিত শাড়ি তাহলে বুঝবে পাশের বাড়িতে একটি রুচিশীল মধ্যবিত্ত পরিবার থাকে এবং সে বাড়িতে একজন যুবতী মেয়ে আছে।

যদি দেখ ট্রাউজারটা ঠিকঠাক শুকোচ্ছে কিনা দেখার জন্যে যুবকটি দিনের মধ্যে বারকয়েক বাড়ির ছাদে উঠতে শুরু করেছে আর পাশের ছাদের দিকে আড়ে

আড়ে তাকাচ্ছে তাহলে বুঝবে মেয়েটিকে নিয়ে তার মনে রঙিন স্বপ্নের বিষণ্ন আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে।

এরপর একদিন হঠাৎ যদি দেখ ছাদের তারে যুবকটির ট্রাউজারটি তো ঝুলছেই, তার পাশেই ঝুলছে একটি সূক্ষ্ম কারুকাজ করা দৃষ্টিনন্দন শাড়ি তাহলে বুঝবে মেয়েটিকে ছেলেটির ভালো লাগা শেষ অব্দি দুজনের প্রেমে গড়িয়েছিল এবং সে প্রেম এখন বিয়েতে রূপ নিয়েছে।

এর কিছুদিন পরে যদি দেখ শাড়ি-ট্রাউজার তো ঝুলছেই তার পাশেই পতাকার মতো পত পত করে ঝুলছে রঙ-বেরঙের গোটাকয় নতুন জাঙিয়া আর ছোট ছোট শার্ট-প্যান্ট তখন বুঝবে বাড়িতে নবজাতকের আগমন ঘটেছে।

আবার যদি একদিন দেখ শাড়িও নেই, জাঙিয়াও নেই, তারের ওপর মরা সাপের মতো পড়ে আছে শুধু আগের সেই চুপসে-যাওয়া করুণ ট্রাউজারটি তখন বুঝবে দাম্পত্য কলহের ফলশ্রুতিতে স্ত্রী রয়েছে এখন বাপের বাড়িতে আর স্বামী যাপন করছে আগের মতো অবিবাহিতের নিঃসঙ্গ জীবন।

এরপর হঠাৎ একদিন যদি দেখ, শাড়ি জাঙিয়া তো ফিরে এসেছেই, সেই সঙ্গে বেশ কিছু ছোট মাপের ট্রাউজার-সালোয়ার-কামিজও তারে ঝুলছে, তখন বুঝবে স্ত্রীর মান ভেঙেছে। সে তো ফিরে এসেছেই আর সেই আনন্দে গোটাকয় শালাশালিও তার সঙ্গে চলে এসেছে।

কিন্তু একদিন যদি দেখ এমনি : ট্রাউজার নেই, শাড়িও উধাও, সালোয়ার-কামিজ, ফ্রক-ন্যাপকিন-জাঙিয়া বা এতদিনের যতকিছু — তার কিছুই নেই; বদলে তারের ওপর ঝুলছে শুধু একটা রঙচটা পুরনো পাঞ্জাবি, তখন বুঝবে পরিবারটি বাড়ি থেকে উঠে গেছে, এখন এ বাড়িতে থাকছে এক নিঃসঙ্গ বিষণ্ন বৃদ্ধ— তার নাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

যদি কোনোদিন রাত দশটার দিকে চমকে উঠে শোনো রাস্তা থেকে চিৎকার করে কেউ একজন বলছে : পাঞ্জাবিটা এতদিন ধরে একইভাবে ঝুলে আছে কেন? বাড়িতে কেউ থাকে না নাকি আজকাল? আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কোথায়? তখন কোনো জায়গা থেকে একটা অপরিচিত কণ্ঠের প্রত্যুত্তর তুমি শুনতে পাবে : যতদিন পাঞ্জাবিটা তার ছিঁড়ে নিচে পড়ে একসময় ছাদের সাথে মিশে না যাচ্ছে ততদিন ওটা ওখানে ওভাবেই ঝুলবে। ওটা সরানোর কোনো লোক এখন আর এ বাড়িতে নেই।

১১০

বিশ্বাসকে এভাবে জ্ঞানের ওপর চাপানো কেন? জ্ঞানই হোক আমাদের বিশ্বাস।

১১১

যে কথাগুলো আমাদের জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক সেগুলোই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা।

১১২

কোনো প্রেমই স্বাভাবিকভাবে মরে না। নীরব অশ্রুর সঙ্গে তাকে একসময় আমাদের খুন করতে হয়।

১১৩

এক ভদ্রলোকের কাছে একবার একটা দামি কথা শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, দেখবে, প্রতিটা মানুষ সবসময় কথা বলে একটিমাত্র ভাষায়। ধরো একজন ডাক্তার। দেখবে সারাক্ষণ তিনি কথা বলছেন ডাক্তারির ব্যাপার নিয়ে। ওষুধ, পথ্য, স্টেথোসকোপ, ইনজেকশন, ট্রমা, ইনজুরি, ইসিজি, ইনভেসটিগেশন— এসব নিয়ে। একজন ব্যাংকারের কথা আবার অন্যরকম : লোন, ডিপোজিট, ডেবিট, ক্রেডিট, চেক, ডিফল্টার, পোস্টিং, অ্যাডভান্স— এসব। এরা সবাই গড়পড়তা মানুষ। দুনিয়াতে এরা আছে লাখে কোটিতে। কিন্তু যদি কখনো দেখ কোনো মানুষ কথা বলছে একের বেশি ভাষায়, অন্তত দুটো ভাষায়— শিশুর সঙ্গে যেমন কথা বলছে তেমনি বলছে বৃদ্ধের সঙ্গে, যেমন কথা বলছে কবিতা নিয়ে তেমনি ব্যবসা নিয়ে, জোছনার পাশাপাশি রাজনীতি নিয়ে— তখন বুঝবে সে গড়পড়তার ওপরে। এরা কোটিতে গুটিক। দুভাষায় কথা বলতে পারে বলে তারা হাজার ভাষায়ও কথা বলতে পারে ।

এরা আসলে দ্বিমাত্রিক মানুষ। জগৎ সংসারের মূলে মাত্রা তো মাত্র দুটোই, যেমন সরল রেখা আর বাঁকা রেখা— আসমানদারি আর দুনিয়াদারি, বাস্তব আর স্বপ্ন। এই দুটো দিয়ে তুমি মহাপৃথিবী বা অনন্তকালকে রচনা করতে পারবে। তাই দ্বিমাত্রিক হওয়া মানেই হাজার মাত্রিক হওয়া— একটিমাত্র মানুষের মধ্যে হাজার মানুষকে খুঁজে পাওয়া। প্রতিটি মানুষ একেকটা আকাশ, পার্থক্য কেবল তারার বৈচিত্র্যে।

১১৪

আজ আমাদের সবচেয়ে সৎ মানুষটিও সবচেয়ে দুর্বৃত্তের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে।

১১৫

সুখ আর মাদক দুটোই আনন্দের। পার্থক্য হল :

প্রথমটাকে উপভোগ করি আমরা আর দ্বিতীয়টা উপভোগ করে আমাদের।

১১৬

একসময় জীবনের হিসাব করতাম শৈশব কৈশোর যৌবন বার্ধক্য দিয়ে। বয়স বাড়লে হিসাব শুরু করলাম বছর দিয়ে। এরপর হিসাব শুরু হল মাস দিয়ে। বয়স আরও বাড়লে মাস নেমে এল দিনে।

এখন হিসাব চলছে মিনিটে সেকেন্ডে। এরপর যা আছে তার নাম কী, বন্ধুরা?

১১৭

কবিতা মুখস্থ করতে পারা অর্ধেক আবৃত্তির সমান।

১১৮

আমার স্ত্রীর বাড়ি ঢাকার আশেপাশে। ওটা ব্যবসায়ীদের শহর। সেখানে রাস্তাঘাট বাড়িঘর যেখানে যাও সবখানে শুধু টাকার জয়জয়কার। মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা, আশা, আশাভঙ্গ, স্বপ্ন, দুরাশা, আনন্দ, আহাজারি সব টাকা নিয়ে। কে খড় বেচে কোটিপতি হল, বেগুন বেচে প্রাসাদ বানাল, এসব স্বপ্ন আর হাহাকার দিয়ে সেখানকার আকাশ মুখর।

বিয়ের বছরদুই পরে আমার বড় মেয়ে হল। ওকে নিয়ে যে বাড়িতেই যাই সেখানেই দেখি ওকে কিছু না কিছু সোনার গয়না দিচ্ছে। কেউ দিচ্ছে নেকলেস, কেউ টিকলি (যদিও বিয়ে হতে তখনো অনেক দেরি), কেউ চুড়ি, কেউ বালা, কেউ আংটি, কেউ নূপুর, এমনি। শুধু সোনা আর সোনা। মনে মনে ভাবতাম কী অকর্ষিত আর স্থূল লোকগুলো। সোনা রুপা ছাড়া কিছুই চেনে না। একটা ছোট্ট শিশু— ওকে সুন্দর, বিচিত্র, রংবেরঙের কতরকম জিনিশই না দেওয়া যায়! তা না, কেবল সোনা। হয়ত গাড়লগুলো ভাবছে দরকারে বা বিপদে আপদে কাজে দেবে। চাইলে কখনো পুঁজি হিসেবেও খাটাতে পারবে।

পরে মনে হয়েছে ব্যাপারটা আসলে তা না। যার যা আছে সে তো তা-ই দিতে পারে। তার সোনা আছে তাই সে সোনা দিচ্ছে। কোকিল হলে গান দিত, সম্রাট শাজাহান হলে তাজমহল দিত, প্রেমিক হলে লাল গোলাপ, শিল্পী হলে মোনালিসা। তার এই তো আছে। এই তো তার শ্রেষ্ঠতম জিনিশ। কবিতা, ভালোবাসা বা রক্ত গোলাপের মতো অবাস্তব জিনিশ সে কোথায় পাবে? কী করে দেবে?

১১৯

পরীক্ষায় ভালো করতে হলে আদাজল খেয়ে পড়াশোনা করতে হয়— কথাটা ভালো ছাত্রদের মতো খারাপ ছাত্ররাও একইভাবে জানে। কিন্তু এদের পার্থক্য একটি জায়গায় : ভালো ছাত্ররা কথাটা জানে বছরের প্রথম দিন থেকেই। খারাপ ছাত্ররা টের পায় যেদিন পরীক্ষা শেষ হয় সেদিন।

১২০

বজ্রসেনকে পাবার দুরাশায় সব শ্যামাকেই হয়ত কোনো না কোনো কিশোর উত্তীয়কে খুন করতে হয়।

১২১

দুনিয়াতে কে কতটা ফালতু সেটা বোঝা যায় তার চোটপাট দেখেই।

১২২

তুমি হেসে উঠলে— যেন হাজার হাজার কালো গোলাপ পৃথিবী জুড়ে ঝলমল করে উঠল।

১২৩

কাউকে বিশ্বাস করার মধ্যেই অল্পবিস্তর ঝুঁকির ব্যাপার আছে।

১২৪

অনেকেই বলেন, 'কেন্দ্র থেকে তোমরা তো বার্ষিক প্রতিবেদন বের করছ না। এত লাখ লাখ ছেলেমেয়ে এখানে উৎকর্ষ পাচ্ছে, এত কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু এতে কার কতটুকু কী লাভ হচ্ছে তার তো কোনো বাস্তব প্রমাণ নেই। ফলাফলটাকে একটু বস্তুগ্রাহ্য কর! এসব নিয়ে প্রশ্ন করলে তোমরা শুধু অদ্ভুত আর হেঁয়ালিভরা উত্তর দাও। বল, হৃদয়ের উৎকর্ষ একটা রহস্যময় দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। এ তো দামি চকলেট নয় যে মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গলে যাবে।'

কথাটা আমরাও কমবেশি মানি। সত্যি তো যে কোনো সাফল্যেরই তো একটা পরিমাণগত মানদণ্ড চাই। কিন্তু আমাদের সমালোচকরাও নাছোড়বান্দা। তাদের ওই এক কথা : 'তোমরা কি সত্যি সত্যি বুঝতে পার এসব চেষ্টা থেকে তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভালো কোনো উপকার হচ্ছে?'

'উত্তর করি, পারি।'

'কীভাবে?'

'গলার আওয়াজ থেকে।'

'মানে?'

'দেখি যে ওদের গলার আওয়াজ কিছুটা বদলাল কিনা। বদলালেই বুঝি ওদের হৃদয়টা বদলেছে। মানুষ হিশেবে ওরা আগের চেয়ে মানবিক ও রুচিশীল হয়েছে।'

১২৫

প্রেম ব্যক্তিগত সুখ-যন্ত্রণার ব্যাপার। তাই প্রতিদানহীনভাবেও সে বাঁচতে পারে। কিন্তু বন্ধুত্বের শর্ত দেওয়া-নেওয়ায়। এ না থাকলে সে মরে যায়।

১২৬

অন্ধকার থেকে একবার বের হয়ে যাওয়া মানে চিরদিনের জন্যে বের হয়ে যাওয়া।

১২৭

টিভিতে নিজের অনুষ্ঠান কোনোদিনই প্রায় দেখা হল না। অনুষ্ঠান করতেও লাগে সময়, দেখাতেও আবার। এত সময় কোথায়?

১২৮

মাঝখানে হঠাৎ শক্তমতো একটা অসুখ আসি আসি করেও আবার পালিয়ে গেল। 'বয়স হয়েছে, চারদিক থেকে আজরাইল হাজার চেহারা নিয়ে তলোয়ার হাতে ছুটে আসছে'— এসব কথা সবসময়ই বলি। কিন্তু সরাসরি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মনে হল, আমার হৃদয় আদৌ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত নয়। যেন এখনো অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাই। যেন জীবনের স্বাদ কিছুই নেওয়া হয়নি এখনো। প্রায় সব কিছুই তো বাকি! এত অসমাপ্তির কষ্ট নিয়ে কী করে সবকিছুর ইতি টানি।

১২৯

টাকা প্রেমের মতোই, জীবনকে সুখ দেয়, স্বস্তি দেয় না।

১৩০

পৃথিবীতে এমন মহৎ আদর্শ নেই যাকে ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফা হাতানোর লোকের অভাব আছে।

১৩১

পৃথিবীতে মেয়ে মাত্রেই তারকা। একজন রূপসী মেয়েকেও যত মানুষ এক জীবনে তাকিয়ে দেখে, একজন তারকাকে কি তার চেয়ে বেশি মানুষ দেখে?

১৩২

ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিক। চব্বিশ পরগনা বা গোপালগঞ্জ মহকুমার কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক ইংরেজ পাদ্রি ঐ এলাকায় একটা গির্জা বসিয়ে খ্রিস্টধর্মের মহিমা প্রচার করতে শুরু করেছেন। লোকজন প্রথমে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখলেও আস্তে আস্তে তাঁর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে ভক্ত বনে যাচ্ছে। দুচারজন গরিব লোক এর মধ্যে খ্রিস্টানও হয়ে গেছে।

যারা খ্রিস্টান হয়েছে তাদের মধ্যে যে মানুষটি সবচেয়ে চৌকস আর করিৎকর্মা— চটপটে বুদ্ধি আর রঙ্গ-তামাশায় সবার দৃষ্টি কাড়ে— সে এক স্থানীয় নমো, নাম গদাধর। চব্বিশ ঘণ্টা সে সাহেবের সাথে সাথে থাকে আর 'যিশু যিশু' করে। তার মতো কেজো সহযোগী সত্যি হয় না। তার গুণপনায় নিশ্চিত হয়ে সাহেব গদাধরকে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী করে নিলেন।

গদাধর সারাক্ষণ পাদ্রির কাজ করে আর আগের চাইতেও উঁচু গলায় 'যিশু যিশু' করে। তো, এই সময় ওই এলাকায় কালীপূজা হচ্ছে। দূর গ্রাম থেকে সারাক্ষণ ঢাকের সুউচ্চ নিনাদ আর উৎসবমত্ত লোকজনের উদ্দাম আনন্দধ্বনি কানে আসছে। পাদ্রি এদেশে এসেছেন বেশ কিছুদিন হল কিন্তু তখনো তাঁর কালীপূজা দেখা হয়নি। সেদিন ভাবলেন কালীপূজা দেখবেন। পূজায় গিয়ে তাঁর চোখ তো চড়কগাছ। দেখেন তাঁর একান্ত প্রিয় সহকারী আর সারাক্ষণ 'যিশু যিশু' ভজা গদাধর পূজামণ্ডপের চত্বরে দুহাতের কাঠি দিয়ে মহা আনন্দে ঢাক বাজাচ্ছে আর ধুমসে নাচছে। ক্রুদ্ধ সাহেব কাছে গিয়ে তার ফতুয়া চেপে ধরে বললেন, 'এই গডা, টুমি তো খিরিস্টান হইয়াছ। এখন কালীপূজায় ঢোল বাজাইতেছ কেন?' গদাধর ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আরে রাখো সাহেব, খ্রিস্টান হয়েছি বলে কি জাত দিয়েছি নাকি!'

এই হল বাঙালি। ধর্ম তার কাছে খুবই প্রিয়, কিন্তু জাত (কালচার) আরও প্রিয়।

১৩৩

পরিণত মানুষকে যা সবচেয়ে বেশি ডাকে তা যৌবন নয়, শৈশব।

১৩৪

জীবন যাক, শুধু যৌবনটা না-গেলেই বাঁচি।

১৩৫

মৃত্যুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই কি মানুষ জীবনকে এমন জমকালো করে রাখে?

১৩৬

সেদিন একটা বই পড়তে গিয়ে বুঝলাম, কেন জীবনে রবীন্দ্রনাথ হতে পারিনি। দেখলাম রবীন্দ্রনাথ দিন রাত মিলে ঘুমোতেন মাত্র তিন ঘণ্টা; আমি ঘুমাই আট ঘণ্টা। অর্থাৎ ষাট বছরের কর্মজীবনে তিনি ঘুমিয়েছেন আট বছর, আমি বিশ বছর। এরপর কিছু কি আর থাকে?

১৩৭

হঠাৎ কপট রাগে তুমি বড় বড় চোখে তাকাতেই চোখের সামনে দেখি, মা দুর্গার যুগযুগান্তের সেই বড় বড় কুপিত কৌতুক-ভরা দুই চোখ। তবে সৌভাগ্য, এই দুর্গা ফর্সা নয়, কালো।

চতুর্থ পর্ব

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

১

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জন্যে কী করে এতটা শ্রম দেওয়া সম্ভব হল? কে তাড়িয়ে আনল এত পথ? কেবল একটা অন্ধ অনিশ্চয়তার আবেগ? ব্যাখ্যাতীত কোনো কল্পজগতের হাতছানি? আমরা কি কেবল অলীক সম্ভাব্যতার কুটিল ইশারা ধরেই হাঁটি? নিশ্চয়তার সুস্পষ্ট রেখা বলে কিছু নেই?

২

"কেন্দ্রে'র দরজায় কার আশায় এই শীতে একা প্রতীক্ষা করে চলেছ মৃত্যুময়?"

"আমি বসে আছি একজন 'রাজা'র জন্যে, কিন্তু তার পদপাত এখনো অনিশ্চিত। যাত্রা হয়ত উদ্যত, কিন্তু বিঘ্নিত এখনো প্রত্যয়ের বিভ্রান্তিতে।"

'একে একে কত মানুষ আসে। বিস্বাদ মুখে এগিয়ে আসে অজীর্ণ রোগগ্রস্ত করণিক। তার মুখে চোখে সংশয় আর হীন আক্রোশ। গাদা গাদা নথি হাতে আসে বিরক্ত সহসচিব; তার ঘর ভ্যাপসা, অন্ধকারে গুমোট। আসে উপসচিব : উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাসের ঝকঝকে প্রতীক। অনভ্যস্ত ভারিক্কির ঈষৎ অস্বস্তি নিয়ে যুগ্ম সচিব আসে। আসে অতিরিক্ত সচিব— উচ্চতম সাফল্যের ঈষৎ অনটনে সামান্য অসুখী। দৃপ্ত প্রত্যয়োজ্জ্বল সচিব বা রাজকীয় চাদর গলায় উড়িয়ে মন্ত্রীও আসে।'

'কিন্তু কোথায় সেই রাজা!'

'আমার সেই রাজা কোথায়?'

৩

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লক্ষ্য কিন্তু সামান্য : 'আরো একটু ভালো'। জীবন, সৌন্দর্য, বাস্তবতা আর সংগ্রামের নিরন্তর কর্ষণের ভেতর দিয়ে উদ্যত মনুষ্যত্বে জেগে ওঠার মূলকথাও হয়ত ওটুকুই : 'আরো একটু ভালো'।

যদি জীবনে একজন দারোগাও হতে হয় 'আরো একটু ভালো' দারোগা হয়ো। দারোগার চাকরি ছোট্ট এত্তটুকুন একটা চাকরি। তবু যাঁরা বাস্তব পৃথিবীর লোক তাঁরা জানেন একটা খারাপ দারোগা ছোট্ট এই জীবনে কত মানুষের কত কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা আর দুর্ভোগের কারণ। অন্যদিকে একজন ভালো দারোগার কাছে কত মানুষের কত সুখ, আশ্রয়, নিরাপত্তা।

প্রগতি বা প্রতিক্রিয়া এই দুদলের কারো ব্যাপারেই কোনো দায় নেই কেন্দ্রের। আমাদের লক্ষ্য একটাই : মানুষের গুণগত সমৃদ্ধি।

দেশের বুদ্ধিমান মেধাবী সৃজনশীল তারুণ্যকে বিকাশের একটা অবারিত আকাশ দেয় এই কেন্দ্র, আর বলে : যদি প্রগতিশীল হও তবে 'আরো একটু ভালো' প্রগতিশীল হোয়ো, প্রতিক্রিয়াশীল হলেও 'আরো একটু ভালো' প্রতিক্রিয়াশীল।

এই পৃথিবী 'আরো একটু ভালো'র কাছেই চিরকাল নিরাপদ, শুধু মতবাদ বা বিশ্বাসের কাছে নয়।

৪

'কেন্দ্রে' একটা বুড়ো টগর গাছ আছে। ফুল-ফোটানোর বিরতিহীন উৎসব গাছটার সারা গায়ে। সারা বছর হাজার হাজার অপরূপ সাদা ফুলে ভরে থাকে গাছটা। কয়েকজন ছেলেমেয়েকে সেদিন বললাম— বুড়ো গাছটাকে দেখছ কেমন অগুণতি ফুল দেয়? ঠিক আমার মতন, তাই না?

শুনে ওরা বারবার তাকাল আমার দিকে।

কী দেখল? একটা মুখ পরিতৃপ্তিতে কেমন দেখায়!

৫

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আসল লক্ষ্য কী, এ নিয়ে নানান লোকের কাছে নানান কথা বলি। কিন্তু আমি তো জানি এই কেন্দ্রের সামনে আজ যদি সত্যিকার করণীয় কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে দুটো : এক, আজকের তরুণদের অর্থাৎ আগামীদিনের মানুষদের বড় করে তোলা; দুই, তাদের সংঘবদ্ধ জাতীয় শক্তিতে পরিণত করা।

ভালো সময় বলতে কী বুঝি আমরা? ভালো সময় মানে সেই সময়— যখন ভালো মানুষেরা সংঘবদ্ধ আর খারাপেরা বিভক্ত এবং পরাজিত। এর উল্টোটা হলেই তাকে আমরা বলি দুঃসময়।

আমাদের দেশে সব জায়গায় আজ শুধু অশুভের সংঘবদ্ধতা। কোথাও একটা দুর্বৃত্ত হেঁকে উঠলে মুহূর্তে সব দুর্বৃত্ত সংঘবদ্ধ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে ভালো মানুষেরা আজ বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগহীন— যে-যার আলাদা ঘরে শুয়ে একা একা কাঁদছে। পরস্পরকে খুঁজে পাচ্ছে না।

তারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত আগন্তুক এবং প্রত্যেকের মাঝখানে একরাশ অন্ধকার। তাদের মাঝখানকার এই বিচ্ছিন্নতার দেয়াল ভাঙতে হবে।

তাদের সকলকে একত্রিত করতে হবে— 'একত্রিত, সমবেত, আয়োজিত'।

এতগুলো বছর তাদের একত্রিত করার উপায় বের করতেই শেষ হয়েছে। এখন পথ জানা হয়েছে। এখন সংগ্রাম গন্তব্যের জন্যে।

কাজ এখন একটা : প্রদীপ উঁচিয়ে রাখা। 'ভাই হে, তোমাদের মশালগুলো যেন পলকের জন্যেও না-নেভে।'

৬

আমাদের জীবন থেকে পরনিন্দা ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা উচিত। কেন পরনিন্দা! কেন হাজার হাজার মুখ থেকে ক্লান্তিহীনভাবে উচ্চারিত নির্মম অশ্লীল মহত্ত্ববিনাশী কোটি কোটি বরাহ-নিনাদের এই ক্লেদাক্ত মহোৎসব?

কেন নিন্দা? কিসের জন্যে? আমাদের ব্যক্তিগত অক্ষমতা? ঈর্ষা? অসাফল্য? শক্তিহীনতা? অন্যের সফলতাকে সহ্য করতে পারার স্নায়বিক অক্ষমতা? ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বিকাশ-বিনাশী সহিংস প্রত্যাঘাত?

আমাদের প্রত্যেকের পঙ্গু সৃজনপ্রতিভা সাফল্যের আকাশে মুক্তি পেলে আমরা এর প্রসারের হাত থেকে মুক্তি পেতাম।

কেন্দ্রের ছেলেমেয়েদের কয়েকদিন ধরে ডেকে ডেকে আমি বলেছি : বন্ধ করো পরনিন্দার এইসব হীন আত্মঘাতী আবিলতা; মানবপ্রতিভার এই বেদনাময় অপচয়; হাজার হাজার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত চরিত্রহননের এই ক্লেদাক্ত দেশব্যাপী আয়োজন।

সবাই যদি খারাপ, তবে 'ভালো' তোমাকে দিয়ে শুরু হোক না!

৭

টিভি ছেড়েও হয়েছে ঝামেলা। প্রায় পাঁচ বছর হল টিভি ছেড়েছি। তবু এখনো রাস্তায়, অফিসে, দোকানে, বাজারে, নিমন্ত্রণে, আলোচনাসভায় যেখানেই যাওয়া হবে— গ্রামোফোনের কাটা রেকর্ডের মতো ফিরে ফিরে হাজারো অভিমানী গলায় একই স্বর : কেন ছেড়ে দিলেন টিভি? আবার ফিরে আসুন। আপনার সেই সুন্দর অনুষ্ঠানগুলোর জন্যে আমরা উৎসুক হয়ে আছি।

কী করে এই ভিড়ের হৃদয়কে বলি : অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিন আপনারা আমাকে। একদিন আমার অনুষ্ঠানের জন্যে আপনারা আপনাদের হৃদয়ের সব অনিন্দ্য গোলাপ আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

সেদিন আপনাদের আনন্দ দেবার সেই অন্তরঙ্গ দায়িত্বে আর একাগ্রতায় আমি শ্রান্তিহীন থেকেছি। শরীরের প্রতিটা রক্তবিন্দুর মধ্যে একটামাত্র আকাঙ্ক্ষাই আমার সেদিন নিদ্রাহীন ছিল : অনুষ্ঠান করতে করতে স্টুডিওর মেঝেতে যদি মরে

পড়ে থাকতে পারি— সেটাই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় মৃত্যু।

কিন্তু আজ অক্ষম আমি আপনাদের সেইসব রঙিন অনুষ্ঠান উপহার দিতে। আমার হৃদয় আর সেদিনের মতো তারুণ্যদীপ্ত নয়।

বয়সের আর দায়িত্বের ভারে মুহ্যমান আমি এখন। আজ জাতির আগামী বংশধরদের সুখের প্রশ্ন, অজ্ঞতার বেদনা আমাকে কোটি কোটি বিষাক্ত ডাঁশের মতো কামড়ে ধরেছে। আজ আমি জীবনের ন্যূনতম একটা অর্থ খুঁজছি, টিভির রঙিন বিনোদনের জগতে তার উত্তর নেই। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার এই ছোট্ট তুচ্ছ অবজ্ঞেয় বিষয়টি আজ আমার কাছে সারাদেশের সমস্ত মানুষের সম্মান সংবর্ধনা আর শ্রদ্ধাঞ্জলির চেয়ে বড়— ব্যক্তিগত সব মহিমাকামিতার চেয়ে মূল্যবান। আপনাদের প্রীতি আর ভালোবাসার দানবীয় আলিঙ্গন সামান্য শিথিল করে আমার এই ছোট্ট অর্থহীন ঘরটাতে, জীবনের এই অপচয় আর পণ্ডশ্রমের জগতে, অনুগ্রহ করে আমাকে একটু নিশ্বাস নিতে দিন আপনারা।

৮

এবারো কেন্দ্রের আমগাছটায় ঝেঁপে মুকুল এসেছে। সোনা-রঙের অপর্যাপ্ত সে সম্ভার— চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। প্রতিবছর একটা মাত্র সপ্তাহের জন্যেই এমন হয়। কেন্দ্রটাকে গন্ধে সৌন্দর্যে মদির করে রাখে।

আশ্চর্য! কেন্দ্রের একটা ছেলে বা মেয়েকেও আজ পর্যন্ত একটা কথা বলতে শুনলাম না এ নিয়ে। ভাবতে অবাক লাগে, এই বিপুল অবিশ্বাস্য সম্ভার, রূপ-গন্ধের এই অপর্যাপ্ত বিস্ফোরণ— একটা দিনের জন্যেও কারো চোখে পড়ল না! একটা হৃদয়ও পাগল হয়ে উঠল না! যদি হল তবে তার মত্ত চিৎকার কোথায়? পাগল তো চিৎকার করে!

৯

আ. খা. সকালে ফোন করে জানালেন— একদিনের একটা প্রমোদ ভ্রমণের পরিকল্পনা 'দলীয়ভাবে' পাস হয়েছে। দরকারি সবকিছুর ব্যবস্থাও শেষ। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) আমরা সবাই কুমিল্লার বার্ডে যাচ্ছি। সারাটা শুক্রবার ময়নামতিতে হইচই করে সন্ধ্যায় ফিরব। প্রস্তাব লোভনীয়, তার ওপর মিলিত সিদ্ধান্তের চোখরাঙানি। কিন্তু কী করে যাব? এতগুলো পাঠচক্র বসবে কেন্দ্রে! এতগুলো ছেলেমেয়ে আমার জন্যে এসে ফিরে যাবে!

কিছুদিন আগেও এমনি একটা নিমন্ত্রণ রাখতে পারিনি। উনি এবার কিন্তু আমার কোনো ওজর-আপত্তি শুনতেই নারাজ। আমার অসহায় অবস্থাটা তাঁকে

বোঝানোও মুশকিল। আমি জানি, না-যাবার ব্যাপারে আমার অনমনীয়তা তাঁর কাছে বাড়াবাড়ি মনে হবে। এ-ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চললে সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি অনিবার্য। দশটা বছর ধরে সম্পূর্ণ ছুটিহীন মানুষহীন একটা নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে বেঁচে আছি! ব্যক্তিগত জীবন— মানবিক সুখ-দুঃখের সেই একান্ত নিজস্ব ছোট্ট উঠোনটুকু— কোথায় হারিয়ে গেছে!

১০

আমি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে লাইব্রেরি বাড়ানোর পক্ষে নই। কী হবে নতুন লাইব্রেরি বানিয়ে? কে পড়বে? কোথায় পাঠক? যেসব জাগ্রত হৃদয় আর্ত পিপাসা নিয়ে আজ লাইব্রেরির দরজায় এসে দাঁড়াবে— সেইসব জ্বলন্ত উদ্দীপ্ত মানুষ কোথায় আজ এদেশে?

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা বড় লাইব্রেরি গড়ে তোলার। সে লাইব্রেরি হবে এখানকার জ্ঞানপিপাসু ঋদ্ধ মানুষদের আলোকিত মিলনক্ষেত্র। না, কেবল লাইব্রেরি নয়; চিত্রশালা, চলচ্চিত্রশালা, সংগীত লাইব্রেরি, অভিনয়-মঞ্চ, মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া— আরো যা-কিছু ভাবা যেতে পারে— সব। ঢাকার এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে-তোলার প্রাথমিক কাজে হাত দেওয়া হয়েছিলও প্রথমদিকে। পাঁচ বছরের সমস্ত শ্রম আর যত্ন ব্যয় হয়েছিল এর পেছনে। গড়ে উঠেছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি, সংগীতশালা, শ্রবণ-দর্শন বিভাগ, মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া— গাছপালা, দালান আর লনের একটা নিটোল পরিচ্ছন্ন পরিবেশ— 'জাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে'র একটা ছোট্ট অস্ফুট পূর্বপুরুষ।

কিন্তু অল্পদিনেই বোঝা গেল, মানুষ জন্মাবার আগেই যদি তার ঘর তৈরি হয়ে যায় তবে সেখানে সাপ ব্যাঙ আর সরীসৃপ বসবাস করে। সুসমৃদ্ধ বিশাল একটা লাইব্রেরি না হয় গড়ে উঠল, কিন্তু ওটা তো দেশের বর্তমান প্রয়োজন নয়। কে পড়তে আসবে সেখানে? কষ্টে পরিশ্রমে একটা সমৃদ্ধ আর্ট গ্যালারি না হয় গড়ে তোলা হল, কিন্তু চিত্রকলার প্রবুদ্ধ রসাস্বাদনকারী কোথায়? কজন আসবে শ্রবণ-দর্শন বিভাগে— পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কিংবা সংগীত উপভোগের জন্যে? সেইসব প্রগাঢ় নাট্যগোষ্ঠী কিংবা নাট্য-শিল্পবোদ্ধারা কোথায়— যারা সমৃদ্ধ হৃদয় নিয়ে ভিড় করবে নাট্যমঞ্চের চারপাশে?

আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ কিছুদিনের মধ্যেই দুরপনেয় বিপর্যয়ের মুখে ব্যর্থ হল। অবসরলিপ্সুদের উদ্দেশ্যহীন ভিড়, দলাদলি আর রুচিহীন খেউড়ে একটা ক্লেদাক্ত পরিবেশের ভেতর নোংরা হয়ে উঠল এলাকাটা।

আজো আমি এদেশে নতুন লাইব্রেরি খোলার পক্ষপাতী নই। কার প্রয়োজনে

লাগবে লাইব্রেরি? কে মূল্য দেবে? আজ আকস্মিক খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বিক্রমপুরের অজ-পাড়াগাঁর দশহাত মাটির নিচ থেকে যদি পালযুগের কোনো বিখ্যাত ভাস্কর্য বের হয় তাতে চারপাশের নিরক্ষর গ্রামবাসীর কী এসে যায়? একটা বিরাট ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরি রয়েছে শহরের মাঝখানে— চারপাশে মূর্খের রাজত্ব— কী তার অর্থ?

আমার আশঙ্কা, আমাদের সমাজে হয় কোনোদিন জ্ঞান প্রবেশ করেনি, নয়ত প্রবেশ করে থাকলেও আমাদের সঙ্গে আজ তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।

লাইব্রেরি তৈরির আগে ওই লাইব্রেরিতে কারা আসবে, আজ প্রথমে তাদের জন্ম দেবার কথা ভাবতে হবে। ইশকুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাদের জন্ম দিচ্ছে না। কিছু পরিমাণে তাদের গড়ে-তোলার পরই কেবল হাত দেওয়া যেতে পারে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কাজে, আগে নয়।

এজন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা লাইব্রেরিকে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় জায়গায় নামিয়ে এনেছি— প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে 'দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম'। প্রতিটি স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে বই পড়া কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া।

ইংরেজ বেনিয়ারা একদিন যেভাবে এদেশের মানুষকে 'চা' ধরিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে আজ 'বই' ধরাতে হবে আমাদের। বই ধরানোর প্রক্রিয়া হবে চা-ধরানোরই অনুরূপ। শুধু উদ্দেশ্য হবে আলাদা। হাজার হাজার বই পড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আজ সারাদেশের ছেলেমেয়েদের পড়ার নেশায় জ্বালিয়ে তুলতে হবে। আর সেইসঙ্গে তাদের যুক্ত করতে হবে মনের বিকাশের উপযোগী সুন্দর সব সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে। ভালো ভালো পুরস্কারের প্রলোভনের সামনে ফেলে তাদের জয়ের পিপাসাকে লুব্ধ করতে হবে; কিন্তু তা কেবল বই পড়ার মতো একটা বড়মাপের প্রয়োজনেই। এভাবেই নিজের অজান্তে তারা এসে দাঁড়াবে বইয়ের অমেয় অনির্বচনীয় জগতে। বইয়ের ভেতর দিয়ে বিকাশের দিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা শ্রেয় ও মহানের জন্যে আর্ত হয়ে উঠবে। তখনই আসতে পারে কেবল নতুন লাইব্রেরি তৈরির প্রসঙ্গ।

আজ দেশের লাইব্রেরিগুলোর দুরবস্থা অনেকেরই জানা। সেখানে বইয়ের পাঠক প্রায় শূন্যের কোঠায়। যে দু-চারজন এখনো আছে তাদেরও অধিকাংশই শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণির উপন্যাসের পাঠক। এই বেদনাদায়ক ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষকে করতে হয় এক হৃদয়বিদারক পন্থায় : পাঠকক্ষের টেবিলে বিনোদনসর্বস্ব নোংরা পত্রপত্রিকা সাজিয়ে রেখে, সেগুলো ঘিরে জড়ো-হওয়া রুচিহীন লোকজনদের লাইব্রেরি-ব্যবহারকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে।

মনে রাখতে হবে লাইব্রেরি কেবল কতকগুলো সুন্দর সুশোভন বইয়ের সমষ্টি নয়। এমনকি বিপুলসংখ্যক বইয়ের সমষ্টিকেও লাইব্রেরি বলে না। লাইব্রেরির

প্রধান সম্বল একজন উজ্জীবিত হৃদয়সম্পন্ন মানুষ— যিনি ডাক দেন।

আমরা সবাই জানি দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়। কখন কোন্ নামাজ পড়তে হয় তা-ও আমাদের জানা। তবু মসজিদের মিনার থেকে প্রতিটি নামাজের সময় আর্ত উচ্চকণ্ঠে একটি উদ্বুদ্ধ মানুষকে ডাক দিতে হয়। বলতে হয় : 'এসো, নিদ্রার চেয়ে প্রার্থনা উত্তম।' লাইব্রেরি থেকেও তেমনি একজন মানুষকে আহ্বান জানাতে হয়। সবাইকে ডেকে তার বলতে হয় : 'এসো, এখানে এসো, এখানে তোমাদের বৃদ্ধি, বিকাশ, আলোকসম্মত মুক্তি। হ্যাঁ, এখানেই।' ওই মানুষটি গ্রন্থাগারিক হতে পারেন— হতে পারেন অন্য কোনো প্রাণিত মানুষ। ওই মানুষ একজনের জায়গায় অনেকজনও হতে পারেন। কিন্তু যে লাইব্রেরিতে ওই উদ্বুদ্ধ আহ্বানকারী নেই— মুয়াজ্জিন নেই— সেটা লাইব্রেরি নয়।

আমাদের সমাজে আজ এই বেদনাজাগ্রত মানুষটি কোথায়— যে ডাক দেবে?

১১

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথমদিকে কত মানুষের কাছ থেকে কত সাহায্যই না নিতে হয়েছে! প্রথম পাঁচবছরে চাঁদাই তুলেছিলাম বিশ-পঁচিশ লাখের মতো। সেই কষ্টের স্মৃতিগুলো এখনো মাংসের ভেতর বিঁধে আছে। দিনে তিরিশ-চল্লিশ মাইল কেবল রিকশাতেই ছুটে বেড়াতে হয়েছে দুয়ার থেকে দুয়ারে। শারীরিক কষ্টের ওপর শাকের আঁটির মতো মানসিক কষ্টের চাপ। সামান্য কটা টাকার জন্যে তুচ্ছ কত মানুষের অবহেলা আর অসম্মান! কিন্তু অভিমান নিয়ে থেমে গেলে তো হয় না। দিনরাত কেবল একটা চিন্তা আগুনের শিখার মতো মাথার মধ্যে দাউদাউ করত— কোথা থেকে কীভাবে পাওয়া যাবে টাকা, কী করে গড়ে তোলা যাবে কেন্দ্র। সামান্যতম আশা আছে এমন একটা মানুষও ছিল না যার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াইনি। আমরা নানান সৌন্দর্য, দীপ্তি বা বৈভবের প্রত্যাশা নিয়ে একেকজন মানুষের দিকে তাকাই। কেন্দ্রের জন্যে অর্থচিন্তা আমাকে এই সময় এমন উন্মাদ করে ফেলেছিল যে, মানুষের একটা মহিমাই তখন আমার চোখে ছিল বিবেচ্য। তা হল, 'লোকটার দোহনযোগ্যতা কতটুকু!'

দেশের উঠতি বড়লোকেরাই ছিল আমার পৃষ্ঠপোষক। অপরিশীলিত স্থূল এক ধরনের অদমিত মানুষ ছিল এরা। ভালো মানুষ এদের মধ্যে ছিল না, তা নয়; কিন্তু তাদের অনেকেই সরল বিশ্বাসে দান করতে গিয়ে অনেক জায়গায় মুখ পুড়িয়েছেন। ফলে এদেশের তথাকথিত সমাজসেবীদের ওপর এদের অবিশ্বাস কুসংস্কারের মতো। একেকদিন একেকজনের সামান্য কথায় আচরণে নিজেকে এমন অসম্মানিত মনে হত যে, প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতাম। বিবমিষায় কয়েকদিন মাথা ঘোলাত। অনেকে আবার এমন ভাব

করতেন যেন কেন্দ্রকে নয়, আমাকেই দিচ্ছেন টাকাটা। কেউ অফিসে টাকা নিতে আসতে বলে দিনের পর দিন ঘোরাতে থাকতেন।

আমরা যারা সৎ শিক্ষকের জীবন যাপন করেছি বা হাজার হাজার ছাত্রের সামনে শ্রদ্ধার বেদিতে অধিষ্ঠিত থেকেছি, তাদের পক্ষে এ-ধরনের অসম্মান সহ্য করা শক্ত। মনে রাখতে হবে, আমরা পেশাগতভাবে সেই সম্প্রদায়ের মানুষ যারা সবার কাছ থেকে আজীবন কেবল 'স্যার' কথাটাই শুনি, কাউকে 'স্যার' বলি না। সবাইকে আমরা সবসময় ওয়ালাইকুমাসসালামই বলি, আসসালামুআলাইকুম নয়।

ভালো হোক মন্দ হোক, এই আমাদের জীবন। আমরা আমাদের সামনে দেশের সবচেয়ে কীর্তিমান মানুষদের প্রতিনিয়ত ভালোবাসায় অবনত হতে দেখি। এভাবে আমাদের ত্বক ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে একটা ভুল আত্মমর্যাদাবোধ নিঃশব্দে দানা বাঁধে। সাধারণ মানুষের মতো দুঃখ-অপমান সহ্য করার শক্তি আমাদের কমে যায়। আমার ধারণা, টেলিভিশনের লোকপ্রিয়তা আমার এই স্পর্শকাতরতাকে আরো পোক্ত করে দিয়েছিল।

তবু বিবেক, নিষ্কৃতিহীন বিবেক আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমার জাতির ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠায় সব কষ্ট শ্রম অপমান আমি সহ্য করেছি। আমার বেশকিছু বন্ধু-বান্ধব অনেকবার আমাকে বলেছে : 'কাদের টাকা দিয়ে এই কেন্দ্র তৈরি করছ তোমরা? ভেবে দেখেছ এরা কারা? সংঘবদ্ধ একদল রাষ্ট্রীয় দস্যু! নির্বিবেক, দুর্নীতিপরায়ণ একদল পশুসুলভ মানুষ— দুঃখী মানুষের রক্তে যাদের হাত রঞ্জিত। তোমাদের স্বপ্নের তাজমহল কী করে এদের টাকায় তৈরি হবে?' কথাগুলো শুনে প্রথম প্রথম নিজেরও খটকা লাগত। যুক্তি আছে কথাগুলোয়। এমন একটা কাজে কতগুলো দুর্বৃত্তের অবৈধ অর্থের সহযোগ কি ঠিক হচ্ছে? পরে অনেক চিন্তা-পারম্পর্য উতরিয়ে একসময় ওই দ্বিধাগ্রস্ত সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছি।

আমি সবিনয়ে ওইসব সমালোচকদের স্মরণ করিয়ে বলেছি : আমার পৃষ্ঠপোষক ওই অকর্ষিত লোকগুলো দুর্বৃত্ত, খুনি, ডাকাত বা চোর সবকিছুই হতে পারে— কিন্তু যে টাকা এই কেন্দ্রে তারা দিচ্ছে সে টাকা তো 'চোর' নয়। ওই টাকা দিয়ে যে বই আমরা কিনছি সে বই তো 'চোর' নয়। ওই বই পড়ে আমাদের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রতিনিয়ত যে অমেয় চেতনার বিকাশ ঘটছে— সে চেতনা তো 'চোর' নয়। চৈতন্যের ওই অনির্বচনীয় বিকাশ থেকে জাতির যে ঋদ্ধি ঘটবে, সেই ঋদ্ধি তো 'চোর' হতে পারে না। বরং তা একদিন ঘুরে দাঁড়াতে পারে ওইসব দস্যুতারই বিরুদ্ধে। তাছাড়া এই লোকগুলো অন্য কোথাও টাকা না দিয়ে যে এই শুভত্বমুখী কাজটাতে দিয়েছে সেজন্যে প্রাপ্য সম্মানটুকু তাঁদের কি দিতে হবে না? অন্তত জীবনের ওইটুকু জায়গায় তাঁরা এদেশের যে-কোনো ভালো মানুষের সমান পরিমাণেই তো ভালো।

যত ছোট আকারেই হোক, বাংলাদেশে যে বুর্জোয়া বিকাশ একদিন শুরু হয়েছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তার অন্যতম প্রথম দলিল।

১২

আমার বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই বলে, 'কেন বানালে তোমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রটাকে বাংলামোটরের এই কানাগলির ভেতর? এমন একটা জিনিস এরকম জায়গায় মানায় নাকি? দূরে যাও না কোথাও— সাভার কিংবা আরো দূরে— প্রকৃতির নির্জন পরিবেশে— জ্ঞানচর্চার উপযোগী শান্ত নিভৃত কোনো জায়গায়— বড়সড় কোনো এলাকা নিয়ে— দেখবে, স্বপ্নের মতো একটা জিনিশ হবে।'

আমি জবাবে বলি, 'সাভারে যাওয়া তো দূরের কথা, রাজধানীর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে না হয়ে এতদূরে এই বাংলামোটরে যে বানাতে হয়েছে এজন্যেই আমি দুঃখিত।' অনেকদিন পর্যন্ত আমি সত্যি সত্যি চেষ্টা করেছি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার কোথাও এটার অফিস নিতে— জাতির কর্মমুখর বাস্তবতা এবং হিংস্র উদ্যমের মূল প্রাণকেন্দ্রে। সচিবালয়ের ভেতরের জায়গাটা অসম্ভব বলেই কেবল ওর কথা ভাবিনি। এই কেন্দ্র থেকে পাঠ নিয়ে একদিন যাদের এই জাতিকে দিক নির্দেশনা দিতে হবে, আমি বিশ্বাস করি, তাদের তো উত্থিত হতে হবে এই জাতির সর্বময় রাষ্ট্রপ্রক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তিমূল থেকে। না, হাসির কথা নয়, আমার ওইসব বন্ধু-বান্ধবদের অনেকবার বলেছি, 'সচিবালয়ের ভেতর এককোণে কোথাও আমাকে সামান্য এক টুকরো জায়গা দিতে পার?' জীবন-সংগ্রামের দাঁতাল আক্রমণ থেকে দূরে, প্রকৃতির শান্ত নির্জন পরিবেশে, জীবনবিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা আমার পছন্দ নয়। শান্তিনিকেতনের মতো তপোবন আদর্শে গড়ে-তোলা শিক্ষাপ্রণালী একালের নিষ্ঠুর রক্ত-সংঘাতের যুগে অনেকখানি অচল বলেই আমার ধারণা।

[আজকের পাশ্চাত্যের গ্রামগুলোর কথা আলাদা। ওখানকার দেশগুলো আজ একেকটা বড় আকারের শহর ছাড়া আর কী? আপাতদৃষ্টে সেখানে যাকে প্রকৃতির কোলের স্নিগ্ধ শান্ত কুঞ্জবন বলে মনে হচ্ছে সেখানেও আধুনিক সভ্যতার সর্বশেষ ব্যসনগুলো ক্রূর ছোবল উঁচিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সহজ অনাড়ম্বর জীবনে নিবেদিত অধ্যাপকবৃন্দ, সুস্থিত মূল্যবোধ, সাধনা, নিষ্ঠা— সব মিলে রাবীন্দ্রিক পৃথিবীর একটা শেষ রশ্মি যেন এখনো বেঁচে আছে সেখানে। তবু প্রশ্ন আসে : বাঙালি জীবনের সংগ্রাম আর অগ্রযাত্রার ইতিহাসে শান্তিনিকেতনের অবদান সত্যি কতটুকু? এই জায়গাটায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত একক ভূমিকা কি ওই বিশাল প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক আয়োজন আর প্রচেষ্টার চেয়েও অনেক বড় নয়?

ধারণা করা যায়, শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার কষ্টকর দিনগুলোয় রবীন্দ্রনাথ হয়ত এমনি এক স্বপ্নের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে, প্রকৃতিলালিত এই নির্জনতার কোলে, উপনিষদীয় জীবনচর্যার এই নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির ভেতর তাঁরই মতো প্রবুদ্ধ মানুষদের জন্ম একদিন সংঘটিত হবে এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে সময় তা ভুল প্রমাণ করেছে। আমার মনে হয়, তাঁর এই চিন্তার চাইতে তাঁর কাল অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তিনি নিজেও কি দ্বন্দ্ব-বিস্রস্ত নাগরিক হিংস্রতারই সন্তান ছিলেন না? মৌন সমাহিত উপনিষদীয় পৃথিবী তো তাঁর জীবনের বিকাশপর্বের পরিবেশ ছিল না। তাঁর বাস্তবতা ছিল বরং উল্টো। ইউরোপের সমাজব্যবস্থার তীব্র উচ্ছ্রিত গতিধারা যেখানে ফিরে ফিরে তাঁর জীবনাগ্রহকে প্রাণনা দিয়েছে, সেখানে কী করে ভাবা যেতে পারে শান্তিনিকেতনের শান্ত নির্বিরোধ জীবন-পরিবেশ তাঁর মতো শক্তিমান, সংগ্রামদীপ্র, পরাক্রান্ত মানুষদের উত্থান ঘটাবে?

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগ থেকেই এর ছাত্রছাত্রীরা যুগের চলমান বাস্তবতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে কমবেশি ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাই শেষ পর্যন্ত হয়েছে এদের অধিকাংশের বিধিলিপি। সামাজিক সংঘাত এবং দ্বান্দ্বিক রক্তযাত্রার ভেতর থেকে যারা জন্মাচ্ছে না, পরিপার্শ্বকে আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে নেবার যুদ্ধে নিজেদের শস্ত্র-ভাণ্ডারকে তাদের অপর্যাপ্ত মনে হবারই কথা। তাছাড়া সমাজকে তাদের অনুকূলে মুখ ফেরাতে বাধ্য করার হিংস্র শক্তিমত্তাতেও এরা দুর্বল থেকে যায়। এদের ব্যাপারেও ঘটেছে প্রায় তা-ই। একটা উচ্চায়ত জীবনের ললিত স্বপ্নকে আজীবন বুকের ভেতর বয়ে বেড়িয়ে, পৃথিবীব্যাপী নিঃসঙ্গতার ভেতর, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেদের আদর্শকে সর্বোচ্চ ভেবে, শক্তিপ্রভাবহীনভাবে এরা এক সময় নীরবে মুছে গেছে।

শান্তিনিকেতনের একজন মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন কৌতূহলী প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা হয়েছিল একদিন। এ-ব্যাপারে তিনি আরো বিশদ শুনতে চাইলে কাছাকাছি তুলনা হিসেবে বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজগুলোর প্রসঙ্গ টেনে তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। সবাই জানেন, আমাদের দেশে ক্যাডেট কলেজ নামে সামরিক প্রবণতাসম্পন্ন এক ধরনের চৌকশ বেসামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং বিরাট অর্থব্যয়ে নির্মিত ও পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশের সামরিক মহিমার প্রতিভূ এই বিদ্যালয়গুলোকে সম্প্রতি জনচক্ষে তুলে ধরা হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের এক ধরনের উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

ভবিষ্যৎ সামরিক বাহিনীর জন্যে ভালো অফিসার গড়ে তোলাই এগুলোর প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য। স্কুলগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকাল সপ্তম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি। ধরে নেওয়া হয়েছে, শৈশবের এই অনুভূতিময় দিনগুলোয় যদি ছাত্রছাত্রীদের

নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে গড়ে তোলা যায়, তবে তাদের চরিত্রে এমন কিছু উন্নত গুণের সহযোগ ঘটবে যা ভবিষ্যতের সামরিক জীবনে তাদের সুযোগ্য অফিসার হতে সাহায্য করবে। যারা সামরিকবাহিনীতে যেতে পারবে না কিংবা যেতে চাইবে না, তারাও এই শিক্ষাব্যবস্থার উপকার পেয়ে উন্নত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। আমি নিজেও এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেশকিছু অভিনন্দনযোগ্য দিক দেখতে পাই। এখানে ছাত্রছাত্রীদের যে শৃঙ্খলা, সুশিক্ষা এবং সুস্মিত মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে গড়ে তোলা হয়, তা প্রশংসনীয়।

কিন্তু এখানেও সেই আগের সমস্যা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন সুদূর জায়গায়— দেশের রক্তাক্ত, নগ্ন বাস্তবতা থেকে দূরে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জাতির শক্তি ও নিঃস্বতা, ভূয়িষ্ঠতা ও পচন, বৈচিত্র্য ও অগ্রযাত্রা সবকিছু সম্বন্ধেই অনবহিত থেকে যাচ্ছে। চারপাশের প্রকৃতির নিরীহ নির্বিরোধ জগতের মধ্যে তারা বড় হয়। এখানে সুস্মিত মূল্যবোধ আছে, কিন্তু তা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে। এখানে নিয়মানুবর্তিতা আছে, কিন্তু তাকে এক ধরনের স্থূল পাশবিকতা বলাই ভালো। শিক্ষার্থীদের তরুণ মনের বৈচিত্র্য, কৌতূহল, প্রতিভা, স্বাতন্ত্র্য— সবকিছুকে দলে পিষে সবাইকে একটা ভেদাভেদহীন একাকার মানুষ করে ফেলাতেই এই শিক্ষার মূল আগ্রহ। হৃদয়ের ওপর এই অমানবিক অত্যাচার কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্যে এগুলোকে এক-একটা উদ্ধারহীন নির্যাতনশালা করে রেখেছে।

প্রায় প্রতিবছরই শোনা যায় পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশি জনের একেক দল ছাত্র একসঙ্গে জোট বেঁধে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে কলেজ থেকে। তারপর পঞ্চাশ-একশো মাইল হেঁটে বা বাস-লঞ্চ-নৌকায় চেপে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফিরে গেছে যে-যার বাড়িতে। এই বেদনাদায়ক ইতিবৃত্তের এখানেই শেষ নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ নিষ্কৃতিহীন। ওই ছাত্রদের পেছনে কলেজ যে বিস্তর অর্থব্যয় করেছে, অভিভাবকেরা তা ফেরত দিতে না পারলে বাড়ি ফিরেও মুক্তি নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজ-কর্তৃপক্ষ ওই হতভাগ্য ছাত্রদের বাড়ি ঘেরাও করে আইনের আশ্রয়ে আবার তাদের ওই নির্মম বন্দিশালায় ধরে নিয়ে যায়।

এসব ঘটনা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে প্রভুর বাড়ি থেকে পালিয়ে-যাওয়া আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাসদের ধরা পড়ার পর গলায় বেল্ট লাগিয়ে ফের প্রভুর বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার রোমহর্ষক স্মৃতিকেই মনে করিয়ে দেয়। কী ধরনের নির্মম আর অত্যাচারী শিক্ষাপদ্ধতি এই ঘটনাগুলোর জন্যে দায়ী, তা সহজেই অনুমেয়। শিশুমনের ওপর এই পাশবতা কি কোনো উন্নত বা আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে? অথচ আমাদের দেশের সামগ্রিক শিক্ষাপরিস্থিতি আজ নৈরাজ্য আর

অবক্ষয়ের মধ্যে এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, অভিভাবকেরা উপায়হীন হয়ে এই অমানবিক শিক্ষার কাছে সন্তানদের পাঠানোকে আজকাল বিরাট সৌভাগ্য বলে মনে করছেন।

আমি সেই অধ্যাপক মহোদয়কে বিনীতভাবে বললাম : আজকের দিনে ভালো শিক্ষার জন্যে দুটো উপাদান খুবই জরুরি। এক, দেশের কঠিন বাস্তবতার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিকশিত করা; দুই, উদার পরিবেশে তাদের বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া। শান্তিনিকেতন বা আমাদের ক্যাডেট কলেজগুলোর বিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম শর্তটিকে প্রায় পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে। তাছাড়া এই দুটো শিক্ষাপদ্ধতির অবয়ব জুড়েই একটা নির্মম অত্যাচার নীরবে সক্রিয় রয়েছে। ক্যাডেট কলেজগুলোর যে অত্যাচার তা প্রত্যক্ষ: সেটা বর্বরতার অত্যাচার। শান্তিনিকেতনে তা অনেক মার্জিত এবং সূক্ষ্ম: সেটা মাধুর্যের অত্যাচার।

আমার কথা শুনে অধ্যাপক মহোদয় অবাক হবার ভঙ্গিতে, কথাটার তাৎপর্য হঠাৎ এইমাত্র যেন বুঝতে পেরেছেন, এভাবে হেসে বললেন, "সত্যি, ব্যাপারটা কখনো এভাবে ভেবে দেখিনি তো!"

তাঁর বিনয়ের বিগলিত প্রাচুর্য দেখেই বুঝতে পারলাম আমার বক্তৃতাটা পুরোপুরি মাঠে মারা গেছে।

১৩

দিনকয় আগে কেন্দ্রে এল আমাদেরই একজন পরিচিত তরুণ কবি। ঘটনাচক্রে সে আমার ছাত্র। কবি বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা-ই; শরীরের প্রতিটা রক্তকণিকা তার স্বপ্ন আর প্রেরণায় জ্বলন্ত। হাত নেড়ে সে বলতে লাগল : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে ছড়িয়ে দিন সারাদেশে। হাজার হাজার প্রতিভা সৃষ্টি করুন— তাজা রগরগে সব প্রতিভা। দেশের প্রতিটা অঙ্গন আজ শূন্য— আমাদের অসংখ্য প্রতিভার দরকার এখন।

আমি বললাম, প্রতিভা সৃষ্টি করার আশ্বাস কী করে দিই। আমাদের এই কার্যক্রম তো সর্বজনীন কোনো জাতীয় অগ্নিকাণ্ড নয়। কোনো অসম্ভব বিপ্লবও তো ঘটাতে বসিনি আমরা।

প্রতিভা সৃষ্টি করব এত স্পর্ধার কথা বলতে পারব না। শুধু বলতে পারি : যদি কোনো 'প্রতিভা' আমাদের এই প্রক্রিয়ার স্পর্শ পায়, কোনোভাবে এর ভেতর এসে পড়ে, তবে সে উপকৃত হবে। যে আলো-ঐশ্বর্যের স্ফুলিঙ্গ সে এখান থেকে শোষণ করবে, তা তার ভেতর কমবেশি স্বর্গীয় প্রজ্বলন ঘটাবেই।

১৪

যে-যুগে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মানে ছিল পাড়ার গ্যারেজের মাথার দিকে হলুদ কাপড়ের ওপর লাল রং দিয়ে লেখা 'সবুজ সংঘ' 'তরুণ সংঘ' জাতের সংগঠন— সেই যুগে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো এতবড় একটা আয়োজন সীমানা-লঙ্ঘন নয় কি?

১৫

'কেন্দ্রে'র ছেলেমেয়েদের জন্যে জুডো আর কারাতে শেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কয়েকটা গুণ্ডা ছুরি হাতে 'কেন্দ্রে'র গেটে এসে দাঁড়াবে আর আমাদের দুর্ধর্ষ জ্ঞানতাপসের দল 'কেন্দ্রে'র পেছনের দরজা দিয়ে লেজ উঁচিয়ে দৌড় দেবে— এই লক্ষ্মণসেনী অসম্মানের দৃশ্য বারে বারে একটা জাতির পক্ষে অসহ্য।

গতকাল প্রথম অনুশীলনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। সবাই হাসল খুব। একজন বলল, এই বয়সে এসব শিখে কী করবেন? কারো সঙ্গে লড়াই-টড়াই করবেন নাকি?

আমি চুপ করে থাকলাম। কী করে ওদের বোঝাই— জীবন কোনোদিন শেষ হয় না।

১৬

উনিশশো আশি সালের ডিসেম্বর মাস। ছেলেদের নিয়ে সাইকেল-ভ্রমণের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। একটানা দু'সপ্তাহের সাইকেল-ভ্রমণের প্রস্তাব কানে যেতেই কাছাকাছি একজনের কান খাড়া হয়ে উঠল। ছেলেটা স্বাস্থ্যবান, কিন্তু সাহস দুঃখজনকভাবে স্বাস্থ্যবিরোধী। ভ্রমণের সম্ভাব্য ফুর্তিতে সবাই হইচই তুলতেই ভয়-পাওয়া গলায় সে বলে উঠল : 'স্যার এতগুলো দিন একটানা সাইকেল চালাবেন, কষ্ট হবে না?' সবাই হল্লা করে উঠল, 'আরে কষ্টই তো আনন্দ! কষ্ট না হলে অ্যাডভেঞ্চার কিসের?'

এবার তার জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্ব :

'ধরুন স্যার, সারাদিন সাইকেলই না হয় চালালেন, কিন্তু রাতে? থাকবেন কোথায়?

'কেন, একটা ইশকুল-টিশকুল দেখে উঠে পড়ব। নিদেনপক্ষে এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বার কারো বাড়িটাড়ি...।'

'কিন্তু স্যার, সেখানে তো কত রকমের পোকা... আ...মাক...অ...ড়...।

আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বলে উঠলাম : শাবাশ বীরপুরুষ, আজ থেকে

তোমার নাম দেওয়া যাক 'পোকা...আ...মাক...অ...ড়'। কেমন খুশি তো?

ছেলেমেয়েরা হল্লা করে সমর্থন জানাল।

এরপর থেকে ছেলেমেয়েরা 'পোকা...আ...মাক...অ...ড়' বলে ওকে দিনরাত এমনি উত্ত্যক্ত করতে লাগল যে বেচারি দিনকয়েকের মধ্যেই কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেল।

এমনি 'পোকা...আ...মাক...অ...ড়' আমাদের চারপাশে শতকে-হাজারে নয়, লাখে কোটিতে।

এই ফাঁকে আরেকজন 'পোকা...আ...মাক...অ...ড়ে'র গল্প মনে পড়ছে। ছেলেটা একসময় ঢাকা কলেজে আমার ছাত্র ছিল, হঠাৎ একদিন কেন্দ্রে এসে উপস্থিত।

কিছুক্ষণ কথার পর ঘরে আমাকে একা পেতেই হঠাৎ নিচু হয়ে খপ করে পা চেপে ধরল।

— স্যার, আপনাকে গুরুর মতো মনে হয়। আপনাকে 'গুরু' ডাকতে চাই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কী একটা অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা তখন দারুণ ব্যস্ত। হাতে কয়েকশো নিমন্ত্রণপত্র, দিন-দুয়েকের মধ্যে নিমন্ত্রিতদের হাতে পৌঁছোতে হবে।

বললাম, 'গুরুগিরির ব্যবসা এখনো ধরিনি, তবে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে গিয়ে এই ছ-সাতটা চিঠি যদি ঠিক ঠিক লোকের হাতে দিয়ে আসতে পার তো আবেদন বিবেচনা করে দেখা যাবে।'

আমার প্রস্তাব শুনতেই শিষ্যের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন কোথায় স্যার?'

কণ্ঠস্বরে সুগভীর ভীতি।

'কেন, পুরনো ঢাকায়!'

'পুরনো ঢাকায় কী করে যেতে হয়, স্যার!'

জায়গাটার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে চেষ্টা করলাম।

'কিন্তু আমি তো সেখানে কখনো যাইনি স্যার।'

'যাওনি বলেই তো যাওয়া হবে, চিনবে।'

'আমি বোধহয় যেতে পারব না স্যার!'

কণ্ঠস্বরে করুণ অসহায়তা! আর সহ্য করা দায়। শিষ্যের পরিণতির চেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গুরুগিরির দুশ্চিন্তায়।

আমাদের অধিকাংশ মানুষ যে আজ প্রায় কিছুই করতে পারছে না, সেটা ততখানি ভয়ের নয়। আসল আশঙ্কা, তারা যে কিছু করতে পারবে, এটুকুও বিশ্বাস করতে পারছে না দেখে।

দিনকয় আগে কেন্দ্রের একটা মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মেয়েটা একাদশ শ্রেণির, কেন্দ্রে ওদের 'প্লেটোর সংলাপ' বইটা পড়তে হয়। কথায় কথায়

সক্রেটিসের প্রসঙ্গ উঠতেই সে সক্রেটিসের অনমনীয় নৈতিক শক্তির প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠল।

জিগ্যেস করলাম, 'সক্রেটিসের মতো ওভাবে অন্যায়ের সামনে দাঁড়াতে পারবে?'

প্রশ্ন শুনেই বঙ্গললনার চোখ সাদা হয়ে গেল। ভীতিবিহ্বল স্বরে বলল, 'আমি কী করে পারব, স্যার!'

গলার স্বরে সারা পৃথিবীর অসহায়তা।

বললাম, 'কেউ কি গরম শিক দিয়ে তোমার কপালে বড় করে লিখে দিয়েছে : 'তুমি পারবে না।'

হায়, কেন সে কিছুতেই পারার কথা ভাবতে পারছে না! আমরা যা ভাবি আমরা তো তা-ই হয়ে যাই।

আর হে অবিশ্বাসী মেয়ে, কী করে তুমি জানলে তুমি বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি নও! আজ না হোক, পাঁচ হাজার দশ হাজার বছর পরে মানুষের পৃথিবী তোমাকে যে ওই নামে ডাকবে না— কে তা জানে?

১৭

একজন সাংবাদিক সেদিন বললেন : আপনার প্রতিষ্ঠান আপনার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে আছে— এটা ঠিক হচ্ছে না। সৃষ্টি স্রষ্টার চেয়ে বড় হতে পারে না। পৃথিবীতে যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সে সবচেয়ে বড় না-ও হতে পারে। দেশের প্রধান সেনাপতি দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ, কিন্তু সবচেয়ে বড় নয়। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে যে আলোর পৃথিবী রয়েছে, তা তার নেই। আপনার চারপাশে আলোর সেই বৃত্ত কোথায়? বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আপনার ভাবমূর্তি এখনো জাতীয়ভাবে প্রদীপ্ত নয়। শিক্ষক, সাহিত্য সংগঠক বা টিভি-ব্যক্তিত্ব— এসবকে পিছে ফেলে এই কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে আপনার পরিচয় দেশের মানুষের কাছে এখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। কেন্দ্রের স্রষ্টা হিসেবে আপনার প্রচারের ব্যাপকতা কেন এত কম? সৃষ্টি তো স্রষ্টার অংশ। সে কেন আপনার চেয়ে বড় হয়ে থাকবে? প্রতিষ্ঠানের দুঃখে বিপর্যয়ে এতবড় একটা জিনিসকে বাঁচাবে কে? কেন্দ্রের স্বার্থেই কেন্দ্রের চেয়ে আপনার বড় হওয়া দরকার।

আমি জানি, দেশের পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে প্রতিটা প্রচারমাধ্যমে আমার যতটুকু ব্যক্তিগত পদচারণা রয়েছে, তাতে কেন্দ্রের পাশাপাশি তার প্রতিষ্ঠাতার ভাবমূর্তি জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা খুব কঠিন নয়। তাহলে কেন তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখার এত সচেতন চেষ্টা?

কার লেখায় যেন পড়েছিলাম : বাঙালিরা জন্মায় নিঃশব্দে, বেঁচে থাকে নিঃশব্দে, বড় হয় নিঃশব্দে। কথাটা পড়ে অবাক লেগেছিল। নিঃশব্দে বড় হয়, এ

কেমন কথা? খ্যাতি আর নৈঃশব্দ্য তো পরস্পরবিরোধী। পরে বুঝেছি হয়—কোথাও না হোক অন্তত এদেশে হয়। ভালো কিছু করতে গেলে, এমনকি বিখ্যাত হতে গেলেও লুকিয়ে নিঃশব্দে সবার অজান্তে চোরের মতোই তা হতে হয় এদেশে। বিদেশে ফুটবল খেলায় গোল করার পর কিংবা অভাবনীয় কোনো ক্রীড়ানৈপুণ্যে সাফল্য দেখানোর পর চারপাশের লক্ষ লক্ষ ভক্তের মুহুর্মুহু করতালির সামনে যেভাবে খেলোয়াড়েরা আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠে হাত ছুড়ে বিজয় গৌরব উদ্‌যাপন করে, এদেশে সেটা সম্ভব নয়। এখানে খারাপ কাজই কেবল বুক ফুলিয়ে করা যায়, ভালো কাজ নয়। এদেশে যে-কোনো সাফল্যের চেহারাই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো। সাফল্যের অপরাধে নতজানু আর গলবস্ত্র হয়ে সবার সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে এখানে বলতে হয় : 'মূঢ় আমি, নির্বোধ আমি, সব দিক থেকে বোধশক্তিহীন, কোনো যোগ্যতা নেই। যতটুকু যা সাফল্য হয়েছে তা নেহাতই আপনাদের দয়ায় আর দোয়ায়।' একথা বলতে পারলে তবেই কেবল এদেশে স্বীকৃতি। কোটি কোটি ব্যর্থ আর হীনমন্যতাক্লিষ্ট মানুষের এই দেশে কোনো সাফল্যকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দিত করার ইতিহাস বিরল।

এদেশে মানুষ উৎভূমিক (Vertical) উন্নতিতে বিশ্বাস করে না। পরিপার্শ্বের সঙ্গে নির্মম যুদ্ধে জিতে কেউ নিজেকে সামান্য সোজা করে একটু দাঁড় করিয়েছে কি সবার চোখ পড়ে যাবে তার ওপর :

'মাথাটা যেন বেশি উঁচা উঁচা দেখা যায়। পালিশ কইরা দিতে হয় তাইলে।'

স্যাঙাৎরা সম্মতি জানিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

প্রথম থেকেই টের পেয়েছিলাম, এদেশে ভালো কিছু করতে হলে করতে হবে অজান্তে, অলক্ষে। তার বিকাশ খাড়া বা উৎভূমিক (Vertical) হলে চলবে না, হতে হবে সমতলধর্মী, আড়াআড়ি (horizontal)। নিঃশব্দ সাফল্যই এদেশের একমাত্র শর্ত। এজন্যেই রাজধানীর ছোট পরিসরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে উঁচু করে তৈরির চেষ্টা করিনি। একই জিনিসকে সারাদেশে গুঁড়ে গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় একটা উঁচু মনুমেন্ট গড়ে তোলার চেয়ে সারাদেশকে ছোট ছোট তুলসীতলার অজস্র প্রদীপে ভরে দেওয়া ভালো। চারপাশের হাজার হাজার ঈর্ষা আর শত্রুতার ক্ষিপ্র চোখ ফাঁকি দিয়ে আমাদের এগোতে হচ্ছে।

সাংবাদিককে বললাম : পত্রপত্রিকা, বেতার-টেলিভিশনে বা ওই জাতের অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের সাহায্য নিয়ে আমাদের মতো আলোকপ্রত্যাশী একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা উচিত নয়। ওই অকর্ষিত প্রচারমাধ্যমগুলো পণ্যকে জৌলুশ দিতে পারে, মানুষের অমেয় চেতনাকে নয়। যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আমাদের পরিচয় সারাদেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাকে হতে হবে আরো সূক্ষ্ম, সতর্ক, গভীর, ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি। আমাদের কর্মসূচিগুলোর

ভেতর দিয়ে সারাদেশে যেসব হাজার হাজার আলোকিত চিত্ত আজ চিন্ময় বিকাশের দিকে পাপড়ি মেলছে তাদের সবার উজ্জীবিত জিহ্বাই একদিন আমাদের ঈপ্সিত প্রচার মাধ্যম হয়ে জাতির কাছে কথা বলুক।

১৮

ধরে নিচ্ছি, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্র গড়ে তোলা খুবই দুরূহ ছিল; ধরে নিচ্ছি, এ থাকবেও না। এদেশের সব প্রতিষ্ঠানের যা হয় এর ভাগ্যও তাই হবে—আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ধসে ভেঙে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে আমার স্বপ্নটাকেও কবর দিয়ে দেব? আমার দায়িত্ব বা করণীয়টুকুও করব না? দেশবাসীর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে একদিন যা গড়ে তুলতে আত্মবিস্মৃতের মতো ছুটে গিয়েছি, একটানা তেত্রিশ বছর যার জন্যে জোয়াল কাঁধে শ্রম দিয়েছি, আজ আধা পথে তার ঝাঁপি বন্ধ করে বিছানায় শুতে যাব?

১৯

সারাদেশে কেন্দ্রে আজ পনেরো লক্ষ তরুণ-তরুণী উৎকর্ষধর্মী কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। আমাদের শুরুর দিকের তুলনায় কত বিশাল আর অভাবিত এই ঘটনা। তবু আজও কেন্দ্রের কোনো ওয়েবসাইট নেই। কথাটা অনেকে একেবারেই মানতে পারে না।

তারা অভিযোগ করে : 'কত অজস্র কোটি মানুষেরও তো ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট আছে, অথচ এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান, এর ওয়েবসাইট নেই।'

আমি বলি, 'কী হবে ও দিয়ে?'

'কেন! দুনিয়ার মানুষ এ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার স্যাপার জানবে। যারা সহযোগিতা করতে চায় তার সহযোগিতা করতে পারবে, প্রতিষ্ঠান বড় হবে।'

আমি বলি, 'এই যে নিঃশব্দে কাজ করে দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠান বড় হল, তাতে খারাপটাই কী হয়েছে। মানুষের জানতে কি কিছু বাকি আছে? না হলে দু-দুটো আন্তর্জাতিক পুরস্কার এল কী করে? মানুষ আমাদের বুঝল বা ভালোবাসল কী করে। আমি মনে করি মানুষের কোনো সৎ চেষ্টা কখনো ব্যর্থ হয় না। প্রচার করলেও না, না করলেও না। ওর ভেতরের শক্তিই ওকে বাঁচিয়ে রাখে। অ্যারিস্টটল প্লেটোর কি ওয়েবসাইট ছিল? তাঁদের সবকিছু আমরা জেনেছি কী করে? পৃথিবীকে কোনোকিছু জানানোর আসল উপায় শ্রম প্রতিভা, আত্মোৎসর্গ। এসব থাকলে এদের উচ্চারিত জিহ্বা মানুষের কাছে ভেতরের খবর পৌঁছে দেবেই। ওয়েবসাইট ছাড়া পৃথিবীর কোনো সৎ জিনিশের বাঁচতে কি কখনো

অসুবিধা হয়েছে? বিজ্ঞাপন তো মানুষ দেয় বিক্রি বাড়ানোর জন্যে। আমাদের লক্ষ্য তো জীবনের বিকাশ। আমাদের তো বেচা-বিক্রির ব্যাপার নেই।'

যুগ বা দশজন যাকে শ্রেষ্ঠ বলে তা যে সবসময় শ্রেষ্ঠ নয়, এটা অনেকে মানতে চায় না। মনমরা হয়ে তবু ওরা আপত্তি তোলে, বলে, 'সবাই আমাদের জানলে দোষটা কোথায়?' আমি বলি, 'তোমার বেডরুমের খবরও তো পৃথিবীকে জানাতে দোষ নেই। কিন্তু তুমি কি তা জানাও? তাছাড়া আমাদের সবকিছু জানিয়ে দিলে আমরা প্রচারিত হব ঠিকই, কিন্তু ছোট হয়ে যাব। লোকে বলবে, ও, এইটুকু নিয়েই এত জাঁক।'

'কিন্তু ওয়েবসাইট না থাকলে হবে উল্টোটা। তখন কিছুটা জানবে চেখে দেখে, বাকিটা জানবে অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে। জান তো গুজবের কী শক্তি! এই গুজব আমাদের পক্ষে থাকবে। ভাববে, ওরে বাপরে, কী আজদাহা ব্যাপারই না জানি করে ফেলেছে ওরা। এক কথায়, আমাদের সব তথ্য এতে প্রচারিত না হলেও আমরা হয়ে উঠব কিংবদন্তি।

একবার প্যারিসে এক ভদ্রমহিলা ঠিক এরকমই অভিযোগ তুললেন। আমার বক্তব্যটা তাঁকে বুঝিয়ে শেষমেশ বললাম, 'সবকিছু প্রচার হয়ে গেলে আমরা তো হয়ে যাব পুরো ঝাঁপখোলা, উদোম। পশ্চিমা মেয়েদের মিনিস্কার্ট। আমাদের সব জারিজুড়ি বেরিয়ে পড়বে। প্রকাশ না হলে আমরা হব বাংলাদেশের শাড়ি—কিছুটা জানা কিছুটা রহস্যময়।'

২০

টাকা দিয়ে কী করা যায়, এদেশে তা দেখিয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান,
টাকা ছাড়া কী করা যায়, তা দেখিয়েছি আমরা।

বিশ্রুত অর্ণাল
(সময় প্রকাশন)
0000000002401